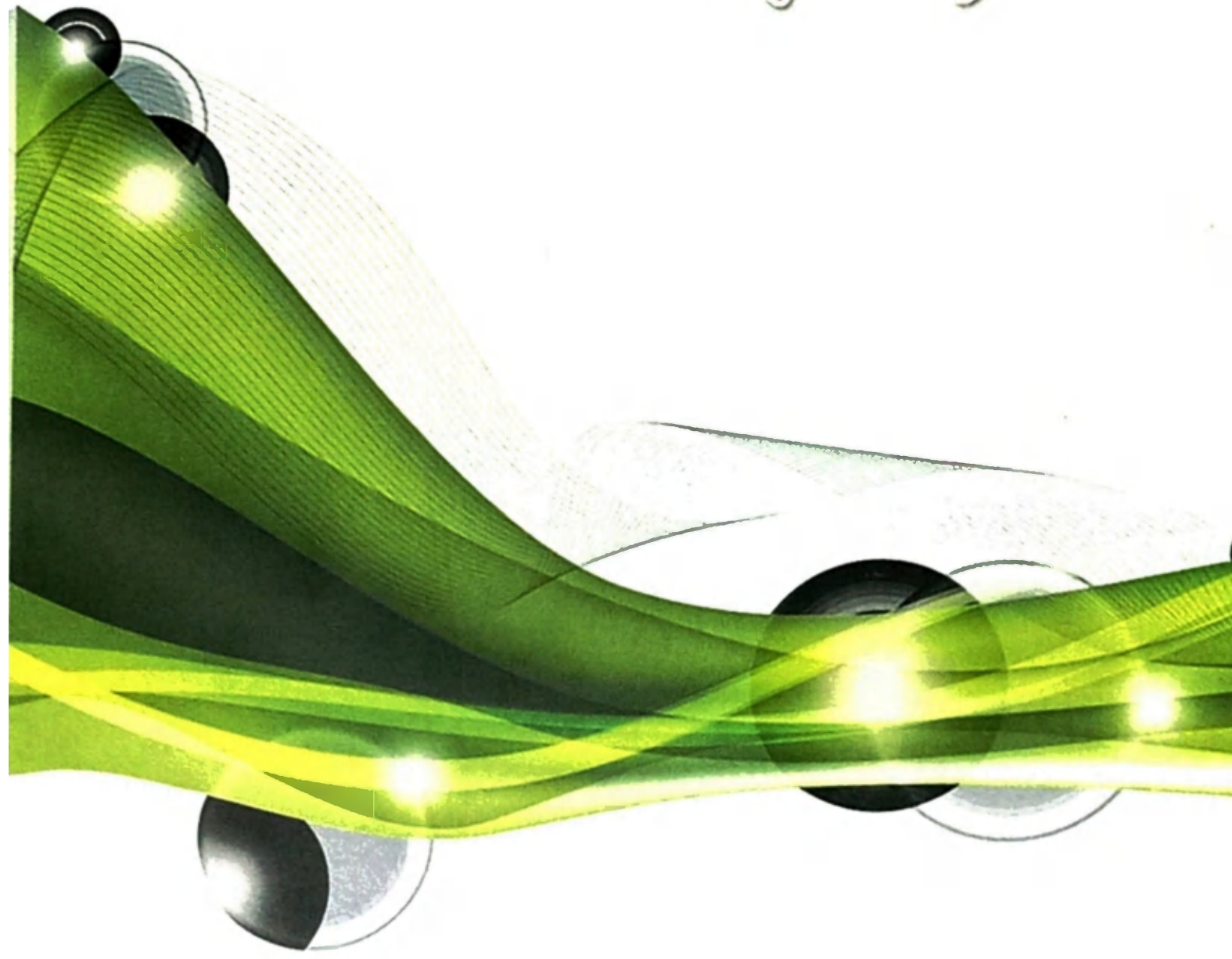


মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

মুক্তার চেয়ে

দাওয়া



মুক্তার চেয়ে দামী-২

(৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

মূল

মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

ইবনে

হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী (র.)

যিন্মাদার : মুম্বাই, ভারত

ভাষান্তর

মাওলানা ফারুকুজ্জামান

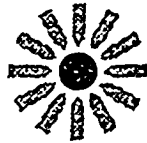
দাওরা, আদব, ইফতাদারুল উলুম দেওবন্দ, ইউ.

পি. ইন্ডিয়া

মাওলানা আতিকুল্লাহ শহিদ

তাকমিল, জামেয়া রহমানিয়া

ঢাকা .



আকিক পাবলিকেশন্স ! এদারায়ে কুরআন

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৯৫৮৯৮৫২, ০১৭২৪ ৬০৪১৩৬

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক



https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৩ ঈ., পঞ্চম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২০ ঈ.

মুক্তার চেয়ে দামী-২ (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশক : জসিম উদ্দিন

আকিক পাবলিকেশন্স

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৯৫৩৩২১৪, ০১৭২৪ ৬০৪১৩৬

E-mail : akikpublication@gmail.com

পরিবেশক

কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯৫৮১৯৪২, ০১৭০৬৮৯৩২১০, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬

কলকাতা শাখা

কথাপ্রকাশ, বিদ্যাসাগর টাওয়ার, দোকান নং এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)

১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ফোন : ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)

মুদ্রণ : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৫৭৩৯৭০৮১, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

মূল্য : ৩২০/= (তিনশত বিশ টাকা মাত্র)

ISBN- 978-984-93076-2-4

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। যার ইচ্ছায় আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দান করতে পেরেছি। সময়ের আবর্তে, প্রয়োজনের তাগিদে ইসলামী প্রকাশনার জগতে ‘আকিক পাবলিকেশন্স’-এর উন্মেষ ঘটেছে নান্দনিক অবয়বে। যার মধ্য দিয়ে ইসলামের সুমহান বাণী ও উপাত্ত মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়াই এর দৃঢ় অঙ্গীকার।

আল্লাহ তায়ালার সকল হুকুম-আহকাম মেনে জীবনকে কল্যাণের আলোকে আলোকিত করা আমাদের সকলের কাম্য। এর জন্য আমাদের অনেক ইসলামী জ্ঞান জানা ও পর্যালোচনা করা অতীব জরুরি।

তাই মাওলানা ইউনুস পালনপুরী মূল্যবান মণি-মুক্তা দিয়ে অলংকারিত্ব করে তুলেছেন তাঁর ইসলামী জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার ‘বিখরে মুতি’ কিতাবের অনুবাদ গ্রন্থ ‘মুক্তার চেয়ে দামী’ গ্রন্থে, যা আমরা ধারাবাহিকভাবে দুই খণ্ড করে এক সাথে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করে যাব। এতে রয়েছে— মহান আল্লাহর সুমহান সকল নামের বৈশিষ্ট্য। আর কুরআন, হাদীসের আলোকে রাসূল, সাহাবী ও বুয়ুর্গানে দ্বীনের জীবন জিন্দেগী সম্পর্কে নানা ঘটনাবলী। আরো রয়েছে— জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে দোয়া, আমলসমূহ, যা জানা ও আমল করার মধ্যে রয়েছে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন নাযাতের উপায়। এ গ্রন্থটি প্রকাশে যারা সার্বিক সহযোগিতা ও সুপরামর্শ দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। আর পাঠকদের প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে বইটি প্রকাশের সফলতা দান করেছেন। আমীন।

প্রকাশক

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

মুহাদ্দিসে কাবীর মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা. বা.)

উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ-এর

অভিমত

বিখরে মৃতী (ছড়ানো মানিক) গ্রন্থে মাওলানা ইউনুস পালনপুরী রঙ-বেরঙের ফুলকে একত্রিত করে একটি ফুলদানীতে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যাকে বর্তমানে একটি জ্ঞানকোষ বলা যেতে পারে। যার মধ্যে তিনি মূল্যবান মণি-মুক্ত জমা করেছেন। ইহাকে একটি দস্তরখানও বলা যেতে পারে। যার মধ্যে রুচীসম্মত অনেক ধরনের খাবার উপস্থিত করা হয়েছে। এ গ্রন্থে তাফসীর শাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্ম দিক আছে, তেমনিভাবে হাদীসের অনেক শিক্ষা ও মর্ম নিহিত রয়েছে। সাহাবা ও তৎপরবর্তী যুগের বুয়ুর্গানে দীনের জীবনী থেকে চয়ন করা হয়েছে দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট উৎসাহ সৃষ্টিকারী ঘটনাবলী। ইহাতে এমন কিছু দু'আও আছে যা অসংখ্য আমলের গুরুত্ব রাখে। আর এভাবে গ্রন্থটি পাঠকের মন জয় করে এক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

এ ছাড়াও দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ মুফতী আমীন পালনপুরীর সম্পাদনা গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে তা এখন পাঠকের জন্য সমাধিক উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা একে লেখকের আখিরাতের পাথেয় হিসেবে কবুল করুন এবং তাঁর বান্দাদেরকে উপকৃত করুন।

আমীনা॥

সাঈদ আহমদ পালনপুরী

খাদিম : দারুল উলূম দেওবন্দ

সূচিপত্র

তৃতীয়-খণ্ড

- পেরেশানী থেকে মুক্তির নববী সমাধান/১৫
- অশালীন বাক্যালাপ থেকে নিজ জিহ্বাকে রক্ষার নবুওয়াতী ব্যবস্থা/১৫
- শুধু নিয়তই সাওয়াবের কারণ হতে পারে/১৬
- সবচেয়ে প্রিয় আমল/১৬
- বাজারেও দু'আ কবুল হয়/১৭
- জ্বীনের অনিষ্ট থেকে হেফায়তের সহজ উপায়/১৭
- মহিলাদের সূরা নূর শিক্ষা দাও/১৮
- বিবাহ সাধাসিধে হওয়া চাই/১৮
- এক ঐতিহাসিক বিবাহ/১৯
- আকাশের দিকে তাকিয়ে ইন্তেগফার করুন/২৪
- আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. এর আয়াতুল কুরসী অভ্যাস/২৫
- উপদেশ মূলক কিছু কবিতা/২৫
- গোমরাহকারী ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়া উচিত/২৬
- শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা/২৬
- জালেম ও মজলুমের মধ্যে আল্লাহ মিমাংশা করে দিবেন/২৭
- সা'আদ বিন মুআয রা. এর ইন্তেকালের আশ্চর্য ঘটনা/২৮
- বিবি কেমন হওয়া উচিত/৩০
- কাজ-কর্ম সকাল থেকেই শুরু করুন, ইনশাআল্লাহ! বরকত হবে/৩২
- কোনো গোত্রের সর্দারকে সম্মান করা উচিত/৩২
- দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পাঁচটি অত্যন্ত কঠিনতর/৩৪
- ওয়াইল বিন হুজর রা. সাথে মুআবিয়া রা. এর আচরণ/৩৫
- আত্মহত্যাকারী কাফির নয়/৩৫
- ফিরিশতারা হযূর সা. কে শিঙ্গা লাগানোর তাকিদ করেছিলেন/৩৭
- জ্বীনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা/৩৭
- জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার উপায়/৩৮
- প্রবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে আমির বানিয়ে দেয়/৩৮
- এক মহিলার হযূর সা. এর কাছে তার স্বপ্নের বর্ণনা/৪০
- খানার মধ্যে শয়তানের হস্তক্ষেপ বাস্তবিক না কাল্পনিক/৪১
- সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত/৪২
- কাপড় পরিধানকারী আল্লাহ তা'য়ালার হেফায়তে থাকবে/৪৪

- মৃগী রোগে ধৈর্যধারণকারী এক মহিলাকে সুসংবাদ/৪৫
- হে উমর রা.! আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দুটি জান্নাতই দান করেছেন/৪৫
- কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে এক কুৎসিত আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে/৪৬
- একটি অবাস্তব নাম/৪৭
- অসৎ সঙ্গের পরিণতি/৪৯
- জানাযার নামায শিখ এবং এতে অংশ গ্রহণ কর/৪৯
- নামায কখন মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে/৫০
- যে ঘরে সূরা ইয়াসিন পাঠ করা হয় সে ঘরে শয়তানও পা রাখে না/৫০
- একটি দু'আ যার সাওয়াব আল্লাহ তা'য়ালা গোপন রেখেছেন/৫৪
- সহবাসে বাধা ও তার প্রতিকার/৫৫
- হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর বন্ধু উপাধি কিভাবে পেলেন/৫৫
- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক র. এর গুণাবলী ও তাঁর উক্তি/৫৬
- মাত্র একটি কলম ফেরত দেয়ার জন্য হাজারো মাইল সফর/৫৭
- মুসলমানকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখা/৫৭
- আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের অপ্রকাশিত সাওয়াব/৫৯
- ইবনে মুবারক তাঁর সাথীকে দরদ মাখা চিঠি লিখলেন/৬০
- আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. কে অভ্যর্থনা/৬২
- নেতৃস্থানীয়দের পদস্থলন দ্বারা অধিনস্তরাও প্রভাবান্বিত হয়/৬২
- মহিলারা কি প্রতারণা ও ছলনার প্রতিচ্ছবি/৬৩
- দীনের সুস্বাদু বিষয়কে জানার উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত কে/৬৩
- একটি জটিল মুকাদ্দমা ও তার মীমাংসা/৬৪
- হযরত জিবরাঈল আ. ঈসা আ. কে শিক্ষাদান/৬৬
- কাফির সাত নাড়ী ভর্তি করার নিয়তে খায়/৬৬
- ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে উম্মতের করণীয় কি/৬৭
- মুর্দা দিলের বাকপটু আলিম উম্মতের জন্য হুমকি/৬৯
- হযরত লোকমানের হিকমতের আশ্চর্যজনক ঘটনা/৬৯
- গুনাহের কারণে এক পাত্রী তার ঘরেই লাঞ্চিত হলো/৭০
- এক গ্রাম্য ব্যক্তির প্রশ্ন এবং রাসূল সা. উত্তর/৭১
- আসমাউল হুসনার বর্ণনা/৭৩
- আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলী জানা কেন প্রয়োজন/৭৭
- আসমাউল হুসনার সংখ্যা এবং মুখস্থকারীদের জন্য সুসংবাদসমূহ/৭৭
- তিরমিযী শরীফের হাদীস ও তার তরজমা/৭৮
- الله (আল্লাহ) এর বৈশিষ্ট্য/৮০
- الرحمن এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮২

- الرحيم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮২
- الملك এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৩
- القدوس এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৪
- السلام এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৫
- المؤمن এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৬
- المهيمن এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৬
- العزيز এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৭
- الجبار এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৮
- المتكبر এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৮
- الخالق এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৯
- الباري এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৮৯
- المصور এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯০
- الغفار এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯১
- القهار এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯১
- الوهاب এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯২
- الرزاق এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯৪
- الفتاح এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯৫
- العليم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯৫
- القابض এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯৬
- الباسط এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯৭
- الخافض এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯৮
- الرافع এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯৯
- المعز এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/৯৯
- المذل এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০০
- السميع এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০০
- البصير এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০১
- الحكم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০১
- العدل এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০২
- اللطيف এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০২
- الخبير এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৩
- الحليم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৩
- العظيم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৪
- الغفور এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৫

- الشكور এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৫
- العلي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৬
- الكبير এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৬
- الحفيظ এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৭
- المقيت এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৮
- الحسيب এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৯
- الجليل এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১০৯
- الكريم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১০
- الرقيب এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১০
- المجيب এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১১
- الواسع এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১১
- الحكيم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১২
- الودود এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১২
- المجيد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৩
- الباعث এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৩
- الشهيد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৪
- الحق এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৪
- الوكيل এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৫
- القوي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৫
- المتين এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৬
- الولي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৭
- الحميد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৭
- المحصي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৮
- المبدئ এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৮
- المعيد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৯
- المحي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১১৯
- المميت এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২০
- الحي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২১
- القيوم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২১
- الواجد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২২
- الماجد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৩
- الواحد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৩
- الأحد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৩

- الصمد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৪
- القادر এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৫
- المقتدر এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৫
- المقدم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৬
- المؤخر এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৬
- الأول এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৭
- الآخر এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৭
- الظاهر এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য/১২৮
- الباطن এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৮
- الوالي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১২৯
- المتعالي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩০
- البر এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩১
- التواب এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য/১৩১
- المنتقم এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩২
- العفو এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩২
- الرؤف এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৩
- مالك الملك এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৩
- ذو الجلال والإكرام এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৪
- المقسط এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৪
- الجامع এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৫
- الغني এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৫
- المغني এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৬
- المانع এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৭
- الضار এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৮
- النافع এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৮
- النور এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৯
- الهادي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৩৯
- البديع এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৪০
- الباقي এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৪১
- الوارث এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৪১
- الرشيد এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৪২
- الصبور এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য/১৪২

সূচিপত্র

চতুর্থ-খণ্ড

- আপনার ঘরে রহমত ও বরকতের বারি বর্ষণ/১৪৫
- ভদ্র ও সজ্জন স্বামীরা বিবিদের অভিমান সহ্য করে/১৪৬
- উম্মতের জন্য দু'আ করলে সব মুসলমান সমান নেকী পাবে/১৪৮
- শয়তানের পনেরো দুশমন/১৪৯
- যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায় আল্লাহও তার হয়ে যায়/১৪৯
- অহংকারীদের পরিণাম/১৫০
- সমুদ্রে হারানো সুঁই দু'আর বরকতে পাওয়া গেল/১৫১
- মেয়েরা নিজেদের ঘরের শোভা হিসেবে জীবন যাপন করবে/১৫১
- যে নারী দৃষ্টি কাড়তে পারে না সে কিভাবে হৃদয় কাড়বে/১৫৪
- হযরত আলী রা.এর সাথে আল্লাহর বিশেষ কুদরতের নিদর্শন/১৫৭
- মৃত্যু আসা যতটা নিশ্চিত মানুষ তা থেকে ততটাই গাফেল/১৫৮
- নিজের ইবাদতের ওপর গর্ব করা উচিত নয়/১৫৯
- অনর্থক কথাবার্তা থেকে দূরে থাকা উচিত/১৬১
- তাওয়াঙ্কুলের হাকিকত/১৬১
- হযরত কাতাদাহ রা. রাসূল সা. থেকে তিনটি জিনিস চেয়েছেন/১৬২
- শিশুদের সাথে রাসূল সা. এর ব্যবহার/১৬৩
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু উপদেশ/১৬৩
- ইমাম বুখারী র. এবং বুখারী আমিরের কাহিনী/১৬৬
- মাওলানা রুমী র. এর বাবা ও বাদশাহর ঘটনা/১৬৭
- হুসাইন রা. এর হত্যাকারী উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পরিণতি/১৬৮
- হুরদের সাথে হযরত সা'দ রা. এর বিবাহ/১৬৯
- বেনামাযীর অকল্যাণ/১৭১
- মায়ের সাথে বেয়াদবীর শাস্তি/১৭১
- বাহাদুর ইমাম বখশের ঘটনা/১৭২
- চেঙ্গিজ খান এবং সেকান্দরের কবর কোথায়/১৭২
- শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী র. এর নুরানী দিকনির্দেশনা/১৭৩
- রাসূল সা. এর নির্দেশের ওপর আমল করার ফলাফল/১৭৩
- কুরআনের ওপর আমলকারী এবং বিমুখ ব্যক্তির পরিণাম/১৭৪
- হযরত আয়েশা রা. দান করতেন এবং দু'আও করতেন/১৮১
- মহিলাদের দুর্বলতা/১৮২

- মহিলাদের প্রতি রাসূলের সা. এর নসিহত/১৮৩
- স্বামী-স্ত্রী একে অপরের শত্রু নয়/১৮৫
- প্রতিবেশির অনিষ্ট থেকে বাঁচার নববী প্রেসক্রিপশন/১৮৭
- শুধু চোখই নয়, হৃদয়ও অন্ধ হয়ে থাকে/১৮৮
- নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশের নববী পদ্ধতি/১৯০
- মানুষের দোষ খোঁজায় ব্যস্ত থেকো না/১৯০
- এক নওজোয়ান সাহাবী রাসূলের সাথে বিস্ময়কর ভালোবাসা/১৯০
- জান্নাতের নেয়ামত সমূহ এবং ছড়ানো মুক্তার আলোচনা/১৯২
- জান্নাতে পর্দা দিলে সন্ধ্যা হবে/১৯৬
- জান্নাতে কুমারী তরুণীদেরও বর্ষণ হবে/১৯৭
- জান্নাতে থাকবে দুধ, পানি, মধু ও শরাবের সমুদ্র/১৯৭
- জান্নাতে ছয়টি জিনিস থাকবে না/১৯৯
- উম্মে সালমা রা. এর বিস্ময়কর প্রশ্ন এবং রাসূল সা. এর উত্তর/১৯৯
- জান্নাতে হুরগণ লাভণ্যময়ী, লাস্যময়ী এবং রূপবতী হবে/২০০
- স্বামীর হৃদয় মুঠোয় ভরে রাখবে/২০২
- চলুন, জান্নাতে আদনে ভ্রমণ করি/২০২
- ইবাদতের কষ্ট দূর হয়ে যাবে/২০৬
- শিক্ষামূলক নসিহত/২০৯
- মূর্ততার অভিশাপ/২১২
- বৃদ্ধবয়সে মানুষ যেসব ধাপ অতিক্রম করে/২১৩
- হালাল সম্পদের সদকা আদায় আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন/২১৪
- হযরত লোকমান আ. এর উপদেশ বাণী/২১৫
- দীনদার গরীব ব্যক্তি জান্নাতের বাদশা হবে/২১৫
- দোয়া চাওয়ার আদাব/২১৬
- পেরেশানী থেকে মুক্তির নববী নির্দেশনা/২২৯
- বিসমিল্লাহর বৈশিষ্ট্য/২২৯
- এক ইয়াতিম শিশুর হৃদয়বিদারক ঘটনা/২৩৪
- কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার বন্ধন চরকার কাঠির ন্যায় হবে /২৩৬
- জিবরিল আ. হযুর সা. কে দু'আ শিখিয়েছেন/২৩৭
- ঘরের চাকর এবং প্রতিবেশিদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকুন/২৩৭
- নারীর সুকীর্তি হচ্ছে তার রুহের পরিচ্ছন্নতা/২৪০
- ক্রোধকে হজম করুন, পছন্দ মত হ্র বেছে নিন/২৪৩
- বন্ধু নিজের বন্ধুকে কষ্ট দেয় না/২৪৩
- আল্লাহ বান্দার ধ্বংস চাইলে, তার লজ্জা ওঠিয়ে দিবেন/২৪৩

- গোপন গোনাহের কারণে মুমিনদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়/২৪৪
- মাছির কারণে একজন জান্নাতে, অন্যজন জাহান্নামে/২৪৪
- আশুরার দিন সংঘটিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ/২৪৫
- রাসূল সা. তামিমে দারী রা. কে জামাতা বানানোর ইচ্ছা/২৪৬
- আল্লাহর প্রতিশ্রুতি/২৪৭
- বিশটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ/২৪৮
- সাপ, বিছু ইত্যাদি বিষধর প্রাণী থেকে বাঁচার দু'আ/২৪৯
- পেশাব বন্ধ হয়ে যাওয়া ও পাথরের নববী চিকিৎসা/২৪৯
- প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্তির নববী আমল/২৫০
- এক পিপড়ার দু'আয় সুলাইমান আ.এর পানি মিলেছে/২৫০
- ব্যথা দূর করার নববী আমল/২৫০
- আট আয়াতের সাওয়াব এক হাজার আয়াতের সমান/২৫১
- বিনয়ের কিছু মহান দৃষ্টান্ত/২৫১
- প্রথম কাতারে নামায আদায়কারী দিগুণ সাওয়াব পাবে/২৫৩
- রমযানে তেলাওয়াতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে/২৫৩
- হযরত দাউদ আ. এর মৃত্যুর আশ্চর্যজনক ঘটনা/২৫৩
- আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম বান্দা/২৫৪
- মুমিন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের আয়না/২৫৪
- তাওবাকারী বান্দা আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়/২৫৭
- সর্বোত্তম রহস্যবিদ হও/২৫৮
- বন্ধুদের মাঝে হাসি খুশি, উৎফুল্ল থাক/২৫৯
- মেয়েদের জন্মকে বোঝা মনে করো না/২৬১
- ন'টি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত/২৬২
- যারা চারটি বিষয় থেকে গাফেল/২৬২
- সালামে কেবল শান্তি আর শান্তি/২৬৪
- শহীদরা ছয়টি পুরস্কার পাবে/২৬৬
- হারাম খাদ্যের কারণে চল্লিশ দিন ইবাদত কবুল হয় না/২৬৬
- চাইলেন রুটি পেলেন চল্লিশ হাজার দিনার/২৬৭
- আল্লাহ তা'য়ালা নিজের বান্দাদের তাওবা কবুল করেন/২৬৮
- সগিরা গোনাহ আগামিকাল কবিরাহে যাবে/২৬৯
- কোনো কৌশলই মৃত্যুকে অপসারণ করতে পারবে না/২৬৯
- অনেক বড় অপরাধী একটি আয়াত শুনে পূণ্যবান হলো/২৭১
- দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূল সা. এর হৃদয়স্পর্শি বয়ান/২৭৩
- দাজ্জালের ফিতনা এবং কেয়ামতের আলামতসমূহ/২৭৫

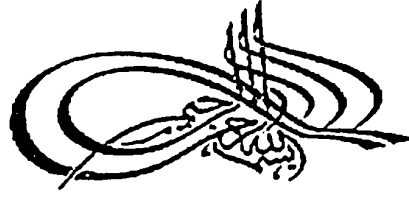
- অহংকারীদের পিঁপড়ার আকৃতিতে সমবেত করা হবে/২৭৯
- মেঘ থেকে আওয়াজ এলো চলো/২৭৯
- দীনদার ব্যক্তির জানাযা জাঁকজমকের সাথে হবে/২৮১
- মৃতের ওপর কান্নাকাটি করা/২৮৪
- রাসূল সা. এর মূল্যবান হাদিয়া/২৮৭
- যার ওসিলায় দু'আ করলে অবশ্যই কবুল হয়/২৮৮
- হুযূর সা. এর দু'আর বরকত/২৮৯
- পেরেশানী ও চিন্তা দূর করার নববী আমল/২৮৯
- পরিবারকে আল্লাহর হেফাযতে দেয়ার নববী আমল/২৮৯
- শয়তানের অকল্যাণ থেকে বাঁচার নববী নির্দেশনা/২৯০
- হে আদম সন্তান! রাগের সময় আমাকে স্মরণ কর/২৯০
- নিচের দু'আটি পড়লে পরীক্ষা থেকে সুরক্ষা করা হবে/২৯০
- ভয়ও আতংক দূর করার নববী আমল/২৯১
- ওলীদের পোশাক বিভিন্ন হয়/২৯২
- রমযানের প্রথম রাতেই মাগফিরাত করা হয়/২৯৪
- জিবরিল আ. ইয়াকুব আ. কে ওযীফা শিখিয়েছেন/২৯৪
- মুকাদ্দমায় সফলতা অর্জন করার সর্বোত্তম আমল/২৯৫
- সাধারণ নেকীও মাগফিরাতের কারণ/২৯৫
- একজন বিধবার আশ্চর্য কাহিনী/২৯৬
- একটি আশ্চর্য ওসিয়ত/২৯৮
- আল্লাহ আলেম ও তালিবে ইল্মের জন্য জান্নাতে শহর তৈরী করেন/২৯৯
- ইমাম মালিকের কন্যাদের ইলমী মর্যাদা/৩০০
- সব চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্তির নববী পদ্ধতি/৩০৫
- কেয়ামতের দিন অভাব থেকে বাঁচার নববী পদ্ধতি/৩০৫
- ভাষা ভালো ও মন্দ উভয়টিই রয়েছে/৩০৬
- পুরুষ তিন প্রকার/৩০৭
- পেরেশানী ও অভাব দূর করার নববী পদ্ধতি/৩০৭
- অন্তরের কাঠিন দূর করার নববী চিকিৎসা/৩০৭
- দীনি বোনকে আল্লাহ নিজের কুদরতে বাঁচিয়েছেন/৩০৮
- ইবনে মাসউদ রা. ঘর থেকে বিশেষ আওয়াজ শোনা যেত/৩০৯
- এক মদপানকারীর কাছে ওমর রা. এর চিঠি/৩০৯
- ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করবে/৩১০
- কা'বার গিলাফের পর্দা কখন থেকে ব্যবহার শুরু হলো/৩১১
- পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম হাযরামী পদ্ধতি/৩১২

- আল্লাহ তা'য়ালার কিছু নেয়ামতের আলোচনা/৩১৪
- পর্দার হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ/৩১৬
- বিশেষ কারো নাম নিয়ে সালাম করা কিয়ামতের আলামত/৩১৭
- বনি উমাইয়ায় রূপার বোতল পেল/৩১৮
- মা বাবা সন্তানের সাথে তিন ধরনের ব্যবহার করবে/৩১৮
- সুলতান মালিক শাহের ইনসাফের অনন্য উপমা/৩১৯
- কসম খেলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়/৩২০
- যার ঈমান রয়েছে তার থেকে বড় কোনো সম্পদশালী নেই/৩২১
- পরীক্ষা তো প্রেমিকের হয়, মুনাফিকের নয়/৩২৩
- দীনের কাজের পরিবেশ তৈরী করতে হয়/৩২৫
- কেয়ামতের দিন শাসকদের গলায় শৃঙ্খল থাকবে/৩২৬
- রাসূল সা. ইন্তেকালের সময় বলেছেন/৩২৭
- কেয়ামতের দিন গোনাহগারের চোখ লম্বা হবে/৩২৭
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এর পরীক্ষা/৩২৮
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এর কারামত/৩২৮
- ঘটনার বিবরণ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মুখে/৩২৯
- বিরল দৃঢ়তা ও সংকল্প/৩৩১
- ইমাম আহমাদ র. এর পুরস্কার/৩৩২
- শাফেঈ র. ও আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এর একটি ঘটনা/৩৩৩
- আল্লাহ বললেন, এটা আমার চেহারা তুমি দেখে নাও/৩৩৪
- আহমাদ ইবনে হাম্বলের লাশ সংরক্ষণ/৩৩৪

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক



https://t.me/islaMic_fdf



পেরেশানী থেকে মুক্তির নববী সমাধান

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি দুশ্চিন্তা বা পেরেশানীতে পতিত হবে, সে আযানের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, আযানের জবাব দেয়ার পর নিম্ন লিখিত দু'আটি পড়ে নিজের প্রয়োজন এবং সচ্ছলতার জন্য দু'আ করবে। ইনশাআল্লাহ তার দু'আ অবশ্যই কবুল হবে।

দু'আটি এই

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةُ الْحَقِّ وَكَلِمَةُ التَّقْوَى
اَحْيِنَا عَلَيْهَا وَاْمْتِنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا.

অশালীন বাক্যালাপ থেকে নিজ জিহ্বাকে রক্ষার নবুওয়াতী ব্যবস্থা

আবু নাজিম রা. 'হিলইয়া'তে হুজাইফা রা. থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট অশ্লীল উক্তির অভ্যাসের অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তুমি নিয়মিত ইস্তেগফার কর না কেন? আমি তো প্রতিদিন একশত বার ইস্তেগফার করে থাকি।

আবু নাজিম র. থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর

রাসূল সা.! আমার পরিবারের সাথে প্রায়ই কটুজিমূলক কথাবার্তা হয়ে যায়, আর এই বদ অভ্যাসটাই আমার জাহান্নামের আগুনে যাওয়ার কারণ হবে বলে মনে করছি। এর পর হযূর সা. এর উত্তরটি পূর্বের হাদীসের ন্যায় দেন। আমি তো প্রতিদিন একশত বার ইস্তেগফার করে থাকি। তুমিও নিয়মিত ইস্তেগফার করতে থাক। ইনশাআল্লাহ তোমার এই বদ অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।^১

শুধু নিয়তই সাওয়াবের কারণ হতে পারে

এক ব্যক্তি বাড়ি নির্মাণের সময় আলো বাতাসের জন্য ভেন্টিলেটর দিল। এরপর তার এই বাড়িতে বরকত ও দুআর জন্য এক বুয়ুর্গকে দাওয়াত করে নিয়ে এলো। বুয়ুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে এই ভেন্টিলেটরটি কেন দেয়া হল? উত্তরে বাড়ির মালিক বলল, ভিতরে আলো-বাতাস আসার জন্য ভেন্টিলেটর দেয়া হয়েছে। বুয়ুর্গ বললেন, নির্মাণের সময় এই নিয়ত করলে না কেন যে, এর দ্বারা আযানের আওয়াজ শোনা যাবে। আলো-বাতাস তো এমনিতেই এসে যেত।^২

সবচেয়ে প্রিয় আমল

হযরত ইসমাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল 'সুবহাতুল হাদীস' এবং সবচেয়ে অপছন্দনীয় আমল 'তাহরীফ'। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সুবহাতুল হাদীসের অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, সুবহাতুল হাদীস হলো, লোকজন যখন গল্প-গুজবে লিপ্ত থাকে তখন তাদের কথায় কান না দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার যিকির-আযকারে মগ্ন হয়ে যাওয়া। তারপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহরীফ বলতে কী বুঝায়? উত্তরে তিনি বললেন, তাহরীফ হলো এই যে, মানুষ সুখ-সাচ্ছন্দে থাকা সত্ত্বেও যখন তাকে তার কোনো প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধব তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন সে তার অবস্থা ভাল নেই বলে জানিয়ে দেয়। (অর্থাৎ, সে আল্লাহর নেয়ামতগুলো অস্বীকার করে বসে।)

^১. হায়াতুস সাহাবা: ৩: ৩৪৯।

^২. হেকায়েতে রুমী: ৮৯।

হযরত আবু ইদ্রীস খাওলানী র. বলেন, হযরত মুআয রা. ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখনই পরস্পরে কোনো মজলিসে বস তখনই অযথা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যাও। সুতরাং যখন মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার যিকির থেকে গাফেল দেখবে, তখন তোমরা পুরোপুরি আত্মহের সাথে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়ে যাবে।

বর্ণনাকারী ওলীদ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ বিন জাবির র. এর সম্মুখে হাদীসটি আলোচনা করা হলে তিনি তা সহীহ বলেছেন। হযরত আবু ত্বলহা হাকিম বিন দীনার র. বলেন, সাহাবায়ে কিরাম রা. বলতেন, মাকবুল দু'আর আলামত হলো এই যে, যখন তুমি মানুষকে গাফেল অবস্থায় দেখ তখন তুমি তোমার রবের যিকিরে মশগুল হয়ে যাও।^৭

বাজারেও দু'আ কবুল হয়

হযরত আবু ক্বালাবাহ রা. ইরশাদ করেন, দুই ব্যক্তির বাজারে সাক্ষাত হলো। তাদের মধ্যে একে অপরকে বলল, মানুষ এখন আল্লাহ তা'য়ালার যিকির থেকে গাফেল হয়ে আছে। এসো! আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সুতরাং প্রত্যেকে তাই করল। এরপর তাদের মধ্যে একজনের ইন্তে কাল হয়ে গেলে অপরজন তাকে স্বপ্নে দেখল, সে তাকে বলছে, তুমি কি জান, যখন আমরা সন্ধ্যায় বাজারে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করেছিলাম, তখনই আল্লাহ তা'য়ালার আমাদের গোনাহসমূহকে মাফ করে দিয়েছিলেন।^৮

জ্বীনের অনিষ্ট থেকে হেফাযতের সহজ উপায়

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর রা. বলেন, আমি হিমস থেকে বের হয়ে রাতে যমীনের এক বিশেষ অংশে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সেই এলাকার জ্বীনরা আমার কাছে আসলে আমি সূরা আ'রাফ শেষ পর্যন্ত পড়লাম :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

^৭. হায়াতুস সাহাবা: ৩:৩৪৩।

^৮. হায়াতুস সাহাবা: ৩:৩৪৩।

^৯. সূরা আ'রাফ: ৫৪।

এই আয়াতগুলো শুনে জ্বীনরা একে অপরকে বলল, এখন তো সকাল পর্যন্ত এর পাহারা দাও। (সুতরাং তারা সারা রাত আমার পাহারা দিল) সকালে আমি সাওয়ারীর ওপর আরোহন করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম।^৬

মহিলাদের সূরা নূর শিক্ষা দাও

হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ রা. বলেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব রা. কে বলতে শুনেছি, তোমরা অবশ্যই সূরা বাক্বারা, সূরা নিসা, সূরা মায়দা, সূরা হজ্ব ও সূরা নূর শিখ। কেননা আল্লাহ তা'য়ালার যে সমস্ত আমলসমূহকে ফরয করেছেন, তার সবগুলোই এই সূরাগুলোতে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত হারিসা বিন মুজাররব র. বলেন, হযরত উমর রা. আমাকে চিঠিতে লিখেছেন যে, তোমরা সূরা নিসা, সূরা আহযাব এবং সূরা নূর শিখ। হযরত উমর রা. বলেন, তোমরা সূরা বারাতা শিখ এবং তোমাদের মহিলাদের সূরা নূর শিক্ষা দাও। আর তাদের রূপার অলঙ্কার পরিধান করাও।^৭

বিবাহ সাধাসিধে হওয়া চাই

হযরত উরওয়াহ বিন জুবারের রা. বলেন, আমরা ক্বাবা শরীফ তাওয়াফ করছিলাম, তাওয়াফের মাঝে আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. কে তাঁর মেয়ের সাথে আমার বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি চুপ থাকলেন এবং এ প্রস্তাবে তিনি রাজী কি না তা কিছুই জানালেন না। আমি মনে করলাম, যদি তিনি এতে রাজী থাকতেন তা হলে এ ব্যাপারে কিছু না কিছু অবশ্যই জানাতেন। তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি এ প্রসঙ্গে তাঁর সাথে আর কোনো কথাই বলব না। আল্লাহর কি ইচ্ছা, তিনি আমার পূর্বেই মদীনায় পৌঁছে যান। এরপর আমি মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সা. এর রওয়া মুবারক যিয়ারত করলাম এবং হযরত আকরাম সা. এর শান অনুযায়ী হক আদায় করার চেষ্টা করলাম। অতঃপর হযরত ইবনে উমর রা. এর

^৬. হায়াতুস সাহাবা: ৩: ২২৬।

^৭. হায়াতুস সাহাবা: ৩: ২৬০।

খিদমতে হাযির হলাম। তিনি খুব মেহমানদারী করলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, কখন এসেছ? আমি বললাম এই মাত্র এসে পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আমরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলাম আর আমাদের চোখের সামনে আল্লাহ তা'য়ালাকে পাওয়ার ধ্যান করছিলাম, সে সময়ে তুমি আমার কাছে (আমার মেয়ে) সওদা বিনতে আব্দুল্লাহর আলোচনা করছিলে, অথচ তুমি আমাদের সাথে এ ব্যাপারে অন্য কোথাও দেখা করতে পারতে? আমি বললাম, আসলে ব্যাপারটা এ রকমই হওয়ার ছিল, তাই এমনই হয়ে গেল। তিনি বললেন, এখন তোমার এ ব্যাপারে কি খেয়াল? আমি বললাম, এখনতো আমি আগের চেয়ে বেশী আগ্রহী। অতঃপর তিনি তাঁর দুই ছেলে হযরত সালিম এবং হযরত আব্দুল্লাহকে ডেকে আমার সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন।^৮

এক ঐতিহাসিক বিবাহ

একজন পিতা যখন তার মেয়েকে বিবাহের পর কারো কাছে সোপর্দ করে, তখন তার জন্য এ মুহূর্তটা যে কতই নাজুক মুহূর্ত, এর অনুমান শুধু তারাই করতে পারবে, যারা এ অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করেছে। বড় বড় ব্যক্তিদের পা এখানে এসে পিছলিয়ে যায়।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাহ্যিকভাবে এটা তো একেবারেই অসম্ভব মনে হয় যে, একজন পিতা তার মেয়ের বিবাহের জন্য বাদশাহ, আমীর, শাহজাদাকে পছন্দ করার ক্ষেত্রে একজন গরীব তালীবুল ইলমকে পছন্দ করবে। বর্তমান যুগে তো এ ধরনের কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু ইতিহাসে এমন একটি সময়ও অতিবাহিত হয়েছে, যা অসম্ভব ছিল না, বরং বাস্তবে তা পরিণত হয়েছিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র. একজন বিখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তিনি খিলাফতের দ্বিতীয় বছরে মদীনার এক সাহাবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ৯৪০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র. বড় বড় সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিখ্যাত হাফেযে হাদীস সাহাবী হযরত আবু

হুয়ায়রা রা. তার শ্বশুর ছিলেন। তাই বিশেষভাবে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এ জন্যই সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র. থেকে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই হযরত আবু হুয়ায়রা রা. থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি সে যুগের বড় আলিম এবং বুয়ূর্গ ছিলেন। মায়মুন বিন মেহরান র. বলেন, যখন আমি মদীনায় গিয়ে সেখানকার সবচেয়ে বড় ফকীহের সাথে সাক্ষাতের আশ্রয় প্রকাশ করলাম, লোকজন তখন আমাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের ঘরে পৌঁছে দিলেন। ইবনে হিব্বান র. বলেন, “তিনি সমগ্র মদীনাবাসীর সর্দার ছিলেন।” হযরত হাসান বসরী র. এর মত ব্যক্তি যখন কোনো মাসআলায় সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তাঁর কাছে তা লিখে পাঠাতেন।

তাকওয়া-পরহেযগারী এ পর্যায়ের ছিল যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সা. এই ব্যক্তিকে দেখতেন, তাহলে অত্যন্ত খুশী হতেন। তিনি জামাতের সাথে নামায পড়া এত পাবন্দী করতেন যে, চল্লিশ বছর যাবত বিনা জামাতে এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েননি। মদীনার ইতিহাসে “হারারা”র ঘটনাটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই ঘটনাটি ইয়াযিদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা. এর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সময়কার ঘটনা। মদীনাবাসীরা যখন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের সহযোগীতায় আব্দুল্লাহ হানযালাকে সর্দার বানিয়ে ইয়াযিদের বাইআতকে অস্বীকার করল, তখন ইয়াযিদের সৈন্যরা মদীনায় লুটপাট ও গণহত্যা চালাতে লাগল। এই গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কেউ ঘরের বাইরে পা রাখারও হিম্মত করত না। মসজিদগুলো বিরাণ পড়েছিল। এই নাজুক পরিস্থিতিতেও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র. মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। লোকজন তাঁকে দেখে বলত, “এই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখ, এহেন পরিস্থিতিতেও মসজিদে যাওয়া বন্ধ করছে না।”

উমাইয়া শাসনের বাণী মারওয়ান বিন হাকাম তার পরে পর্যায়ক্রমে আব্দুল মালিক ও তার ভাই আব্দুল আযিযকে খলীফা বানিয়ে গিয়েছিলেন। মারওয়ানের ইন্তেকালের পর আব্দুল মালিক ষড়যন্ত্র করে আব্দুল আযিযকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তার দুই ছেলে ওলীদ এবং সুলাইমানকে বসাতে চাইল। কিন্তু পরে কুবাইসা বিন যুওয়াইবকে বোঝানোর পর এ ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকল। এ দিকে ভাগ্যক্রমে আব্দুল আযিযের অতি তাড়াতাড়ি ইন্তেকাল হয়ে যায়।

এখন আব্দুল মালিক এই সুযোগে ওলীদ এবং সুলাইমানকে সিংহাসনের বাদশাহ বানিয়ে তাদের বাইআত গ্রহণের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণরদের কাছে ফরমান জারি করে পাঠালেন। মদীনার গভর্ণর হিশাম বিন ইসমাইল মদীনাবাসীদের বাইআত গ্রহণের জন্য সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবকে ডাকল, কিন্তু তিনি এই উত্তর দিলেন যে, “আমি আব্দুল মালিকের জীবদ্দশায় অন্য কারো বাইআত গ্রহণ করব না।” ইহা অত্যন্ত এক কঠিন ব্যপার ছিল। কেননা সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব-এর বিরোধিতা করাটাই মদীনাবাসীর বাইআত গ্রহণ না করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই হিশাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবকে বেত্রাঘাত করল এবং কঠিন শাস্তি দিল। এরপর আবু বকর বিন আব্দুর রহমানকে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পাঠাল। সে ফিরে আসলে হিশাম জিজ্ঞেস করল, সাঈদ কি শাস্তির পর নরম হয়েছে? উত্তরে বললেন, তোমার এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সে আগের চেয়ে আরো বেশী কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাই তুমি নিজেকে সামলিয়ে রাখ।

এখন আব্দুল মালিক ভিন্ন এক কৌশল অবলম্বন করল। যাকে সে শাস্তি দিয়ে কাবু করতে পারল না তাকে দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে কাবু করার ব্যর্থ চেষ্টা শুরু করল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের এক মেয়ে দেখতে-শুনতে আখলাকে অতুলনীয় ছিল। সেই সাথে উচ্চ শিক্ষিতাও ছিল। সে চিন্তা করল যদি শাহজাদাকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে তাকে বউ বানিয়ে নেয়া যায়, তাহলে এমনিতেই পিতা নরম হয়ে যাবে। সে মদীনার গভর্ণর হিশাম বিন ইসমাইল আল মাখযুমী (যে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের পছন্দের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিল) কে তাকে এ ব্যপারে রাজী করার দায়িত্ব দিলেন।

হিশাম তার ব্যর্থতার কথা ভালভাবেই জানত। তবুও বাদশাহর আদেশ পালনার্থে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের খিদমতে হাযির হল। তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে এক পর্যায়ে সে বলল, আপনিতো জানেন, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান জনসাধারণের কাছ থেকে তার দুই ছেলে ওলীদ ও সুলাইমানের জন্য বাইআত গ্রহণ করতে চাচ্ছে। কিন্তু বাইআত গ্রহণের পূর্বে সে এটাও চাচ্ছে যে, ওলীদকে আপনার জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন। এ কথা শোনা মাত্রই সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের চেহারা রাগে ফুলে উঠল। তিনি বললেন, “এই দুইটির মধ্যে একটিও আমি গ্রহণ করতে রাজী নই।”

তার এই অস্বীকৃতির কারণে পুণরায় বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ভোগ করতে হল এবং নানাভাবে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হল। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর অটল ছিলেন। আবার মেয়ের ব্যাপারেও চিন্তা করতে লাগলেন যে, উপযুক্ত কোনো প্রস্তাব পেলে তাকে বিয়ে দিয়ে দিবেন। এর পর কুরাইশের আবু ওদাআহ নামী এক অপরিচিত গরীব ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান আবু ওদাআর ভাষায় এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন, যার তরজমা নিম্নরূপ:

আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের মজলিশে পাবন্দীর সাথে বসতাম। একবার বেশ কিছু দিন যাবত তাঁর মজলিশে উপস্থিত হতে পারিনি। এরপর যখন গেলাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? উত্তরে আমি বললাম, আমার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছে, তাই উপস্থিত হতে পারিনি। তিনি বললেন, আমাদের কেন খবর দাওনি? আমরাও তার কাফন-দাফনে শরীক হতাম। মজলিশ শেষে যখন উঠছিলাম তিনি বললেন, তুমি কি দ্বিতীয় বিবির কোনো ব্যবস্থা করেছ? আমি বললাম, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার ওপর রহম করুন, আমার কাছে কি কেউ মেয়ে বিয়ে দিবে? আমি তো মাত্র দুই-চার পয়সারই মালিক। তিনি বললেন, যদি আমি তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করি তাহলে কি তুমি এতে রাজী আছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে। এরপর তিনি বিয়ের খুতবা পড়লেন এবং দুই অথবা তিন দিরহাম মোহরের বিনিময়ে তাঁর মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

আবু ওদাআহ বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে উঠলাম। আমি খুশীতে এতটাই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে আমি কী করব? বাড়ি গিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম, এখন রোখছতীর জন্য কর্জ কোথায় পাব? মাগরিবের নামায পড়লাম। সেদিন রোযা থাকার কারণে নামাযের পরে যবের রুটি ও যায়তুনের তেল নিয়ে খেতে বসলাম, এমন সময় দরজা নক করার আওয়ায পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? বাহির থেকে আওয়ায আসল, আমি সাঈদ! আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবকে বাদ দিয়ে এ নামে বাকীদেরকে কল্পনা করতে লাগলাম। কেননা সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবকে চল্লিশ বছর ধরে ঘর এবং মসজিদ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায়নি। উঠে যখন দরজা খুললাম,

সাদ্দ ইবনে মুসাইয়্যিবকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁকে দেখেই আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়ত তাঁর নিয়ত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তাই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য এসেছেন। আমি বললাম, আবু মুহাম্মদ! (ইবনে মুসাইয়্যিবের উপনাম) আপনি কেন কষ্ট করে আসলেন? আমাকে খবর দিলেই তো পারতেন। তিনি বললেন, না এই সময় আমারই আসার প্রয়োজন ছিল। আমি বললাম, তাহলে বলুন, কী হুকুম নিয়ে এসেছেন? তিনি বললেন, ভাবলাম যে তোমার বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তুমি ঘরে একা থাকছ, তাই আমার মন মানছিল না যে তুমি একাই থাকবে, এই নাও তোমার বিবি। সে সময় ইবনে মুসাইয়্যিবের মেয়েটি ঠিক তাঁর পিছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি মেয়েকে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং বাহির দিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

আমার বিবি লজ্জায় পড়ে গেল। এরপর আমি ভিতর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং বাড়ির ছাদে উঠে পাড়া প্রতিবেশীদের খবর দিলাম। সকলে জমা হলে আমি ঘটনা খুলে বললাম যে, সাদ্দ ইবনে মুসাইয়্যিব আজ তাঁর মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছেন এবং আজই হঠাৎ করে মেয়েকে আমার ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন সে ঘরেই আছে। লোকজন এসে তাকে দেখল। আমার আশ্মাও খবর পেয়ে চলে আসলেন। আশ্মা বললেন, তুমি তার কাছে যেতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে না দিব। এরপর যখন আমি তার কাছে গেলাম, তাকে একজন সুন্দরী নারী, কুরআনের হাফেযা, হাদীসের আলিমা এবং স্বামীর হক আদায়কারিনী হিসেবে পেলাম।

আবু ওদাআ র. বলেন, এরপর এক মাস যাবত ঘরেই ছিলাম। সে সময় সাদ্দ ইবনে মুসাইয়্যিবের কোনো খবরাখবর জানতে পারিনি এবং তাঁর সাথে কোনো সাক্ষাতও হয়নি। এক মাস পর তাঁর মজলিশে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়ে তাঁকে সালাম জানালে তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু সমস্ত লোক মজলিস থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কোনো কথা বললেন না। যখন আমি ব্যতীত সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল না, তখন তিনি বললেন, তোমার সাথী-র কী অবস্থা? আমি বললাম, খুবই ভাল। তিনি বললেন, ان رابك شيء فاعصا (অর্থাৎ যদি সে কোনো অপছন্দনীয় কাজ

করে, তাহলে তাকে শাস্তি দিতে পার।) এরপর আমি ঘরে ফিরে আসলাম। আর এই সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের মেয়ে যার জন্য খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তার ছেলে ওলীদের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। আর এটা সে সময় যখন আব্দুল মালিক তার ছেলেকে পরবর্তী সিংহাসনে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে ছিল। কিন্তু সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। এই জন্য তাঁকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হত এবং তার শরীরের ওপর ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দেয়া হতো।^৯

আকাশের দিকে তাকিয়ে ইস্তেগফার করুন

হযরত আলী বিন রাবিআ রা. বলেন, আমাকে হযরত আলী রা. তাঁর সাওয়ারী পিছনের বসিয়ে ‘হারারা’ নামক স্থানে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! গোনাহসমূহকে মাফ করে দিন। কেননা আপনি ব্যতীত আর কেউ গোনাহ মাফকারী নেই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু‘মিনীন! আপনাকে দেখলাম, প্রথমে আপনি আল্লাহ তা‘য়ালার কাছে ইস্তেগফার পড়লেন, এরপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। এর কারণ কী? তিনি উত্তরে বললেন, একদিন হুযূর সা. আমাকে তাঁর সাওয়ারীর পিছনে বসিয়ে হারারা নামক এই স্থানে নিয়ে এলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমার গোনাহগুলো মাফ করে দিন।

কেননা, আপনি ব্যতীত আর কেউ গোনাহ মাফকারী নেই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! প্রথমে আপনি মহান আল্লাহ তা‘য়ালার কাছে ইস্তেগফার করলেন, এরপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন, এর কারণ কি? হুযূর সা. বললেন, আমি এই জন্য হেসেছি যে, আমার আল্লাহ তা‘য়ালার বান্দার উপর এই জন্য খুশী হয়ে হাসেন যে, এই বান্দারতো জানাই আছে যে, আমি ব্যতীত আর কেউ গোনাহ মাফকারী নেই।^{১০}

^৯. মাসিক “রিদওয়ান” লঙ্কৌ, অক্টোবর সংখ্যা: ১৯৬৬, পৃ.১১।

^{১০}. হায়াতুস সাহাবা: ৩: ৩৫০।

আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. এর আয়াতুল কুরসীর অভ্যাস

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উবায়দ বিন উমায়ের র. বলেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. যখন নিজ ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তার চারকোণে আয়াতুল কুরসী পড়তেন।^{১১}

উপদেশ মূলক কিছু কবিতা

عليك بتقوى الله إن كنت غافلاً ! يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري

প্রয়োজন তোমার তাকওয়া অর্জন করা, যদি তুমি গাফলতের মধ্যে থাক।
তিনি তোমাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দিবেন যার কল্পনাও তুমি
করনি।

فكيف تخاف الفقر والله رازقنا ! فقد رزق الطير والحوت في البحر

যখন রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহই,
তখন তুমি কিসের দরিদ্রতার ভয় করছ?
তিনি তো পশু-পাখি সমুদ্রের মাছকেও রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন।

ومن ظن أن الرزق يأتيه بقو ! ما أكل العصفور شيئاً مع النسر

যে এ কথা মনে করে, রিযিক একমাত্র শক্তি বলেই অর্জন করা যায়।
তাহলে শকুন থাকতে চড়ুইপাখি কিছুই খেতে পারত না।

ترود من الدنيا فإنك لا تدري ! إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر

দুনিয়াকে একজন মুসাফিরের পাথেয়-এর ন্যায় অর্জন কর,
এই জন্য যে, তোমার নেই জানা,
রাতের আঁধার যখন তোমার ওপর ছেয়ে যাবে
তুমি সকাল পর্যন্ত জীবিত থাকবে কি না?

فكم من صحيح مات من غير علة ! وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر

কত সুস্থ মানুষ কোনো ধরনের অসুস্থ ছাড়াই মৃত্যুর মুখে পতিত
হয়েছে,

আবার কতক অসুস্থ মানুষ যুগ যুগ ধরে জীবন যাপন করেছে।

وكم من فتي وأمسي وأصبح ضاحكا ! وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا تدري

আর কতক যুবক সকাল-সন্ধ্যা হেসে বেড়াচ্ছে,
অথচ তাদের খবরই নেই যে, তাদের ওপর কাফনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

فمن عاش ألفا وألفين ! فلا بد من يوم يسير إلى القبر

যে হাজার, দু'হাজার বছর যাবত জীবিত আছে,
তাকেও একদিন না একদিন কবরে যেতে হবে।

গোমরাহকারী ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়া উচিত

হযরত উমর রা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে তার দু'আ শুধু ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছে। হযরত উমর রা. বললেন, আয় আল্লাহ! আমি তার দু'আর মধ্যে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তারপর তাকে বললেন: তুমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এটা চাও যে, তিনি তোমাকে বিবি-সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ না দিক (কুরআনে ধন সম্পদ ও সন্তানাদিকে ফিতনা বলা হয়েছে) তোমাদের মধ্যে কেউ ফিতনা থেকে বাঁচতে চায়। তার উচিত সে যেন গোমরাহকারী ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।^{১২}

শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা

হযরত শা'বী র. থেকে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার দশটি আয়াত রাতে নিয়মিত পাঠ করবে, সে ঘরে সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। ঐ দশটি আয়াত এই: বাকারার প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী, এরপর দুই আয়াত ও সূরা বাকারার শেষের তিনটি আয়াত।^{১৩}

কিস্তীতে বেশী মূল্যে ক্রয় করা জায়য

আপনি হয়তো দেখেছেন, যেসব দোকানদার কিস্তীতে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে, তারা সাধারণ বাজারমূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্যে বিক্রি করে থাকে। যেমন: একটি মোটর সাইকেলের মূল্য সাধারণ বাজারে ৩০,০০০ টাকা। কিন্তু কিস্তীতে বিক্রেতা এর মূল্য ৩৫,০০০ টাকা ধরবে। এবার

^{১২}. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ. ৩৬০।

^{১৩}. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ. ৩২৫।

যদি এর মূল্য সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এবং কিস্তীগুলো নির্ধারিত হয়ে যায় যে, কত কিস্তীতে তা পরিশোধ করা হবে। তবে এই সূরত জায়িয়। অবশ্য ক্রেতা যদি কোনো কিস্তী সময়মত আদায় না করে, তাহলে এর কারণে মূল্য বাড়বে না। কারণ একবার যেহেতু মূল্য নির্ধারণ হয়ে গেছে। সেহেতু এতে পরবর্তীতে আরো বৃদ্ধি করা জায়িয় নেই।^{১৪}

জালেম ও মজলুমের মধ্যে আল্লাহ মিমাংশা করে দিবেন

হযরত আনাস রা. বলেন, আমি একবার নবী কারিম সা. কে দেখলাম তিনি হাসছিলেন, তখন হযরত উমর রা. জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. কোন বিষয়টি আপনার হাসার কারণ হতে পারে? তিনি বললেন, আমার দুই উম্মত আল্লাহর সামনে হাটুতে টেক লাগিয়ে দাঁড়াবে। একজন আল্লাহকে বলবে, হে আল্লাহ! যে আমার ওপর অন্যায় করেছে, আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই। আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তি (মজলুম) কে বলবেন তোমার জুলুমের প্রতিশোধ নাও।

অন্যায়কারী উত্তরে বলবে, হে আল্লাহ! এখন আমার আর কোনো নেকী অবশিষ্ট নেই যে, আল্লাহ আমার অন্যায়ের পরিবর্তে তাকে তা দিয়ে দিব, তখন ঐ মাজলুম বলবেন, হে আল্লাহ! আমার গোনাহর বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দিন। একথা বলতে বলতে হযর সা. গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন যে, ঐ সময় খুব কঠিন দিন হবে। তখন মানুষের নিকট ঐ কথাগুলোর খুব গুরুত্ব পাবে। বলবে আমার গোনাহর বোঝা যদি কারো ওপর চাপিয়ে দিতে পারতাম।

ঐ মুহূর্তে আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে বলবেন, যে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চায়। তাকে বলবেন, তুমি জান্নাতের দিকে তাকাও, সে মাথা উঠিয়ে জান্নাতের দিকে তাকাবে এবং বলবে হে আল্লাহ! সেখানে তো সোনা চান্দি এবং মতির তৈরী মহল দেখা যাচ্ছে। হে আল্লাহ! ঐ মহল কি কোনো নবী বা সিদ্দিক অথবা শহিদদের হবে? আল্লাহ বলবেন। যে তার মূল্য পরিশোধ করতে পারবে তাকে তা দিয়ে দেয়া হবে, সে বলবে হে আল্লাহ! কে তার মূল্য পরিশোধ করতে পারবে? আল্লাহ বলবেন, তুমি তার মূল্য পরিশোধ

^{১৪}. দরসে তিরমিযী: মাও: তাকী উসমানী: খ.৪, পৃ. ১০৪।

করতে পারবে? তখন সে জিজ্ঞাসা করবে, হে আল্লাহ কিভাবে? আল্লাহজালা শানুহ বলবেন, এই ভাবে যে তুমি তোমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও। সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ তা'য়ালার বলবেন, এখন তোমরা দু'জন একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ কর। তারপর হুযূর সা. বললেন, “আল্লাহকে ভয় কর, নিজেদের মধ্যে মিমাংশার মনমানষীকতা বজায় রাখো”। কেননা কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ পাক নিজে মুমিনদের একে অপরের মধ্যে মিমাংশা করে দিবেন।

(তাকসীরে ইবনে কাসীর: খ.২, পৃ.২৬৯)

সাঁ'আদ বিন মুআয রা. এর ইন্তেকালের আশ্চর্য ঘটনা

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে, যখন (বিখ্যাত আনসারী সাহাবী) সাঁ'দ বিন মুআয রা. ইন্তেকাল করলেন, আমরা হুযূর সা. এর সাথে তার জানাযায় শরীক হতে গেলাম। জানাযা পড়ানোর পর তাঁকে কবরে রেখে মাটি সমান করে দেয়া হল। এরপর হুযূর সা. সেখানে দাঁড়িয়ে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পড়তে লাগলেন। (এ অবস্থায় হুযূর সা. কে দেখে তাঁর অনুসরণ করতে গিয়ে) আমরাও কিছুক্ষণ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পড়তে থাকলাম। আবার তিনি আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার পড়তে লাগলেন। আমরাও তাঁর অনুসরণ করে আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার পড়তে লাগলাম। আমরা হুযূর সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সময় আপনার তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার বিশেষ কি কোনো কারণ ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর এই বান্দার কবরটি কিছু সময়ের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল (যাতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল) এরপর কিছু সময়ের মধ্যে সংকীর্ণতা দূর হয়ে কবরটি তাঁর জন্য প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার কষ্ট দূর হয়ে যায়।

(মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা: সাঁ'দ বিন মুআয রা. আনসারদের মধ্যে একজন মশহুর সাহাবী ছিলেন।

- (১) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।
- (২) সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জানাযায় শরীক হয়েছিল।
- (৩) আসমানের দরজাগুলো তাঁর জন্য খুলে দেয়া হয়েছিল।
- (৪) তাঁর মৃত্যুতে দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালার আরশ প্রকম্পিত হয়েছিল।

(৫) হযূর সা. এর সীনা মুবারক অথবা উরুতে মাথা রেখে তাঁর ইন্তে কাল হয়েছিল।

(৬) হযূর সা. নিজ হাতে তাঁর কবর খনন করেছেন।

(৭) প্রতি কোদালের আঘাতে তাঁর কবর থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিল।

(৮) বনু কুরাইযার ব্যপারে সা'দ বিন মুআয রা. যে ফয়সালা করেছিলেন, সেই ফয়সালাই আল্লাহ তা'য়ালা আসমানের ওপর করে রেখেছিলেন।

(৯) তাঁর কবর থেকে যখন মিশকের সুগন্ধি বের হত। তখন হযূর সা. বলতেন, বাহ! বাহ! কতই না মধুর। একজন মর্দে মু'মিনের কবরের সুগন্ধি।

(১০) যেই কক্ষে সা'দ বিন মুআয রা. এর লাশ রাখা হয়েছিল, সেই কক্ষটি অসংখ্য ফিরিশতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। একজন ফিরিশতা তার ডানা উঠালে হযূর সা. বসার স্থান পেলেন।

(১১) যখন তাঁর জানাযা উঠানো হল, তখন হযূর সা. বললেন, ফিরিশতারা তাঁর জানাযা উঠিয়েছে। এতদসত্ত্বেও তাঁর কবর সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল (যদিও পরক্ষণেই তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল) এতে আমাদের জন্য অনেক কিছু শিখার আছে।

اللهم ارحمنا اللهم احفظنا (আয় আল্লাহ! আমাদের ওপর রহম করুন। আমাদের কবরের আযাব থেকে হেফাযত করুন।)

দুমাতুল জানদালের বাদশাহ হযূর সা. এর খিদমতে এক রেশমী জুব্বা হাদিয়া দিয়েছিলেন। সাহাবীগণ ইতিপূর্বে কখনও এত মূল্যবান এবং সুন্দর জুব্বা দেখেনি। তাই তা স্পর্শ করে এবং এর কোমলতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। রাসূল সা. তখন বললেন, তোমরা এর কোমলতায় আশ্চর্যবোধ করছ, জান্নাতের মধ্যে সা'দ বিন মুআযের রুমালগুলো হবে এর চেয়েও উত্তম এবং মোলায়েম।^{১৫}

^{১৫}. সিয়রু আ'লামিন নুবালা: ২৮৪, মুসলিম, তিরমিযী, হায়াতুস সাহাবা।

বিবি কেমন হওয়া উচিত

মহিলাদের নিয়ে বর্ণিত চরিত্রগুলো থাকা উচিত। এতে বিবাহ বন্ধনে স্থায়িত্ব ও বরকত হয়।

(১) মেয়ে পূণ্যবতী এবং দীনদার হওয়া। এই চরিত্র দুইটি থাকা অত্যন্ত জরুরী। যদি কোনো মেয়ে নিজ সতীত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে দুর্বল হয়, তাহলে পরস্পরে সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করবে। এ জন্য হযূর সা. ইরশাদ করেছেন: *تنكح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.*

অর্থ: মহিলাদের বিবাহ কর চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে। তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য এবং দীনদারী। অতঃপর দীনকেই প্রাধান্য দাও। তোমার হাত (নিআমতরাজী দ্বারা) পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

(২) মেয়ে সুন্দর আখলাকের অধিকারী হওয়া। যে ব্যক্তি চিন্তামুক্ত এবং তার দ্বীনের কাজে সহায়তাকারী হিসাবে তাকে পেতে চায়, তার জন্য তো এ ধরণের আখলাকের মেয়ে হওয়া জরুরী। এ রকম যদি পাওয়া যায়, তাহলে তো তা বড়ই গণীমত।

কোনো এক আরব লোকের উক্তি, “ছয় ধরণের মেয়েদের বিয়ে করো না।” ১. *أثمنة*: ঐ মেয়ে, যে সামান্য পেরেশানীতে হতাশ হয়ে যায়।

২. *منانة*: ঐ মেয়ে, যে সর্বদা স্বামীর প্রতি তার অনুগ্রহের কথা বলে।

৩. *حنانة*: ঐ মেয়ে, যে পূর্বের স্বামী বা সন্তানের প্রতি আসক্ত থাকে।

৪. *حداقة*: ঐ মেয়ে, যে সবকিছু স্বামীর কাছ থেকে আদায় করতে চায়।

৫. *براقة*: ঐ মেয়ে, যে লৌকিকতায় বিশ্বাসী।

৬. *شداقة*: ঐ মেয়ে যে বেশী কথা বলে।

এই ছয় ধরণের মেয়েদের বিয়ে করা উচিত নয়। হযূর সা. ইরশাদ করেছেন: *ان الله يبغض الثرثارين المتشدقين.* আল্লাহ তা'য়ালা বাচাল প্রকৃতির লোকদের ওপর রাগান্বিত হন।

(৩) মেয়ে সুন্দরী হওয়া, স্ত্রী যদি সুন্দরী হয়, তাহলে নয়রের হেফাযত হয়। তাই বিবাহের পূর্বে দেখে নেয়া উত্তম। আল্লাহ তা'য়ালা ‘জান্নাতের

হ্রদের' প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন: خيرات حسان (সচ্চরিত্র সুন্দরী রমণীগণ) فاصرات الطرف (আনত নয়না রমণীগণ)। সুতরাং যে মেয়েদের মধ্যে এই গুণ থাকবে, সে জান্নাতের হ্রসদৃশ।

(৪) মোহর কম হওয়া। হুযূর সা. ইরশাদ করেছেন যে, সেই উত্তম বিবি যে সুন্দরী এবং যার মোহর কম। তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে বরকতময় ঐ মহিলা, যার মোহর কম। যেমনিভাবে মহিলাদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত মোহরের দাবী করা মাকরুহ, তেমনিভাবে পুরুষেরও মেয়ের থেকে ধন-সম্পদের আশা রাখা ও দাবী করা মাকরুহ। মেয়েদের ধন-সম্পদ দেখে বিয়ে করা উচিত নয়। হযরত সুফিয়ান সাওরী র. বলেন: যখন কোনো ব্যক্তি বিয়ের আলোচনায় মেয়ের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জানতে চায়, তখন তাকে একজন চোর বলে মনে করবে। আবার কোনো স্বামী তার শ্বশুর বাড়িতে কিছু হাদিয়া পাঠানোর সময় যেন এ আশা না রাখে যে, সেখান থেকে এর চেয়ে বেশী আসবে। এমনিভাবে মেয়ে পক্ষও যেন স্বামীর পক্ষ থেকে বেশী পাওয়ার আশা না রাখে। এ ধরনের চিন্তাধারা থাকাও দোষণীয়। হ্যাঁ, তবে হাদিয়া দ্বারা পরস্পরে মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। হুযূর সা. ইরশাদ করেন: **لما دوا** তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও, পরস্পরে মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে।

(৫) বন্ধ্যা মেয়ে না হওয়া। যদি মেয়ের বন্ধ্যাত্বতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাহলে তাকে বিবাহ না করা উত্তম। কেননা হুযূর সা. ইরশাদ করেন: **عليكم بالولود الودود** (তোমরা এমন মেয়েকে বিয়ে কর, যার সন্তানাদি হওয়ার আশা আছে এবং সে তার স্বামীকে মুহাব্বতও করবে।

(৬) কুমারী মেয়ে হওয়া। কুমারী হলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল-মুহাব্বত বেশী থাকে।

(৭) মেয়ে বংশ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া। অর্থাৎ এ রকম বংশের হওয়া উচিত, যাদের মধ্যে সততা এবং উত্তম আখলাক পাওয়া যায়। কেননা, এ ধরনের বংশের মেয়েরা নিজ সন্তানকে সঠিক ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারে। যা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন বংশের মেয়েরা পারে না।^{১৬}

কাজ-কর্ম সকাল থেকেই শুরু করুন, ইনশাআল্লাহ! বরকত হবে

সাখরুল গামদী রা. বর্ণনা করেন, হযূর সা. আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য সকালকে বরকতময় করে দিন। তাই হযূর সা. যখনই কোনো সৈন্যদলকে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করাতেন, সকালেই পাঠিয়ে দিতেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত সাখর রা. একজন ব্যবসায়ী সাহাবী ছিলেন। তিনি সর্বদা ব্যবসায়িক মালামাল ভোরেই বাজারে পাঠিয়ে দিতেন। এরই বরকতে তিনি সচ্ছল এবং সম্পদশালী হয়ে গেলেন।^{১৭}

কোনো গোত্রের সর্দারকে সম্মান করা উচিত

হযরত জারীর রা. যদিও অনেক পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁকে বড় সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি স্বীয় কওমের সর্দার ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছার পূর্বেই হযূর সা. তাঁর আগমনের খবর জানিয়ে দেন। তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা দ্বারাই বুঝা যায় যে, তিনি কতটুকু সম্মান ও মহত্ত্বের মালিক ছিলেন।

একবার হযূর সা. মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি প্রবেশ করলেন, মসজিদ মুসল্লীতে ভরা থাকায় তিনি কোথাও বসার জায়গা পেলেন না। হযূর সা. তাঁর জন্য নিজের পরিহিত চাদরটি বিছিয়ে দিয়ে বললেন, এর ওপর বস। তিনি চাদরটি নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, اكرمك الله كما اكرمتني يا رسول الله (হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'য়ালার আপনাকেও সম্মানিত করুক, যে রকম আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। হযূর সা. তাঁকে চাদরের ওপর বসার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন এবং বললেন, أشهد أنك لا تبغي علو في الأرض ولا فسادا. (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যমীনের বুকে উচ্চমর্যাদাও চান না এবং ফাসাদও সৃষ্টি করতে চান না।) ঐ মজলিসেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এই ঘটনা সম্বলিত কিছু রিওয়ায়েতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম এই অস্বাভাবিক মেহমানদারীর কথা হযূর সা. কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন:

^{১৭}. ইবনে মাজাহ, তরজমানুস সুন্নাহ: খ.৪, পৃ. ৪৭৮।

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه (যদি কোনো গোত্রের সর্দার তোমাদের কাছে আসে, তাহলে তার সম্মান করা উচিত।) এরপরেও হুযূর সা. তাঁর সাথে পূর্বের ন্যায় সম্মানসূচক আচরণ করে ছিলেন; হযরত জারীর নিজেই বলছেন: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رأيي إلا تبسم.

(ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি যখনই সাক্ষাতের জন্য যেতাম এবং ভেতরে যাওয়ার জন্য হুযূর সা. থেকে অনুমতি চাইতাম। তিনি সবসময় আমাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সা. যখনই আমার দিকে তাকিয়েছেন, হাসি মুখে তাকিয়েছেন।

জাহিলী যুগে ইয়ামানীরা নিজ দেশেই একটি ‘কৃত্রিম কাবা’ বানিয়েছিল। যার নাম ‘যুলখুলাসা’ বলা ছিল, ঐ সকল লোক এটাকে ইয়ামানী কাবা বলত। এতে কিছু মূর্তি রেখে তারা পূজা করত। হুযূর সা. এর অন্তর সর্বদা এ ব্যাপারে পেরেশান ছিল। তিনি হযরত জারীর রা. কে বললেন, তুমি মিথ্যা এবং বানোয়াট কাবাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দাও, যেন আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে। হযরত জারীর রা. বললেন, অতঃপর আমি হুযূর সা. এর আদেশ পালনার্থে শক্তিশালী দেড়শ অশ্বারোহীসহ ইয়েমেনের দিকে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম, অথচ আমার অবস্থা ছিল এই, আমি অভিজ্ঞহীন ব্যক্তি। আমি অশ্বপৃষ্ঠে স্থিরভাবে বসে থাকতে পারতাম না পড়ে যেতাম। আমি এ বিষয়টি রাসূল সা. এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আমার বুকে হাত রাখলেন এবং দু’আ করলেন, اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا (হে আল্লাহ! তাঁকে (অশ্বপৃষ্ঠে) স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন।)

হযরত জারীর রা. বলেন, এই দু’আর বরকতে আমি এমন অশ্বারোহী হয়ে গেলাম যে, আমি আর কখনো ঘোড়া থেকে পড়িনি। এরপর আমি এবং আমার সাথীরা গিয়ে ঐ যুলখুলাসা অর্থাৎ কৃত্রিম কাবা ভেঙ্গে দিলাম এবং আগুন লাগিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলাম। হুযূর সা. আমাদের বিজয়ের খবর জানতে পেরে প্রত্যেকের জন্য পাঁচবার বরকতের দু’আ করেন।

বিদায় হজ্জেও তিনি হুযূর সা. এর সাথে শরীক হয়েছিলেন। সেখানে হুযূর সা. খুতবা পড়ার সময় তাঁকে বলেছিলে, হে জারীব! তুমি

লোকজনকে চুপ করিয়ে দাও। হযরত উমর রা. তাঁর গিলাফতের যুগে তাঁকে ইরাক যুদ্ধে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি ঐ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এমনভাবে কাদিসিয়া বিজয়েও তাঁর বড় ধরনেরও ভূমিকা ছিল। এ সমস্ত যুদ্ধ শেষে তিনি কুফাতেই বসবাস করতে লাগলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

হযরত জারীর রা. মদীনাবাসীদের বিশেষ করে আনসারী সাহাবীদের খুব ভালবাসতেন। হযরত আনাস রা. বলেন, আমি এক সফরে হযরত জারীর রা. এর সাথে ছিলাম। তিনি সফরে আমার খুব খিদমত করেছিলেন। আমি বাধা দিলে তিনি বলতে লাগলেন, আমি আনসার সাহাবীদেরকে হুযূর সা. এর সাথে যে ধরনের সহযোগিতার মুআমালা করতে দেখেছি, তাতে আমি কসম খেয়েছি যে, যখনই কোনো আনসারী সাহাবার সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ হবে, আমি অবশ্যই তার খিদমত করবো। সহীহ মুসলিমে এই রহ. রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না এবং মুহাম্মদ বিন বাশার রেওয়াতটি বর্ণনা করার পর ইহাও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত জারীর রা. হযরত আনাস রা. থেকে বয়সে বড় ছিলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যতার সাথে সাথে বাহ্যিক সৌন্দর্যতাও তাকে দান করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী ও সুদর্শন ছিলেন। হযরত উমর রা. তাঁকে يوسف هذه الأمة (এই উম্মতের ইউসুফ) অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্যে ইউসুফ আ. এর মত সুন্দর ছিলেন।^{১৮}

দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পাঁচটি অত্যন্ত কঠিনতর

জ্ঞানীরা বলেছেন, আমরা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট অবস্থা দেখেছি তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাঁচটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে। (১) প্রবাস জীবনে অসুস্থ হওয়া (২) বৃদ্ধকালে দরিদ্রতা (৩) যৌবনকালে মৃত্যুবরণ (৪) দৃষ্টিশক্তি থাকার পর তা একেবারেই শূন্য হয়ে যাওয়া (৫) সাক্ষাতের পর বিচ্ছেদ হওয়া।^{১৯}

^{১৮}. মাআরেফুল হাদীস, খ.৮, পৃ. ২৮২।

^{১৯}. মাকতুবাতে সাদী: ২৫৯।

ওয়াইল বিন হুজর রা. সাথে মুআবিয়া রা. এর আচরণ

হযরত ওয়াইল বিন হুজর রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে হাদারামাউতে এক টুকরো ভূমি জমিদারীরূপে দান করে ছিলেন। হযরত মুআবিয়া রা. কে তাঁর সাথে তিনি পাঠিয়েছিলেন সে জমি তাঁর নিকট অর্পণ করার জন্য। হযরত ওয়াইল বিন হুজর রা. হাদারামাউতের বড় নবাব এবং শীর্ষ নেতা ছিলেন। তার ঘটনা লিখেছেন, প্রিয়নবী সা. যখন হযরত মুআবিয়াকে হাদারামাউত অভিমুখে প্রেরণ করেছেন, তখন হযরত ওয়াইল বিন হুজর রা. উটের ওপর আরোহী ছিলেন। হযরত আমীরে মুআবিয়া এর নিকট কোনো সাওয়ারী ছিল না। তিনি তাঁর সাথে হেটেই রওয়ানা হলেন। পশ্চিমধ্যে যখন মরুভূমিতে সূর্যের তাপ উত্তপ্ত হয়ে গেল, গরম বৃদ্ধি পেল তখন হযরত মুআবিয়া রা. পা জ্বালা পোড়া করতে শুরু করল। তিনি হযরত ওয়াইল বিন হুজরকে বললেন, আমার প্রচণ্ড গরমে পা জ্বালাপোড়া করছে। আপনি আমাকে আপনার উটের পেছনে উঠিয়ে নিন। তাহলে আমি গরম থেকে বাঁচতে পারব। তখন তিনি উত্তরে বললেন,

لست من أرداف الملوك অর্থাৎ তুমি বাদশাহদের সাথে তাদের পিছনে বসার উপযুক্ত নও। অতএব, তুমি আমার উটের ছায়ায় পা রেখে আমার সাথে চলতে থাক। যার ফলে হযরত মুআবিয়া রা. মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ইয়ামান পর্যন্ত পুরো রাস্তা এভাবে খালি পায়ে অতিক্রম করলেন। কারণ রাসূল সা. তাঁকে তাঁর সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁকে জমি দিয়ে ফিরে এলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'য়ালা এরূপ করলেন যে, হযরত মুআবিয়া রা. স্বয়ং খলীফার দায়িত্ব পেলেন। তখন ওয়াইল বিন হুজর রা. হযরত মুআবিয়া রা. এর সাথে সাক্ষাতের জন্য ইয়ামান থেকে দামেশক এলেন। মুআবিয়া রা. বাইরে বেরিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন ও সদ্ব্যবহার করলেন।^{২০}

আত্মহত্যাকারী কাফির নয়

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তুফাইল ইবন আমর দাউসী (স্বীয় গোত্রের আবেদন নিয়ে) রাসূল সা. এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হে

^{২০}. দরসে তিরমিযী: খ.৪, পৃ. ৩৪৭।

আল্লাহর রাসূল সা.! আপনি কি একটি সুরক্ষিত দূর্গ এবং সুসংহত জামাতের প্রতি হিজরতের আদেশ দিতে পারেন? বর্ণনাকারী বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে দাউস গোত্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে একটি দূর্গ ছিল। রাসূল সা. আনসারদের ঐ পরম সৌভাগ্যের কারণে যা আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন, তাদের সাথে সেখানে হিজরত করতে অস্বীকার করেন।

অতঃপর যখন রাসূল সা. মদীনায় হিজরত করেন, তখন তুফাইল বিন আমর দাউসীর স্বগোত্রীয় অপর এক ব্যক্তি তার সাথে হিজরত করেন। ঘটনাক্রমে মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তার সাথী অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তীরের ফলা বের করে তা দ্বারা স্বীয় আঙ্গুলের জোড় (সংযোগস্থল) কেটে ফেলে। ফলে হাত দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তুফাইল বিন আমর যখন তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন, তখন তাঁর গঠন-প্রকৃতি ছিল খুবই সুন্দর; কিন্তু তাঁর হাতগুলো ছিলো ঢাকা। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রভু তোমার সাথে কীরূপ ব্যবহার করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূল সা. এর সাথে হিজরতের বরকতে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাত ঢাকা কেন? বললেন, আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তুমি যা তোমার মধ্যে বিকৃত করেছ, আমি তা সুন্দর করব না। তুফাইল স্বপ্নটি রাসূল সা. এর কাছে বর্ণনা করলে, রাসূল সা. তাঁর হাতের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। হে আল্লাহ! তুমি তার হাতকেও ক্ষমা করে দাও।

ব্যাখ্যা: এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ক্ষমার ক্ষেত্রে ভাগ বন্টন চলে। এখানে তুফাইলের সাথীর সারাটি দেহকে ক্ষমা করা হল, কিন্তু আল্লাহর আমানতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করার কারণে তাঁর হাতকে ক্ষমা থেকে বঞ্চিত রাখা হলো। ঐ ব্যক্তি কতই না ভাগ্যবান, যার মুকাদ্দমা রহমাতুল্লিল আলামীনের দরবারে পেশ করা হয়, আর তার মুবারক হস্তদ্বয় (ঐ ব্যক্তির ক্ষমার জন্য উত্তোলিত হয়। ফলে রহমতে ইলাহী তার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয়।^{২১}

দশবার সূরায়ে ইখলাস পড়লে গোনাহ থেকে হেফাযত থাকবে

হযরত আলী রা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর দশবার ‘সূরা ইখলাস’ পড়বে, শয়তানের হাজারো ধোকা সত্ত্বেও ইনশাআল্লাহ সে পুরো দিন গোনাহ থেকে হেফাযত থাকবে। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়, ইনশাআল্লাহ ইহা তোমার সবকিছুর জন্যই যথেষ্ট হবে।^{২২}

ফিরিশতারা হুযূর সা. কে শিঙ্গা লাগানোর তাকিদ করেছিলেন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. মি‘রাজ সম্পর্কিত যে সমস্ত আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে ইহাও ছিল যে, হুযূর সা. ফিরিশতাদের যেই জামাতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের প্রত্যেকেই এ কথা বলছিল যে, আপনার উম্মতকে শিঙ্গা লাগানোর আদেশ দিবেন।^{২৩}

আরব দেশে শিঙ্গা লাগানোর খুব প্রচলন ছিল। এতে অতিরিক্ত এবং দূষিত রক্ত বেরিয়ে যায়। ইহা বাত-প্রেসার রোগে (যা আজ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে) অত্যন্ত সুফল চিকিৎসা। মানুষ পদ্ধতিটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। রাসূল সা. মাথা ও ঘাড়ের মাঝে শিঙ্গা লাগিয়ে ছিলেন।^{২৪}

জ্বীনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা

মুয়াত্তা ইবনে মালিকে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত আছে, যেই রাতে রাসূল সা. কে উর্দ্ধ জগতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, তিনি এক ইফরিত নামী জ্বীনকে দেখলেন যে, সে অগ্নিশিখা নিয়ে তাঁর পিছু পিছু আসছে। হুযূর সা. ডানে-বামে দেখলেই সে নজরের সামনে চলে আসত। হযরত জিবরাঈল আ. আরয করলেন, আমি কি আপনাকে ঐ সমস্ত কালিমাগুলো জানিয়ে দেব না? যা পড়লে তার এই অগ্নিশিখা নিভে যাবে এবং উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। হুযূর সা. বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বলে দিন। তারপর জিবরাঈল আ. বললেন, এই কালিমাগুলো পড়ুন:

^{২২}. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ. ৩২৪।

^{২৩}. মিশকাত।

^{২৪}. হায়াতুস সাহাবা।

أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يتزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن!

জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার উপায়

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় নিম্নে উল্লেখিত কালিমাগুলো পড়বে, এরপর যদি সে এই অসুস্থাবস্থায় মারা যায়, তাহলে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শও করবে না।

لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.^{২০}

প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি মানুষকে আমির বানিয়ে দেয়

কু-প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বিমুক্ততা নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। আর প্রবৃত্তির প্রতিকূল চলা নববী শক্তি থেকে উৎসারিত। যখন তোমার চরিত্রের ঘোড়াটি তোমার অনুসারী হয়ে যাবে। তখন তুমি এবং ইখলাস এক মুদ্রার এ পিঠ-ও পিঠ হয়ে যাবে।

কু-প্রবৃত্তির দুটি পথ আছে। প্রথমটি, যা মজা ও তৃপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়টি পদ ও পদবীর আকাংখার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রবৃত্তির প্রথম পথে যে চলা শুরু করে, সে নেশার ঘোরে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যরা তার ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকে। প্রবৃত্তির দ্বিতীয় পথে যে চলে, সে মসজিদে, খানকায় সর্বত্র বিচরণ করে এবং সকলকে বিভ্রান্ত করে, নিজেও পথচ্যুত হয়, অন্যদেরকেও পথচ্যুত করে।

যে ব্যক্তির সব কাজ-কর্ম তার ইচ্ছানুযায়ী এবং নফসকে খুশী করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, সে যদি আসমানেও চলে যায় আল্লাহ তাআলা থেকে সে দূরেই থাকবে। যখন তোমার জীর্ণ শীর্ণ পোষাকে দুনিয়ার মুহাব্বত লুকিয়ে আছে, তাহলে মানুষের সামনে বুয়ুর্গ সেজে আত্মপ্রকাশ কর কেন? আর যে ব্যক্তি নফস বা প্রবৃত্তি পুজারী হবে না, সে যদি মন্দিরেও যায়,

আল্লাহ তা'য়ালার ধ্যান-খেয়াল সর্বদা তার অন্তরে বিদ্যমান থাকবে। (যে এই কুকুর (প্রবৃত্তি) কে মযবূত শিকলে বেঁধে রেখেছে, তার মাটি অন্যের রক্তের চেয়েও উত্তম।)

খাজা ইবরাহীম খাওয়াস র. বলেন, আমি একদিন গুনলাম, রোম দেশের এক পাদ্রী ষাট বছর ধরে বৈরাগ্যতা অবলম্বন করে আসছে। আমি তাতে আশ্চর্য হলাম এ জন্য যে, বৈরাগ্যের জন্য তো শর্ত হলো, চল্লিশ বছর। সে কী উদ্দেশ্যে এখনও গীর্জায় থাকছে? আমি তার কাছে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলাম, সে আমার আগমনের কথা জানতে পেরে জানালা খুলল এবং বলল, হে ইবরাহীম! আমি তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য জানি।

আমি এখানে বৈরাগ্যতাকে উদ্দেশ্য করে আসিনি, বরং আমার মধ্যে এক প্রবৃত্তির পূজারী কুকুর আছে। তাকে এখানে বন্দী করে শায়েস্তা করছি। যাতে তার ক্ষতি থেকে মাখলুক নিরাপদে থাকতে পারে। নতুবা আমি তো সেই ব্যক্তি নই, যা তুমি ধারণা করেছ। (এই নফস বড়ই নাফরমান, একে পরাস্ত করা সহজ কাজ নয়।) খাজা ইবরাহীম র. বলেন, তার এ ধরনের কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ! আপনি এমনই শক্তিশালী যে, পরিপূর্ণ গুমরাহের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বান্দাকে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে মর্যাদা দান করেন।

তিনি আমাকে বললেন, হে ইবরাহীম! তুমি আর কতদিন মানুষের খোঁজে থাকবে। যাও, তুমি নিজেকে নিজের মধ্যে খোঁজ কর। যখন তা পেয়ে যাবে, তখন নিজেই নিজের রক্ষক হয়ে যাবে। এই নফস বা প্রবৃত্তি-ই প্রতিদিন প্রভুত্বের তিনশ ষাটটি পোষাক পরিধান করে সামনে আসে। এবং বান্দাকে গোমরাহীর দিকে ডাকতে থাকে। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে: *أفرايت من اتخذ الله هواه* (আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্থায়ী উপাস্য স্থির করেছে।) -সূরা জাসিয়া: ২৩।

ইহা এক রহস্যময় কথা যে, কারো মৃত্যুতে তার নিকটাত্মীয় এবং প্রিয়জনদের অন্তর দুঃখ বেদনায় ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কিন্তু এই অবাধ্য নফস এক মুহূর্তের জন্যও প্রভাবান্বিত হয় না। আপন খেয়াল-খুশী ত্যাগকারী বাদশাহতুল্য হয়ে যায়। আবার প্রবৃত্তির অনুসারী বাদশাহকে কয়েদী বানিয়ে দেয়। যেমনিভাবে যুলেখার প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে

বাদশাহ থেকে কয়েদী হতে হল। আর ইউসুফ আ. প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দেয়ার কারণে কয়েদী থেকে বাদশাহ হয়ে গেলেন।^{২৬}

এক মহিলা হুযূর সা. এর কাছে তার স্বপ্নের বর্ণনা

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সা. স্বপ্ন পছন্দ করতেন। অনেক সময় রাসূল সা. সাহাবীদের স্বপ্নের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ স্বপ্নের কথা আলোচনা করে রাসূল সা. কে খুশী করতে পারলে, নিজেও তাতে আনন্দিত হতেন।

একবার এক মহিলা হুযূর সা. এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ স্বপ্নে দেখলাম যে, একজন এসে আমাকে মদীনায় নিয়ে গেল এবং সেখান থেকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিল। তারপর আমি এমন এক বিকট আওয়ায শুনতে পেলাম যার ফলে জান্নাতের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি সেদিকে দৃষ্টি উঠিয়ে তাকাতেই অমুকের ছেলে অমুক এভাবে সে বারোজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল, যাদের রাসূল সা. কিছু দিন পূর্বে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনার্থে পাঠিয়ে ছিলেন। মহিলাটি বলল, তারা রেশমী পোষাক পরিহিত ছিল এবং নব যৌবনে টগবগ করছিল। তাদের ‘বায়দাখ’ নামী নহরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হল। এরপর যখন তারা ঐ নহরে ডুব দিয়ে উঠল, তখন তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় চমকতে লাগল। এবার তাদের জন্য স্বর্ণের প্লেটে করে আধা পাকা খেজুর আনা হল, তা থেকে ইচ্ছা মত খেয়ে নিল। তাদের সামনে বিভিন্ন রকমের ফল-ফলাদি সাজিয়ে রাখা আছে। যখন যা খেতে মনে চাচ্ছে, তা নিয়ে খাচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে এই খাবারের মজলিসে শরীক হলাম।

বেশ কিছু দিন পর এক দূতের মাধ্যমে হুযূর সা. জানতে পারলেন যে, বারোজনের সেই কাফেলাটির সবাই শহীদ হয়ে গেছেন। আর সেই বারোজনেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যার কথা মহিলা সাহাবী বলেছিল। রাসূল সা. ঐ পূণ্যবতী মহিলা সাহাবীকে আবার ডেকে আনলেন ও বললেন, তুমি পুণরায় স্বপ্নটি বর্ণনা কর। তিনি পুণরায় আলোচনা করলেন এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করলেন, যাদের নাম সেই দূত নিয়ে ছিল।^{২৭}

^{২৬}. মাকতুবাতে সাদী: ৪৯৭।

^{২৭}. তাফসীরে ইবনে কাসীর খ.৫, পৃ.২৫১।

খাবারের মাঝে শয়তানের হস্তক্ষেপ বাস্তবিক না কাল্পনিক?

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রত্যেক কাজ এমন কি খাবার সময়ও শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের সাথে থাকে। সুতরাং (খাবার সময়) যখন কারো হাত থেকে লোকমা পড়ে যায়, সে যেন এটা পরিস্কার করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য না ছাড়ে। এরপর যখন খাবার থেকে পৃথক হবে, তখন নিজের আঙ্গুলসমূহ চেটে খাবে। কেননা সে জানে না খাবার কোনো অংশে বরকত আছে।^{২৮}

হাদীসের শেষাংশে খাবার পর আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে বিষয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। আর প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, খাবার সময় কারো হাত থেকে লোকমা পড়ে গেলে, তবে তা অমুখাপেক্ষী ও অহংকারী লোকদের ন্যায় ফেলে দিবে না, বরং অভাবী ও মর্যাদা দানকারী বান্দার ন্যায় তা উঠিয়ে নিবে। যদি নীচে পড়ার কারণে তাতে কিছু লেগে যায়, তবে পরিস্কার করে ঐ লোকমা খেয়ে নিবে।

হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে, খাবার সময়ও শয়তান সাথে থাকে। যদি পড়ে যাওয়া লোকমা ফেলে দেয়া হয়, তাহলে তা শয়তানের ভাগে যাবে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, ফিরিশতা ও শয়তান আল্লাহ তা'য়ালার ঐ সৃষ্টি যা নিশ্চিতভাবে অধিকাংশ সময় আমাদের সাথে থাকে। তবে আমরা তাদের দেখতে পাই না। রাসূল সা. তাদের ব্যপারে যা কিছু বলেছেন, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা বলেছেন, আর তা একেবারেই সত্য। তিনি কখনো কখনো তাদের স্বচক্ষে দেখতেন, যেভাবে আমরা দুনিয়ার স্থূল জিনিস দেখে থাকি। (অনেক হাদীস থেকে এ কথা জানা যায়।) এ জন্য যেসব হাদীসে খাবার সময় শয়তান সঙ্গী হয়, খাবার সময় আল্লাহর নাম না নিলে শয়তান शामिल হয় অথবা পড়ে যাওয়া অংশে শয়তানের অংশের উল্লেখ আছে। সেসব হাদীসের রূপক অর্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। এ হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ র. 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' কিতাবে এ ঘটনা বর্ণনা করেন।

একদিন আমাদের এক বন্ধু (ছাত্র বা মুরীদ) আমাদের কাছে এল। তার জন্য খাবার নিয়ে আসা হল, সে খাচ্ছিল। ইতিমধ্যে তার হাত থেকে এক টুকরা পড়ে গড়িয়ে যমীনে চলে গেল। সে এটি উঠাতে চেষ্টা করল এবং এর পেছনে ধাওয়া করল; কিন্তু সেটা তার কাছ থেকে আরো দূরে সরে গেল। সেখানে যারা ছিলেন (এবং তামাশা দেখছিলেন) তা দেখে আশ্চর্য হলেন। আর খাদ্য গ্রহণকারী বহু চেষ্টা করে (অবশেষে) সেই টুকরা ধরে লোকমায় পরিণত করলেন। কয়েকদিন পর কোনো এক ব্যক্তির ওপর জ্বীন শয়তান চড়াও হল। আর এ জ্বীনটি সেই লোকের মুখে কথা বলল, আমার যে মেহমান বন্ধু তার নাম নিয়ে বলল, অমুক ব্যক্তি খানা খাচ্ছিল। আমি তার কাছে যাই তার খানা আমার খুব ভাল লাগল; কিন্তু সে আমাকে খেতে দেয়নি। তখন আমি তার হাত থেকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিই (এবং নীচে ফেলে দেই) কিন্তু সে পুণরায় আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়। এ ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় ঘটনা নিজের ঘর সম্পর্কে শাহ সাহেব র. বর্ণনা করেন। একবার আমাদের ঘরের কিছু লোক গাজর খাচ্ছিল। সেগুলো থেকে একটি গাজর নীচে পড়ে যায়। একজন দৌড়ে গিয়ে উঠিয়ে নেয় এবং সেটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। কিছুক্ষণ পরই তার পেট ও বুকে ভীষণ বেদনা আরম্ভ হয়। এরপর তার ওপর শয়তান অর্থাৎ জ্বীনের আসর এসে যায়। তখন সে জ্বীন ঐ লোকের মুখেই বলল, এই লোক আমার গাজর উঠিয়ে নিয়েছিল।

এ সব ঘটনা বর্ণনা করার পর শাহ সাহেব র. লেখেন, এই জাতীয় ঘটনা আমি বহুবার শুনেছি। আর এতে জানলাম যে, এই সব হাদীস যেগুলোতে খবার-দাবার ইত্যাদির ক্ষেত্রে শয়তানের অংশ ও তাদের হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রূপ কথার মত নয়, বরং এটাই বাস্তব। আল্লাহ তা'য়ালাই অধিক জানেন।^{২৯}

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত

১. বুখারী শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দুইটি আয়াত পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

^{২৯}. মাআরেফুল হাদীস: খ.৬, পৃ. ২৬৯।

২. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আমাকে আরশের নীচের ভাগের হতে সূরা বাক্বারার শেষ দুইটি আয়াত প্রদান করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোনো নবীকে ইহা দেয়া হয়নি।

৩. মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর সা. মি'রাজের রাত্রিতে সপ্তম আকাশে অবস্থিত সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেছিলেন। দুনিয়া থেকে যা আসমানে উঠত, তা এখানে এসে পৌঁছত। তারপর তা উর্দ্ধ জগতে নিয়ে যাওয়া হত। এভাবে যা উর্দ্ধ জগত থেকে নাযিল হত, তা-ও এখানে এসে পৌঁছত। তারপর এখান থেকে ইহজগতে নিয়ে যাওয়া হত। তার সমতল স্থানটি স্বর্গের তৈরী। সেখানে হুযূর সা. কে তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে। ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ২. সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত ৩. এবং তার উম্মতের মধ্যে যারা শিরক করেনি, তাদের ক্ষমার সুসংবাদ।

৪. মুসনাদে আহমদে উল্লেখ আছে, উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। হুযূর সা. বলেন, সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়, আমাকে তা আরশের নীচে অবস্থিত ভাগের থেকে দেয়া হয়েছে।

৫. ইবনে মারদুবিয়াতে উল্লেখ আছে, হুযূর সা. বলেন, তিনটি বস্তু দ্বারা আমাকে মানব জাতির মাঝে সম্মানিত করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল, আমাকে আরশের নীচের ভাগের থেকে সূরা বাক্বারার শেষ দুইটি আয়াত দান করা হয়েছে। যা আমার পূর্বে কাউকেই দেওয়া হয়নি এবং আমার পরও কাউকে দেয়া হবে না।

৬. ইবনে মারদুবিয়াতে উল্লেখ আছে, হযরত আলী রা. বলেন, আমি কোনো জ্ঞানী মুসলমানকে দেখিনি যে, তিনি রাতে আয়াতুল কুরসি এবং সূরা বাক্বারার শেষাংশ না পড়ে ঘুমিয়ে যান। কেননা তোমাদের নবীকে ইহা আরশের নীচের খনি থেকে দেয়া হয়েছে।

৭. তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তা'য়ালা আসমান-যমীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর আগে একখানি গ্রন্থ লিখে রেখেছিলেন। তা থেকে এই দুইটি আয়াত দ্বারা সূরা বাক্বারা সমাপ্ত করেন।

যে ঘরে লাগাতার তিনবার এই দুটি আয়াত পড়া হয়, সে ঘরের কাছেও শয়তান পৌঁছতে পারে না। ইমাম তিরমিযী র. বলেন, হাদীসটি গরীব; কিন্তু হাকীম র. তাঁর মুস্তাদরাকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

৮. ইবনে মারদুবিয়াতে উল্লেখ আছে, যখন হযূর সা. সূরা বাক্বারার শেষাংশ ও আয়াতুল কুরসী পড়তেন, হাস্যোজ্জল থাকতেন এবং বলতেন, এই দুটি আরশের নীচের ভাগের থেকে অবতীর্ণ, পক্ষান্তরে যখন مَنْ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزَى بِهِ অথবা

وَأَنْ لِّئْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءَ الْآوْفَى পড়তেন, তখন মুখ থেকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বেড়িয়ে পড়ত। অর্থাৎ বিচলিত হয়ে যেতেন।

৯. ইবনে মারদুবিয়াতে উল্লেখ আছে যে, হযূর সা. ইরশাদ করেন, আমাকে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাক্বারার শেষাংশ দেয়া হয়েছে। মুফাস্সাল সূরা আমার জন্য বাড়তি দান।

১০. হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, আমরা হযূর সা. এর নিকট বসা ছিলাম। হযরত জিবরাঈল আ. ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন আসমানের ঐ দরজাটি খোলা হল, যা ইতিপূর্বে কখনো খোলা হয়নি। সেখান থেকে একজন ফিরিশতা অবতরণ করে হযূর সা. এর নিকট এগিয়ে আসলেন এবং বললেন, আপনাকে ঐ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি, যা ইতিপূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। তা হল, সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাক্বারার শেষ দু'টি আয়াত। এতে প্রতিটি হরফের বিনিময়ে আপনাকে নূর দেয়া হবে।^{৩০}

এই দশটি হাদীস উক্ত আয়াতের ফযীলত হিসেবে দেয়া হলো।^{৩১}

কাপড় পরিধানকারী আল্লাহ তা'য়ালার হেফাযতে থাকবে

একবার হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে একজন ভিক্ষুক এসে কিছু সাহায্য চাইল। ইবনে আব্বাস রা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ তা'য়ালার ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল? সে বলল, জ্বী হ্যাঁ। ইবনে আব্বাস রা. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রমযানের রোযা রাখ? সে বলল, জ্বী হ্যাঁ। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমার কাছে তোমার চাওয়ার হক আছে। আর

^{৩০}. মুসলিম শরীফ।

^{৩১}. ইবনে কাসীর: খ.১, পৃ. ৩৮৩।

আমার হক হলো যে, আমি তোমাকে সাহায্য করি। এরপর ইবনে আব্বাস রা. তাকে কাপড় দিয়ে বললেন, আমি হুযূর সা. কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে কাপড় পরিধান করাবে সে যতদিন পর্যন্ত ঐ কাপড় ব্যবহার করবে, কাপড়দানকারী ততোদিন পর্যন্ত আল্লাহর তা'য়ালার হেফাযতে থাকবে।^{৩২}

মৃগী রোগে ধৈর্যধারণকারী এক মহিলাকে সুসংবাদ

একবার এক মৃগী রোগীণী রাসূল সা. এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে সুস্থতা দান করেন। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করে দেন। আর যদি তুমি চাও, তাহলে ধৈর্য ধরে এ অবস্থায় থাক, কিয়ামতের ময়দানে তোমার কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে না। অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়, মেয়েটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ওপর জ্বীনের আসর হয়েছে। আমার জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেতে শুরু করেছে। শরীর থেকে কাপড় খুলে যায়, আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। আমার এই রোগ দূর হোক বা না হোক, আমার জন্য এই দু'আ করে দিন, যেন আমার শরীর থেকে কাপড় খুলে না যায়। রাসূল সা. এর আবদার মত দু'আ করলেন। পরবর্তীতে আর কখনও তার শরীর থেকে কাপড় খুলে যায়নি।^{৩৩}

হে উমর রা.! আল্লাহ তা'য়ালার আমাকে দুটি জান্নাতই দান করেছেন

কথিত আছে, এক যুবক সর্বদা মসজিদে ইবাদতে মগ্ন থাকত। কিন্তু সেখানকার এক নারী তার ওপর আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে তাকে আকর্ষণ করার জন্য সব সময় তার পিছনে লেগে থাকত। অবশেষে একদিন সেই নারী যুবকটিকে তার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য রাখী করে ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। যখন হঠাৎ করে যুবকটির এই আয়াত মনে পড়ল:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ.

^{৩২}. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ২৭২।

^{৩৩}. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.২, পৃ. ২৬২।

অর্থ: যাদের অন্তরে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটান সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।^{৩৪}

সাথে সাথে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। তারপর যখন হুঁশ ফিরে এলো পুণরায় এই আয়াত মনে পড়তে লাগল। অবশেষে উক্ত আয়াত পড়তে পড়তে যুবকটি মৃত্যু বরণ করল। তখন হযরত উমর রা. খবর পেয়ে তার শোকার্ত পিতা-মাতাকে সান্তনা দিতে গেলেন। অবশ্য রাতেই তার দাফন কার্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। হযরত উমর রা. তার কিছু সাথীদের নিয়ে তার কবর সামনে রেখে জানাযার নামায আদায় করলেন। তারপর তার কবরকে সম্বোধন করে বললেন, হে যুবক! *ولمن خاف مقام ربه جنتان*. (যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।)^{৩৫}

এই আয়াত শুনামাত্র কবর থেকে আওয়ায আসল, হে উমর! আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দুটি জান্নাতই দান করেছেন।^{৩৬}

কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে কুৎসিত আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায র. থেকে বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে একজন কুৎসিত চেহারা ও নীল চক্ষু বিশিষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধা মহিলার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। যার দাঁত সামনের দিকে বের হয়ে আছে। এ অবস্থায় তাকে মানুষের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা কি তাকে চিন? তারা বলবে, আল্লাহর পানাহ! এ আবার কোনো বিপদ? তাদের বলা হবে, ইহা সেই দুনিয়া, যার কারণে একে অপরকে হত্যা করেছে। পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এরই কারণে তোমরা পরস্পরে হিংসা করতে। পরস্পর শত্রুতা রাখতে এবং এরই ধোঁকায় পড়ে ছিলে। তারপর সেই বৃদ্ধাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সে চিৎকার করে বলবে,

^{৩৪}. আরাফ:২০১।

^{৩৫}. আর রাহমান: ৪৬।

^{৩৬}. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.১, পৃ. ২২৬।

আমার সাথে ঐ সমস্ত লোকদেরও এনে দাও, যারা আমার পিছনে লেগেছিল। তাদেরও আমার সাথী করে দাও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন, যারা তার পিছনে চলেছে, তাদেরও তার সাথী করে দাও।^{৩৭}

একটি অবাস্তব নাম

হযরত হুদ আ. যখন দীনের প্রচার শুরু করলেন, তখন তার কণ্ঠস্বর লোকেরা তাকে মূর্থ ও মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করতে লাগল। তাদের এক আল্লাহর ইবাদতের অর্থ বুঝে আসত না। অর্থাৎ একজন সত্তা এই বিশাল পৃথিবী চালনার দায়িত্ব কিভাবে নিতে পারেন?

তাদের ধারণা ছিল যে, এই ভূ-পৃষ্ঠের লাখো শাখাগুলোর কার্য সম্পাদন করা একা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্যই তারা পৃথিবীর বিভিন্ন কার্য সিদ্ধীর লক্ষ্যে বিভিন্ন মাবুদ নির্ধারণ করে রাখত। হযরত হুদ আ. তাদের এই ভুল ধারণাকে দূর করতে গিয়ে বারবার বলেছেন যে, হে আমার কওমের লোকেরা! তোমরা কি আমার সাথে ঐ নামগুলো নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে চাচ্ছ, যে নামগুলো তোমরা এবং তোমার বাপ দাদারা রেখেছিল। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার কোনো সনদ বা দলীল-প্রমাণ নাথিক করেননি?

অর্থাৎ তোমরা শুধু এমন একটা নামকেই পূজা করছ, যার কোনো শক্তি সামর্থ নেই। তোমরা কাউকে বৃষ্টির মালিক, কাউকে বাতাসের মালিক, কাউকে পানির মালিক, কাউকে ধনসম্পদ। আবার কাউকে সুস্থতা ও অসুস্থতার মালিক নামে ডাকছ। অথচ এর মধ্যে কেউ বাস্তবিক পক্ষে কোনো জিনিসের মালিক নয়। কিন্তু কওম এই বাস্তবতাকে মানতে একেবারেই তৈরী হলে না। তাদের কোনো ভাবেই বিশ্বাস হতো না যে, শুধু একজন সত্তার পক্ষে এত বড় পৃথিবী পরিচালনা করা কিভাবে সম্ভব?

এই পৃথিবীকে পরিচালনা করতে হলে, আলাদা আলাদা কার্য সম্পাদনকারী থাকা জরুরী। এ জাতি আল্লাহ তা'য়ালার সাথে অপর এক কার্যসম্পাদনকারী স্থির করত। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'য়ালার অস্তিত্বকে একেবারেই অস্বীকার করত না, বরং আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কিছু কাল্পনিক সত্তাকে নিজেদের প্রয়োজন পূরণকারী বলে মনে করত। তাদের নামে

বিভিন্ন জিনিসের নয়রানা পেশ করত। তাদের কাছে দুঃখ-কষ্টে সাহায্য প্রার্থনা করত এবং সুখে-শান্তিতে তাদের নামের ওয়ীফা পাঠ করত। এইটা তাদের এতটাই প্রাচীনতম প্রথা ছিল যে, এ সমস্ত ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাগুলো তাদের অন্তর থেকে দূর হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। আর তাদের পূর্বপুরুষরাও এ ধরনের ধ্যান-ধারণা রেখেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

বর্তমান যুগেও কিছু মানুষ কাউকে ‘মুশকিল কুশাঁ’ (সমস্যা সমাধানকারী) মনে করে থাকে। অথচ এ ধরনের কোনো শক্তিই তার কাছে নেই। কাউকে ‘বখশ’ (ঐশ্বর্য্যদানকারী) নামে স্মরণ করে। অথচ তার কাছে কোনো কিছুই ভাণ্ডার দেয়া হয়নি যে, সে তা থেকে কিছু দিবে। কাউকে ‘দাতা’ (প্রদানকারী) বলে ডাকে, অথচ সে এমন কোনো কিছুর মালিক নয় যে, দাতা হবে। কাউকে ‘গরীবে নেওয়ায’ (গরীব সেবী) বলে ডাকে, অথচ তার এমন কোনো সামর্থ নেই যে, কোনো গরীবকে সে পালন করবে। কাউকে ‘গাউস’ (সাহায্য দাতা) বলে ডাকে, অথচ তার কোনো শক্তি বা সাহস নেই, কাউকে সে সাহায্য করবে। কাউকে ‘বান্দা নেওয়ায’ (বান্দা পালনে ওয়ালা) বলে মনে করে, অথচ সে নিজেই বান্দা বা গোলাম। আল্লাহর গোলামীর শিকলে আবদ্ধ হয়ে আছে। কাউকে ‘দস্ত গীর’ বলে মনে করে, অথচ সে নিজেই সাহায্যের মুখাপেক্ষী। অপরের সাহায্য সে করবে কি করে? বাস্তবিক পক্ষে এই সব নাম-ই মাত্র। যার পিছনে কোনো শক্তি বা ক্ষমতা কিছুই নেই। যারা এগুলো নিয়ে মতবিরোধ করে, তারা শুধু একটা কাল্পনিক নাম নিয়েই বিরোধ সৃষ্টি করে। আসলে এর কোনো বাস্তবতা নেই। হুদ আ. তার কওমকে এই জিনিসটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এত সুস্পষ্ট কথাকে তারা বুঝতে চেষ্টা করেনি। এটা কি পৃথিবীর জন্য আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, একজন অক্ষম, অসহায় মানুষ সে তার ধারণা মাত্রই তার মত অপর ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’য়ালার গুণাবলীর সাথে অংশীদার মানবে। আবার সেই চিন্তা চেতনাকে ধরে রেখে নিজেকে খাঁটি ঈমানদারও বলে দাবী করবে।^{৩৮}

অসৎ সঙ্গের পরিণতি

অসৎ সঙ্গ বিষাক্ত সাপের দংশনের চেয়েও ক্ষতিকারক। যার পরিণতি অপমান, অপদস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তেমনিভাবে সৎ সঙ্গ হাজারো খারাপ কাজ থেকে বাঁচার সহজ মাধ্যম।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির যেনিভাবে সৎকাজের সন্ধানে থাকে। তেমনিভাবে অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। মানব জাতির অসৎ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে সত্যবাদীদের সাহায্য আরো বেশী প্রয়োজন। আবার অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যতটুকু জরুরী, তার চেয়ে বেশী জরুরী অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা। হযরত নূহ আ. এর সন্তান নবী পরিবারে লালন-পালন হওয়া সত্ত্বেও এবং বিবি জীবন সঙ্গীণী হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের সাথে যোগসাজস থাকার কারণে কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

শেখ সা'দী র. তাঁর কবিতায় এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন:

(১) নূহ আ. এর ছেলে যখন অসৎ লোকের সঙ্গ নিলো, তখন সে তার নবী বংশের মর্যাদা হারিয়ে ফেলল।

(২) আসহাবে কাহাফের কুকুরটি কিছু দিন নেক লোকের সাথে থেকে জান্নাতী হয়ে গেল।

(৩) সৎ সঙ্গ তোমাকে সৎ বানিয়ে দিবে, আর অসৎ সঙ্গ তোমাকে অসৎ বানিয়ে দিবে।

প্রচলিত ভুল ২/১৫৮-১৫৯ পৃ:

জানাযার নামায শিখ এবং এতে অংশ গ্রহণ কর

بسم الله الرحمن الرحيم

মুহতারামী ও মুকাররমী!

মাওলানা ইউনুস পালনপুরী (দা.বা.)

বাদ সালামে মাসনুন,

প্রশ্ন: আমি একটা বিষয়ে জানতে চাচ্ছি, যখন কোনো ব্যক্তি ইন্তেকাল করে, তখন শরীয়তের মধ্যে জানাযার নামাযের ইমামতির জন্য সর্বাত্মক অধিকার তার নিকটাত্মীয়কে দেয়া হয়। যেমন: ছেলে, পিতা ইত্যাদি। এর কারণ কি?

উত্তর: আপনি প্রশ্নে বলেছেন, নিকট আত্মীয় সর্বাঙ্গে অধিকার পাওয়ার কারণ কি? আমার ধারণা মতে এর কারণ এটা হতে পারে যে, যেহেতু নামাযে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে হয়, তার নিকট আত্মীয় যে দরদ-ব্যথা এবং অন্তর দিয়ে দু'আ করবে, এতটুকু অন্য কেউ করতে পারবে না। আর যখন কোনো দু'আ অন্তর দিয়ে করা হয়, তখন তা কবুল হয়। উলামায়ে কিরাম আরো অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। আমি এতটুকুর উপরই শেষ করছি।

আজকাল অনেক লোক জানাযার নামাযে শরীক হয় না। তাদের জানাযার নামায শিখে রাখা উচিত। সময়মত মৃত ব্যক্তি যেন তার মাগফেরাতের দু'আ থেকে বঞ্চিত না থাকে।

নামায কখন মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে

প্রশ্ন: আমি যে বিষয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি তা হল এই যে, আমি নামায পড়ি, কিন্তু গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারি না। অথচ কুরআন শরীফে আছে, নিশ্চয় নামায সকল পাপ থেকে বিরত রাখে।

উত্তর: আপনার এই প্রশ্নের উত্তর একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝুন। যেমন, ঔষধের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বলা হয় যে, অমুক ঔষধ অমুক রোগের প্রতিষেধক এবং সত্যিকার অর্থে এমনি হয়ে থাকে কিন্তু তা কখন? যখন দুইটা জিনিসের দিকে খেয়াল রাখবে:

(১) ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করবে।

(২) এমন জিনিস থেকে বেঁচে থাকবে, যা ঔষধের ক্রিয়াকে নষ্ট করে।

তেমনিভাবে নামাযের মধ্যেও আল্লাহ তা'য়ালা এমন কার্যকারিতা রেখেছেন যে, ইহা মানুষকে নির্লজ্জতা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু তা ঐ সময় সম্ভব হবে, যখন নামাযকে সুন্নত অনুযায়ী তার আদব ও শর্তাবলীর দিকে খেয়াল রেখে পড়া হবে। যা নামায শুদ্ধ ও কবুল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত।

যে ঘরে সূরা ইয়াসিন পাঠ করা হয় সে ঘরে শয়তানও পা রাখে না

প্রশ্ন: আমার বহু দিন যাবত পেরেশানীতে দিন কাটছে। ঘরে জ্বীন এসে খুব উৎপাত করে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর সমাধান কী?

উত্তর: আপনার এই সমস্যার সমাধান হলো:

১. নামায পাবন্দীর সাথে আদায় করবে। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা মাসনুন দু'আগুলো সঠিকভাবে আদায় করার চেষ্টা করবে।

২. ঘরে প্রবেশ করে তার চার কোণায় আয়াতুল কুরসী পড়ে ফুঁক দিবে। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. ঘরে ঢুকেই ঘরের চার কোণায় আয়াতুল কুরসী পড়ে ফুঁক দিতেন।

৩. ঘরে সব সময় সূরায়ে বাক্বারা পড়ার চেষ্টা করবে। এ প্রসঙ্গে তেরটি হাদীস নিয়ে দেয়া হল। মনযোগের সাথে হাদীসগুলো পড়বে এবং তার ওপর আমল করার চেষ্টা করবে।

(১) হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, সূরা বাক্বারা কুরআনের শীর্ষভাগে অবস্থিত সর্বোন্নত চূড়া। এর প্রতিটি আয়াতের সাথে আশি জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়েছে। বিশেষ ভাবে 'আয়াতুল কুরসী' আরশের নীচ থেকে বের করে সূরায়ে বাক্বারার সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরায়ে ইয়াসিন কুরআনের হৃদয় সদৃশ্য। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সুফল লাভের জন্য তা পাঠ করবে, সে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। মৃত্যু পথ যাত্রীর সামনে সূরাটি পড়িবে।

(২) মুসনাদে আহমদ, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফে আছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ঘরগুলো কবরে পরিণত কর না। নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করা হয়, সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না।

(৩) অপর এক হাদীসে এসেছে, যে ঘরে সূরা বাক্বারা পড়া হয়, সে ঘর থেকে শয়তান বের হয়ে যায়।

(৪) ইবনে মারদুবিয়াতে আছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না পাই যে, পায়ের ওপর পা উঠিয়ে পান করছে; কিন্তু সূরা বাক্বারা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। নিশ্চয় শয়তান ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, যে ঘরে সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করা হয়। সব চেয়ে নিকৃষ্টতম ঘর সেটি যেখানে কুরআন তিলাওয়াত হয় না।

(৫) মুসনাদে দারামীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, যে ঘরে সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে যায়। প্রতিটি জিনিসের একটা শীর্ষভাগ আছে এবং কুরআনের শীর্ষভাগ হল, সূরা বাক্বারা। এমনভাবে প্রত্যেক জিনিসের নির্যাস আছে এবং কুরআনের নির্যাস হল লম্বা সূরাগুলো।

(৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারার দশটি আয়াত রাতে নিয়মিত পাঠ করবে, তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিরাপদে থাকবে। যদি কোনো বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের ওপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছে: সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিন অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী ও তার পরের দুইটি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

হযূর সা. ইরশাদ করেন, প্রতিটি বস্তুর শীর্ষভাগ রয়েছে এবং কুরআনের শীর্ষভাগ হলো, সূরা বাক্বারা। তেমনি প্রতিটি বস্তুরই নির্যাস আছে এবং কুরআনের নির্যাস হলো লম্বা সূরাগুলি। যে ব্যক্তি রাতে নিজ ঘরে এই সূরা তিলাওয়াত করে, শয়তান তিন রাত পর্যন্ত সে ঘরে প্রবেশ করে না। যদি কেউ তার ঘরে দিনে তা পাঠ করে, তবে তিন দিন শয়তান সে ঘরে ঢুকবে না।

(৭) তাবরানী, ইবনে হিব্বান, ইবনে মারদুবিয়া, তিরমিযী, নাসাইঈ এবং ইবনে মাজায় আছে যে, রাসূল সা. একটি ক্ষুদ্র দল অভিযানে পাঠাতে গিয়ে তার নেতৃত্ব ঐ ব্যক্তিকে দিলেন, যে বলেছে আমার সূরা বাক্বারা মুখস্থ আছে। তখন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বললেন, আমিও ঐ সূরা মুখস্থ করতাম। কিন্তু আমি এর ওপর আমল করতে পারব কি না সেই ভয়ে মুখস্থ করিনি। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, কুরআন শিখ ও তা পাঠ কর। যে কুরআন শিখে, পাঠ করে ও তার ওপর আমল করে, সে সুগন্ধি বিচ্ছুরক মিশকপূর্ণ পাত্রের ন্যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন শিখে আমল করে না, সে যেন মিশকপূর্ণ সুগন্ধিবিহীন আবদ্ধ পাত্র।

(৮) বুখারী শরীফে আছে, হযরত উসাইদ বিন উইমায়ের রা. একবার রাতে সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর পাশেই তাঁর ঘোড়াটি বাঁধা

ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি লাফালাফি শুরু করে দিল। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন। ঘোড়াটিও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন আবার তিনি তিলাওয়াত শুরু করলে ঘোড়াটি পুণরায় লাফাতে লাগল। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে তাকালেন। ঘোড়াটিও সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি আবার তিলাওয়াত শুরু করতেই ঘোড়া আবার লাফানো শুরু করে দিল। তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়ার কাছাকাছি ঘুমাচ্ছিল। তার ভয় হল, ছেলের গায়ে ঘোড়ার আঘাত লাগবে। তাই তিনি ছেলেকে তুলে আনতে গেলেন। তখন একবার আকাশের দিকে তাকালেন এবং যা দেখার তা দেখলেন। ভোর হওয়া মাত্র তিনি হুয়ূর সা. এর কাছে গিয়ে ঘটনা শোনালেন। রাসূল সা. ঘটনা শুনে বললেন, তুমি তিলাওয়াত বন্ধ করলে কেন? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহইয়া আঘাত পাবে এই ভয়ে বন্ধ করেছিলাম, কারণ সে ঘোড়াটির কাছাকাছি ছিল। আমি তাকে সরাতে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম, একটি ছায়াপথে যেন সারিবদ্ধ দ্বীপ মালা জ্বলজ্বল করছে। আমি তা ভালভাবে দেখার জন্য বের হলাম। তখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাসূল সা. বললেন, তারা একদল ফিরিশতা ছিলেন। তোমার তিলাওয়াতের সুরে আকৃষ্ট হয়ে আসছিলেন। যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে, তাহলে তারাও সকাল পর্যন্ত থাকতেন। লোকজন তাদের দেখতে পেত এবং ফিরিশতাগণও তাদের দৃষ্টির আড়াল হতেন না।

(৯) এরই কাছাকাছি আরেকটি ঘটনা। হযরত সাবিত বিন কায়েস বিন শাম্মাস রা. এর সম্পর্কে। একবার কিছু লোক রাসূল সা. এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করল যে, গতরাত সাবিত বিন কায়েসের গৃহটি দ্বীপমালার আলোকে ঝলমল করছিল। রাসূল সা. উত্তরে বললেন, সম্ভবত সে সূরা বাক্বারা পড়েছিল। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তখন সূরা বাক্বারা পড়ছিলাম।

(১০) রাসূল সা. ইরশাদ করেন, সূর বাক্বারা শিখ। তা গ্রহণে বরকত ও বর্জনে আক্ষেপ মিলে। তার ওপর বাতিলের শক্তির কোনো প্রভাব পড়ে না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, সূরা বাক্বারা এবং সূরা আল-ইমরান শিখ। এই দু'টি নূরাণী (আলোকপিণ্ড) সূরা। কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের শামিয়ানা। মেঘমালা বা পাখীর ঝাঁকের মত মাথার ওপর এসে ছায়া দিবে।

(১১) মুসনাদে আহমদের অপর এক হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন কুরআন ও তার তিলাওয়াতকারীদের একত্রিত করা হবে। সূরা বাক্বারা, সূরা আল ইমরান তাদের অগ্রভাগে মেঘ, শামিয়ানা ও পাখীর ঝাঁকের ন্যায় ছায়া হয়ে থাকবে। এই দু'টি সূরা তাদের জন্য দৃঢ়তার সাথে সুপারিশ করবে।

(১২) এক ব্যক্তি নামাযে সূরা বাক্বারা ও সূরা আল ইমরান পড়ল। যখন সে নামায শেষ করল, হযরত কা'ব রা. তাকে বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! নিশ্চয় এর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার ঐ নাম রয়েছে, যেই নামে কোনো কিছু প্রার্থনা করলেই কবুল হয়। লোকটি বলল, আমাকে ঐ নাম বলে দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম আমি তোমাকে তা বলব না। কারণ, আমার ভয় হয় তুমি তা দিয়ে এমন কিছু প্রার্থনা করবে, যা তোমার, নয়তো আমার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(১৩) হযরত আবু উমামা রা. বলেন, তোমাদের এক ভাই স্বপ্নে দেখল, মানুষ দল বেঁধে পাহাড়ের উপত্যকায় বিচরণ করছে। পাহাড়ের চূড়ার সবুজ বৃক্ষ থেকে গায়েবী আওয়ায আসছে, তোমাদের মধ্যে সূরা বাক্বারা তিলাওয়াকারী কেউ আছে কি? যখন কেউ বলে যে, হ্যাঁ, তখন বৃক্ষ দু'টি ফলসহ তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর সে এর ডালপালার ওপর বসে পড়ে। তারপর তাকে নিয়ে গাছ দু'টি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যায়।^{৩৯}

একটি দু'আ যার সাওয়াব আল্লাহ তা'য়ালার গোপন রেখেছেন

ইবনে মাজায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, হযূর সা. ইরশাদ করেছেন, একবার এক ব্যক্তি আল্লাহর শানে বলেছিল:

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ.

ইহা শুনা মাত্রই ফিরিশতারা ঘাবড়িয়ে গেল। আমরা এর সাওয়াব কি পরিমাণ লিখব? অবশেষে তারা আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার এক বান্দা আপনার শানে এমন এক কালিমা পেশ করেছে, যার ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, এর সাওয়াব আমরা কী পরিমাণ লিখব? আল্লাহ তা'য়ালার জানা সত্ত্বেও তাদের

জিজ্ঞেস করলেন, সে কী বলেছে? তারা বললেন, এই কালিমাটি বলেছে। আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমরা এই কালিমাকে এভাবেই লিখে রাখ, যেভাবে সে বলেছে। আমার সাথে তার দীদার লাভের পর এর প্রতিদান বা সাওয়াব দিব।^{৪০}

সহবাসে বাধা ও তার প্রতিকার

প্রশ্ন: আমি একটি গোপন রোগে আক্রান্ত। যা কারো সামনে প্রকাশ করতে পারছি না। আপনার কাছে বলতেও লজ্জাবোধ করছি। কিন্তু কী করব? খুবই দুশ্চিন্তায় ভুগছি। আশা করি আমার নাম উল্লেখ না করে, এর সমাধান জানাবেন। তা হলো এই যে, আমি স্ত্রী সহবাসে অপারগ হয়ে পড়েছি। অনেক চিকিৎসা করেছি, কোনো অসুস্থতা নয়। মনে হচ্ছে যে, আমার ওপর যাদু করা হয়েছে।

উত্তর: আমি আমেল বা কবিরাজ নই। ব্যস এতটুকু যে, যখন কোনো কথা বা আমল হাদীসে অথবা বুয়ুর্গদের থেকে পাই, তা বলে দিয়ে থাকি। তফসীরে ইবনে কাসীরে আছে:

হযরত ওহাব রা. বলেন, সাতটি বরইয়ের পাতা বেটে পানিতে মিশিয়ে নিবে। তারপর আয়াতুল কুরসী পড়ে তার ওপর দম করবে। সেই পানি যার ওপর যাদু করা হয়েছে বলে জানা গেছে, তাকে তিন শ্বাসে পান করাবে। আর বাকী পানি দ্বারা তাকে গোসল দিবে। ইনশাআল্লাহ যাদুর আসর দূর হয়ে যাবে। স্ত্রী মিলনে অক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য এই আমল অত্যন্ত উপকারী। যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য সবচেয়ে উত্তম আমল সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা। হাদীস শরীফে আছে যে, এই দুই সূরার আমলের চেয়ে আর কোনো উত্তম আমল নেই। এমনভাবে “আয়াতুল কুরসী”ও শয়তানকে জব্দ করার জন্য অত্যন্ত উপকারী আমল।^{৪১}

হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর বন্ধু উপাধি কিভাবে পেলেন?

ইবনে আবু হাতিম নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, হযরত ইবরাহীম আ. সর্বদা অতিথি পরায়ণ ছিলেন। তিনি কখনও মেহমান ছাড়া খানা খেতেন

^{৪০}. তফসীরে ইবনে কাসীর: খ.১, পৃ. ৪৬।

^{৪১}. ইবনে কাসীর: খ.১, পৃ. ১১৭।

না। একদিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর মেহমান না পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমাকে আমার ঘরে আসার অনুমতি কে দিয়েছে? আগন্তুক লোকটি বলল, এই ঘরের আসল মালিক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? উত্তরে লোকটি বলল, আমি মালাকুল মউত। (ফিরিশতা) আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তাঁর এক বান্দার কাছে এই সুসংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর খলীল (বন্ধু) বানিয়ে নিয়েছেন। এ কথা শুনে ইবরাহীম আ. বললেন, তবে কি তুমি আমাকে অবশ্যই জানিয়ে দাও ঐ মহান ব্যক্তিটি কে? আল্লাহর কসম! সে এই ভূপৃষ্ঠের যেখানেই থাকুক না কেন আমি সেখানে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করব এবং বাকিটা জীবন তারই পদতলে কাটিয়ে দিব।

এ কথা শুনে মালাকুল মউত ফিরিশতা বললেন, ঐ ব্যক্তিতো আপনি নিজেই। ইবরাহীম আ. পুণরায় জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই আমি সেই ব্যক্তি? ফিরিশতা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আপনিই সেই ব্যক্তি। পুণরায় তিনি বললেন, আপনি কি আমাকে জানাবেন, আল্লাহ তা'য়ালা কী কারণে আমাকে তাঁর বন্ধু বানালেন? ফিরিশতা উত্তরে বললেন, এই জন্য যে, আপনি শুধু মানুষকে দিয়ে থাকে। কারো কাছে কিছুই চান না।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, যখন থেকে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইবরাহীম আ. কে খলীলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) উপাধিস্থ করেছেন, তখন থেকে তাঁর অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালার ভয়-ভীতি এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে, সর্বদা অন্তরে পাখী উড়ার আওয়াযের ন্যায় এক ধরনের আওয়ায শোনা যেত।^{৪২}

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর গুণাবলী ও তাঁর উক্তি

১. মেহমানের সাথে যে খাবার খাওয়া হয়, তার হিসাব আল্লাহ তা'য়ালা নেন না।

মেহমানদারী ইসলামী জীবনের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই মেহমানদারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর দস্ত

রখানে সর্বস্বরের লোকের বসার অনুমতি ছিল। তিনি কখনও মেহমান ছাড়া খাবার খেতেন না। এ ব্যাপারে তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মেহমানের সাথে যে খানা খাওয়া হয়, তার হিসাব আল্লাহ তা'য়ালার কাছে নিবেন না। বছরের অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। যে দিন তিনি রোযা রাখতেন, সে দিন ভাল ভাল খাবার রান্না করে অপরকে খাওয়াতেন। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত, একবার তিনি কোনো এক জিহাদ বা হজের সফরে যাওয়ার সময় তাঁর সফর সঙ্গীদের জন্য দুই উটনী বোঝাই করে ভূনা মুরগীর গোস্তু নিয়েছিলেন।^{৪৭}

২. মাত্র একটি কলম ফেরত দেয়ার জন্য হাজারো মাইল সফর।

এক বার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. সিরিয়াতে এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি কলম ধার স্বরূপ নিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি সেই কলমটি ফেরত দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। ‘মারুতে’ পৌঁছে (একটি জায়গার নাম) কলমটির কথা মনে পড়লে তিনি আবার সিরিয়া ফিরে যান এবং কলমের মালিককে তা ফেরত দেন। তাঁর চারিত্রিক জীবনের এই একক ঘটনা তাঁর পবিত্র আখলাককে প্রমাণ করে, পৃথিবীর চারিত্রিক ইতিহাসে ইহা এক বিরল কাহিনী। আর এ ঘটনাটি সেই যুগের, যে যুগে যানবাহনের মাধ্যম একমাত্র উট, ঘোড়া ও খচ্চর ছিল।^{৪৮}

(৩) মুসলমানকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখা

এক ব্যক্তি সাতশ দিরহাম ঋণ ছিল। কিছু লোক এসে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. কে বলল, আপনি তার ঋণটি পরিশোধ করে দিন। তিনি তার কর্মচারীর কাছে লিখে পাঠালেন যে, অমুক ব্যক্তিকে সাত হাজার দিরহাম দিবে। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি এই লিখিত পত্রটি নিয়ে তাঁর কর্মচারীর কাছে গেল। মুসী পত্রটি পড়ে পত্রবাহককে জিজ্ঞেস করল, তোমার কত দিরহাম প্রয়োজন? উত্তরে সে বলল, আমি সাতশত দিরহামের ঋণী। আর সেই পরিমাণই আদায় করে দেয়ার জন্য লোকজন আমার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর কাছে সুপারিশ করেছিল। মুসী মনে করল, হয়ত

^{৪৭}. সিয়ারে সাহাবা: খ.৮, পৃ. ৩১৯।

^{৪৮}. সিয়ারে সাহাবা: খ.৮, পৃ. ৩১৮।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর কলম থেকে ভুলে সাতশত দিরহামের জায়গায় সাত হাজার দিরহাম লিখা হয়ে গেছে। মুসী পত্রবাহককে বলল, চিঠিতে কিছু ভুল আছে মনে হচ্ছে। আপনি একটু বসুন। আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর কাছে পুণরায় জিজ্ঞেস করে আপনাকে সেই পরিমাণ দিরহাম দিয়ে দিচ্ছি। সে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর কাছে এই মর্মে চিঠি লিখে জানতে চাইল যে, পত্রবাহকের সাতশত দিরহাম প্রয়োজন বলে জানাচ্ছে। আর আপনার চিঠিতে সাত হাজার দিরহাম লিখা দেখছি। কলমের ভুলের কারণে এরূপ হয়ে যায়নি তো? উত্তরে লিখলেন যে, যখনই আমার এই চিঠিটি তোমার কাছে পৌঁছবে, তখনই তুমি তাকে চৌদ্দ হাজার দিরহাম দিয়ে দিবে। মুসী তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে পুণরায় লিখল যে, এভাবে যদি আপনি আপনার ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিতে থাকেন, তাহলে তো আপনার সব পুঁজিই এক সময় শেষ হয়ে যাবে। মুসীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি এই সহানুভূতি আর সহমর্মিতা পছন্দ হল না। তাই তিনি কিছুটা ধমকের স্বরে তার কাছে লিখলেন, যদি তুমি আমার অধিনস্ত বা আদিষ্ট হও, তাহলে আমি তোমাকে যা হুকুম করব তা তুমি পালন করবে। আর যদি তুমি আমাকে তোমার অধিনস্ত মনে কর, তাহলে তুমি এসে আমার স্থানে বস। এরপর তুমি যা হুকুম দিবে তা আমি মেনে নিব। আমার কাছে বস্তুজগতের ধন-সম্পদের চেয়ে বেশী মূল্যবান আখেরাতের সাওয়াব এবং নবী কারিম সা. এর ঐ বাণী যেখানে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইকে তার অজান্তেই তাকে খুশী করে দিবে, আল্লাহ তা'য়ালার তাকে মাফ করে দিবেন। সে আমার কাছে সাতশত দিরহাম চেয়েছিল। আমি মনে করলাম, যদি আমি তাকে সাত হাজার দিরহাম দেই, তাহলে সে এই আশাতীত দিরহাম পেয়ে অত্যন্ত খুশী হবে। আর আমি রাসূল সা. এর ফরমান অনুযায়ী সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যাব। দ্বিতীয়বার দিরহামের পরিমাণ বাড়িয়ে চৌদ্দহাজার এই জন্য করেছি যে, হয়ত সে সাত হাজারের সংখ্যা জেনে ফেলেছে। এখন এর চেয়ে অতিরিক্তটাই তার জন্য আশাতীত খুশীর কারণ হবে।^{৪৫}

৪. আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের অপ্রকাশিত সওয়াব।

মুহাম্মদ বিন ইসা থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. অধিকাংশ সময়ে তারতুস (সিরিয়াস্থ) আসতেন। পথিমধ্যে ‘রুকাহ’ নামক একটি স্থান অতিক্রম করতে হয়। (আব্বাসীয় খলীফারা সাধারণত রুকাহ নামক স্থানটিতে গ্রীষ্মকালীন সময়গুলো কাটাতো। যা অত্যন্ত সুন্দর ও সবুজ-শ্যামল মনমুগ্ধকর একটি পরিবেশ।)

এখানে যেই সরাইখানায় আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এসে থাকতেন, সেখানে একজন যুবকও থাকতো। যতদিন তিনি এই শহরে থাকতেন, এই যুবকটি তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনতো এবং সর্বদা তাঁর খেদমতে লেগে থাকত। একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. সেখানে এসে তাকে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যুবকটি কোথায়? লোকজন তাঁকে জানাল যে, সে তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে বন্দী করা হয়েছে। তিনি ঋণের পরিমাণ এবং ঋণদাতা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, যুবকটি দশ হাজার দিরহাম ঋণ নিয়ে তা আদায়ে অপারগ হওয়ায় ঋণদাতা তাকে বন্দী করে রাখে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ঋণদাতাকে নির্জনে ডেকে বললেন, ভাই! তুমি তোমার ঋণ আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও। আর এই যুবককে তুমি ছেড়ে দাও। এ কথা বলে তিনি তার কাছ থেকে এ ওয়াদাও নিলেন যে, সে এ বিষয়ে কাউকে জানাবে না। তিনি সেই যুবকটির মুক্তির ব্যবস্থা করে ঐ রাতেই সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যুবকটি মুক্তি পেয়ে সরাইখানায় পৌঁছলে তাঁর আসা-যাওয়ার কথা সে জানতে পেল। কিন্তু তাঁর দেখা না পেয়ে খুব পেরেশান হয়ে তখনি তারতুসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। কয়েক মনযিল যাওয়ার পর তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে তার বন্দী হওয়া ও আবার বন্দী থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা উল্লেখ করল। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে মুক্তি পেলে? উত্তরে সে বলল, কোনো এক আল্লাহর বান্দা সরাইখানায় এসেছিল। তিনি আমার ঋণের কারণে বিপদাবস্থাকে জেনে তাঁর পক্ষ থেকে আমার ঋণ পরিশোধ করে দেন এবং মুক্তি দান করেন। কিন্তু আমি তাঁকে চিনি না। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ তা’য়ালার কাছে

শুকরিয়া কর, কেননা তিনি তোমাকে এই মহাবিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মুহাম্মদ বিন ঈসা র. বলেন, তাঁর মৃত্যুর পর ঋণদাতা এ ঘটনা লোকজনের কাছে বর্ণনা করেছিল।^{৪৬}

৫. ইবনে মুবারক র. নিজ খরচে কিছু লোকদের হজ্বের ব্যবস্থা করতেন।

হারামাইন শরীফের যিয়ারত তাঁর জীবনের এক বিশেষ আমল ছিল। প্রায় প্রতি বছরই তিনি এই সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা করতেন। হজ্বের সফরে যাওয়ার সময় নিয়ম ছিল, সফরে বের হওয়ার পূর্বেই তিনি তাঁর সাথীদের কাছ থেকে তাদের টাকা পয়সা জমা নিয়ে নিতেন এবং তা প্রত্যেকের নামসহ আলাদা আলাদা থলের মধ্যে রেখে দিতেন। তারপর সবগুলো থলে একটা সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতেন। পুরা সফরে যা কিছু খরচ হতো, তা তিনি নিজের পকেট থেকে দিতেন। সাথীদের ভাল ভাল খাবার খাওয়াতেন এবং তাদের অন্যান্য প্রয়োজনেও খরচ করতেন। হজ্ব শেষে যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসতেন। তখন তার সাথীদের বলতেন, তোমাদের পরিবার পরিজনের জন্য যা কিছু খরীদ করে নাও। হজ্বের সফর শেষে বাড়ি এসে সকল সাথীদের দাওয়াত করতেন। এরপর সেই সিন্দুক খুলে যার নামে যেই থলে ছিল, তাকে তা দিয়ে দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তার সারা জীবনের আমল এমনি ছিল।^{৪৭}

৬. ইবনে মুবারক তাঁর সাথীকে দরদ মাখা চিঠি লিখলেন,

ইবনে ওলাইয়্যা নামে সে যুগের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইমাম ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর বিশেষ বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন। ব্যবসায়ও তিনি তাঁর অংশীদার ছিলেন। উঠা-বসা, চলাফেরা সর্বদা একই সঙ্গে হত। কিন্তু সেই মুহাদ্দিস সাথী কিছু আমীর-উমারাদের মজলিসেও বসা শুরু করে দিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এ খবর পেয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। একবার সে তাঁর মজলিসে আসলে তাকে সম্বোধন করে কোনো কথাই বলেননি। ইবনে ওলাইয়্যা এতে

^{৪৬}. সিয়ারে সাহাবা: খ.৮৮, পৃ. ৩২৩।

^{৪৭}. সিয়ারে সাহাবা: খ.৮, পৃ. ৩২৪।

পেরেশান হয়ে গেলেন। সেই মজলিসে তো কিছুই বলতে পারেননি। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের কাছে এই চিঠি লিখলেন:

হে আমার শ্রদ্ধাস্পদ আমীর! কয়েক যুগ ধরে আমি আপনার অনুগ্রহে ডুবে আছি। আল্লাহর কসম! আপনার এই অনুগ্রহগুলো আমার সাথীদের জন্য বরকত মনে করতাম। জানি না আপনি আমাকে কেন পৃথক করে দিয়েছেন। আপনার অসন্তুষ্টি সাথীদের মাঝে আমার মর্যাদাকে কমিয়ে দিয়েছে। আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম; কিন্তু আপনি আমার প্রতি কোনো দ্রক্ষেপই করেননি। আর আপনার এই দ্রক্ষেপ না করাই আমার প্রতি অসন্তুষ্টি হয়েছেন বলে মনে করি। কিন্তু আমি এখনো জানতে পারিনি যে, আমার কোনো অন্যায়টি আপনার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হে আমার সম্মানিত শিক্ষক! আপনি কেন বলেননি, আমার কি ভুল ছিল, যার কারণে আজ আমার হাজারো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনার দয়া বা অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি?

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এই আবেগপূর্ণ চিঠি পড়লেন। কিন্তু এর কোনো প্রভাব তার ওপর পড়েনি। তিনি উত্তরে কয়েক লাইন কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ কবিতাগুলোর অর্থ নিম্নে দেয়া হল:

(১) তুমি তোমার ইলমকে এমন একটি হিংস্র পুখীর রূপ দান করেছ, যা গরীবের মাল ছিনিয়ে নেয়।

(২) তুমি দুনিয়া এবং তার স্বাদ গ্রহণের জন্য এমন পন্থা অবলম্বন করেছ, যা দ্বীনের প্রতি আগ্রহকে মিটিয়ে দেয়।

(৩) তুমি তো দুনিয়া প্রেমীদের চিকিৎসক ছিলে, আজ দেখছি তুমি নিজেই দুনিয়া প্রেমী হয়ে গেছ।

(৪) ঐ সমস্ত রেওয়ায়েতগুলো আজ কোথায় গিয়েছে, যা আপনি ইবনে আউন ও ইবনে সীরীন থেকে বর্ণনা করতেন?

(৫) ঐ সমস্ত রেওয়ায়েতগুলো আজ কোথায়, যেখানে রাজা-বাদশাহদের সাথে সম্পর্ক রাখার কুফলতা বর্ণনা করা হয়েছে।

যদি তুমি বল, আমাকে তো এ ব্যাপারে বাধ্য করা হয়েছে, তাহলে আমি বলব, এমন সুযোগ তুমি দিলেই বা কেন? ইবনে ওলাইয়্যার কাছে লোক

মারফত উক্ত কবিতাগুলো পাঠানো হল। তিনি তা পড়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং সাথে সাথে চাকুরী থেকে পদত্যাগ পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেন।^{৪৮}

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. কে অভ্যর্থনা

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. রুকাহ নামক (আব্বাসীয় খলীফারা গরমের মৌসুমগুলো এখানে কাটাত, ইহা সবুজ-শ্যামল ও উর্বর ভূমি) স্থানে তাশরীফ নিয়েছেন শুনে শহরবাসী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রচণ্ড ভীড় জমাতে লাগল। বাদশাহ হারুনুর রশীদের এক বাঁদী মহল থেকে এ দৃশ্য অবলোকন করছিল। সে লোকজনের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে, তারা বলল যে, খোঁরাসানের একজন বড় আলিম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এখানে আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এত লোকজনের সমাগম হয়েছে। এ কথা শুনে বাঁদীটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠল:

هو الملك لا مالك هارون الذي لا يجمع الناس عليه إلا بشروط وأعوان.

বাস্তবে এ যুগের বাদশাহ তো এই ব্যক্তিই, হারুনুর রশীদ নয়। কেননা তার চারপাশে তার সৈন্য, পুলিশ, আনসার আর দেহরক্ষী ছাড়া কারো ভীড় থাকে না।^{৪৯}

৮. নেতৃস্থানীয়দের পদস্থলন দ্বারা অধিনস্তরাও প্রভাবান্বিত হয়

উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে পাঁচটি স্তর রয়েছে। যখন এদের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ আর দ্বন্দ শুরু হয়ে যায়, তখন পুরো পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়।

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. মুসাইয়্যিব বিন ওয়াজীহের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান, কখন ফিতনা-ফ্যাসাদ ব্যাপক আকার ধারণ করে? মুসাইয়্যিব র. বললেন, না, আমার জানা নেই। তিনি বললেন, দ্বীনের মধ্যে যারা বিশেষ লোক রয়েছে, তাদের মাঝে যখন ফিতনা-ফ্যাসাদ এবং দ্বীনের প্রতি অবহেলা ভাব দেখা দিবে, তখনই সাধারণ মানুষের মাঝে গুনাহের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারপর বললেন, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে পাঁচটি স্তর রয়েছে, যখন এদের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ আর দ্বন্দ শুরু হয়ে যায়, তখন পুরো পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যায়।

^{৪৮}. সিআরে সাহাবা: খ.৮, পৃ. ৩২৭।

^{৪৯}. সিআরে সাহাবা: খ.৮, পৃ. ৩২৯।

- (১) উলামা: এরা হলেন, নবীদের ওয়ারিস বা উত্তরসূরী। কিন্তু এরাই যখন দুনিয়ার লোভ-লালসায় পড়ে যায়, তখন আর কাকে নিজেদের বলে মনে করবে।
- (২) ব্যবসায়ীগণ: তারা হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি, তারা যদি খেয়ানত করা শুরু করেন, তাহলে আর কাকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি মনে করা হবে?
- (৩) মুজাহিদগণ: তারা হলেন আল্লাহ তা'য়ালার মেহমান। যখন তারাই গণীমতের মালের মধ্যে খেয়ানত শুরু করবে, তাহলে আর কাদের দ্বারা দুশমনের ওপর বিজয় লাভ করবে?
- (৪) ইবাদতকারী: তারা হলেন পৃথিবীর আসল বাদশাহ, যখন তাদের মধ্যে গুনাহের প্রবণতা বেড়ে যাবে, তাহলে আর কার অনুসরণ করা হবে?
- (৫) শাসকগণ: তারা হলেন জাতির রক্ষক, কিন্তু যখন তারাই ভক্ষক হয়ে যাবে, তাহলে আর কার কাছে অভিযোগ নিয়ে যাবে?

মহিলারা কি প্রতারণা ও ছলনার প্রতিচ্ছবি?

প্রশ্ন: বাদ সালাম আরয এই যে, অনেকে মহিলাদের এই অপবাদ দেয়া হয় যে, তার প্রতারণা ও ছলনার প্রতিচ্ছবি এবং দলীল হিসেবে তারা কুরআনের এই আয়াতকে পেশ করে: **إِنْ كَيْدٌ كُنْ عَظِيمٌ** (নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক) এ ধরনের কথা বলা কি ঠিক? মেহেরবানী করে জানিয়ে দিবেন।

উত্তর: ইহা আযীযে মিশর (মিশরের বাদশাহ) এর উক্তি। যা সে তার বিবির কু-চরিত্রের কথা জানতে পেরে বলেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালার সূরায়ে ইউসুফের মধ্যে তা উল্লেখ করেছেন। ইহা না আল্লাহ তা'য়ালার কথা। না এর দ্বারা সকল নারীকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর ওপর সকল নারীকে ধারণা করে নারীদের প্রতারক ও ছলনাকারী বলা কখনই কুরআন সমর্থন করে না।

দীনের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয় জানার উপযুক্তকে অনুপযুক্ত কে?

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, দীনের অপ্রকাশিত বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটনের যোগ্য ঐ ব্যক্তি যে ঈমানের অন্যান্য গুণাবলীতেও উঁচু স্তরে অবস্থান করে, তার খোদাভীতির

মান অতি উন্নত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হয় আবার দীনের তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটনে ব্যস্ত, উদ্দেশ্য নিজেকে গ্রহণযোগ্য মুত্তাকী হিসেবে প্রমাণ করা। তাহলে ইহা তার জন্য কেবল অসঙ্গত নয়, বরং সে নিন্দারও যোগ্য।

একবার ইবনে উমর রা. কে এক ইরাকী জিজ্ঞাসা করল, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যদি কেউ মশা মেরে ফেলে, তবে তাকে কি বিনিময় দিতে হবে? তিনি বললেন, তোমরা তো হুসাইন রা. কে শহীদ করে ফেলেছ অথচ এখন আমার কাছে এসেছ মশার খুনের ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতে। আমি নিজে রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, এরা দুইজন আমার ফুল। ঠিক তেমনিভাবে বিশর বিন হারিসকে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তির মা তার ছেলেকে বলল, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। এখন তাকে কি করতে হবে? তিনি উত্তরে বললেন: যদি ঐ ব্যক্তি আপন মাতার যাবতীয় হক আদায় করে থাকে এবং ঐ একটি কাজ ব্যতীত মাতার আনুগত্যের বেলায় আর কোনো কাজ অবশিষ্ট না থাকে, তবে তার উচিত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়া। আর যদি এখনও আরো কিছু হক আদায়ের বাকী থাকে; তবে তার কর্তব্য হল, তালাক না দেয়া।^{৫০}

একটি জটিল মুকাদ্দমা ও তার মীমাংসা

এই ঘটনাটি হযরত আলী রা. এর খিলাফতের যুগে ঘটেছিল। দুইজন মুসাফির অনেক দূর চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আবার তাদের খুব ক্ষুধাও পেয়েছিল। তাই তারা একটি ছায়া বিশিষ্ট গাছের নীচে বসে নিজ নিজ খাবার দস্তরখানের উপর রাখল। তাদের একজনের ছিল পাঁচটি রুটি। অন্য ব্যক্তির ছিল তিনটি রুটি। তারা দু জনে খানা খেতে বসেছিল। এমন সময় তৃতীয় মুসাফির সেখানে এসে সালাম করলে তারা তাকে সালামের উত্তর দিয়ে খাওয়ায় শরীক হওয়ার দাওয়াত দিল। সে কোনো ধরনের সংকোচ ছাড়াই খাওয়ায় শরীক হয়ে গেল। আহার শেষে তৃতীয় মুসাফিরটি নিজের খাদ্যের মূল্য হিসাবে আটটি দিরহাম দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। সে মুসাফিরটি তো মূল্য পরিশোধ করে চলে গেছে। কিন্তু তাদের দু

^{৫০}. তরজমানুস সুন্নাহ: খ.২, পৃ. ২২২।

জনের মাঝে এই টাকার ভাগাভাগি নিয়ে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। যার পাঁচ রুটি ছিল, সে বলল, পাঁচ দিরহাম আমার, আর তিন দিরহাম তোমার। হয়ত সে এই ফায়সালাটি এই জন্য করেছিল যে, আগন্তুক ব্যক্তিটি প্রতিটি রুটির মূল্য এক দিরহাম মনে করে আটটি রুটির মূল্য আট দিরহাম করে দিয়েছে। তাই পাঁচ রুটি ওয়ালা নিজের জন্য পাঁচ দিরহাম রাখতে চাচ্ছিল এবং তিন দিরহাম তিন রুটি ওয়ালাকে দিচ্ছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি তিন দিরহাম নিতে রাবী হচ্ছিল না। তার কথা হলো, এই দিরহামগুলো যেহেতু একই সঙ্গে দেয়া হয়েছে, তাই এর সমানভাবে ভাগ হওয়া উচিত। সে তার চার দিরহাম নেয়ার জন্য জিদ ধরল। অবশেষে আপোষে তাদের মধ্যে মীমাংসা না হওয়ায় আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রা. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দু জনই পুরো ঘটনা শুনালেন। আলী রা. ঘটনা শুনে তিন রুটি ওয়ালাকে বললেন, যখন তোমার সাথী তোমাকে তিন দিরহাম দিতে প্রস্তুত তাতে তুমি রাবী হয়ে যাও। কিন্তু সে চার দিরহামই দাবী করতে লাগল। আলী রা. তাকে বললেন, সে তো তোমাকে তিন দিরহাম দিয়ে তোমার ওপর ইহসান করছে। নতুবা ন্যায় বিচার করলে, তোমার মাত্র এক দিরহাম এবং তোমার সাথীর সাত দিরহাম পাওয়া উচিত। এই অদ্ভুত ফায়সালায় সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল এবং এর কারণটা জানতে চাইল।

হযরত আলী রা. তাকে বুঝাতে গিয়ে বললেন, তোমরা আহারকারী তিনজন। তোমার রুটিও ছিল তিনটি। আর তোমার সাথীর রুটি ছিল পাঁচটি। তোমরা দুইজন সমান সমান খেয়েছ। আবার তৃতীয় জনকেও সমান অংশ দিয়েছ। তোমার তিনটি রুটির প্রতিটির তিনটুকরো করলে নয় টুকরো হয়। আর তোমার সাথীর পাঁচটি রুটি হয় পনের টুকরা। নয় ও পনের টুকরা মোট চব্বিশ টুকরা হয়। তিন জনের প্রত্যেকে সমান টুকরো খেলে প্রত্যেকের ভাগে আট টুকরো করে পড়ে। তুমি নিজের নয় টুকরোর মধ্য থেকে নিজের আট টুকরো খেয়েছ। এক টুকরো তৃতীয় মুসাফিরকে খাইয়েছ। তোমার সাথীর নিজের পনের টুকরোর মধ্যে আট টুকরো নিজে খেয়েছে এবং তৃতীয় জনকে সাত টুকরা খাইয়েছে। কাজেই আট দিরহামের মধ্যে তুমি একটি এবং সে সাতটি পাবে। তারপর সে

এই ফয়সালার ওপর রাযী হয়ে গেল। একটু চিন্তা করে দেখুন! মুকাদমাটি কত জটিল ছিল, অথচ কত সহজে তার মীমাংসা হয়ে গেল।

—তারীখুল খুলাফা: ৫৯

হযরত জিবরাঈল আ. কর্তৃক ঈসা আ. কে শিক্ষাদান

হযরত আনাস রা. ইরশাদ করেন, যখন ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা আ. কে হত্যা করার জন্য একত্রিত হল, তখন হযরত জিবরাঈল আ. ঈসা আ. এর কাছে এসে বললেন, আপনি এই দু'আটি পড়ুন:

اللهم أني أسئلك باسمك الواحد الأحد أدعوك، اللهم باسمك الصمد ادعوك،
اللهم باسمك العظيم الوتر الذي ملأ الأركان كلها إلا ما فرجت عني ما أمسيت فيه
وما أصبحت فيه.

হযরত ঈসা আ. এই দু'আ করলে আল্লাহ তা'য়ালা জিবরাঈল আ. কে এই হুকুম দিলেন যে, আমার বান্দাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।^{৫১}

কাফের সাত নাড়ী ভর্তি করার নিয়তে খায়

হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস রা. বলেন, এক বছর দূর্ভিক্ষ হলে গ্রামবাসীরা মদীনা মুনাওয়ারা আসতে থাকল। সাহাবীরা হযূর সা. এর আদেশ মত তাদের মধ্যে প্রত্যেককে নিয়ে ঘরের মেহমান বানাতো এবং তাদের রাতের খাবার খাওয়াতো।

এক রাতে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি আসলে হযূর সা. তাকে নিজে ঘরে নিয়ে গেলেন। হযূর সা. এর কাছে যা একটু খাবার ও দুধ ছিল, তা ঐ ব্যক্তি একাই খেয়ে ফেলল। সে হযূর সা. এর জন্য কিছুই রাখল না। এভাবে হযূর সা. তাকে এক দুই রাত পর্যন্ত সাথে করে নিয়ে আসতে থাকেন। আর সে এসে হযূর সা. এর জন্য কিছুই না রেখে সবই খেয়ে ফেলত। এরপর সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এবার হযূর সা. তাকে রাতে খাওয়ার জন্য বাড়িতে নিয়ে আসলে সে আগের তুলনায় খুবই কম খায়। তখন আমি হযূর সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি ঐ ব্যক্তি? (যে ইতিপূর্বে সব খাবার খেয়ে নিত) হযূর সা. উত্তরে বললেন, (হ্যাঁ, সে ঐ ব্যক্তি, তবে এতটুকু পার্থক্য যে, সে

পূর্বে কাফের ছিল, এখন মুসলমান হয়ে গিয়েছে)। কাফের যখন খানা খায়, তখন সাত পেটে খায়, আর মুসলমান যখন খায়, তখন এক পেটেই খায়।^{৫২}

ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে উম্মতের করণীয় কি?

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন: ঐ যুগ অতি নিকটবর্তী, যখন মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি ছাগল। যা নিয়ে তারা বিভিন্ন ফিতনা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের চূড়ায় এবং জঙ্গলে পলায়ন করবে।^{৫৩}

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে নিরাপদ রইল, সে বড়ই ভাগ্যবান (তিনবার বললেন) এবং যে ব্যক্তি তাতে নিপতিত হল, অতঃপর তাতে ধৈর্যের পরিচয় দিল, তার সম্পর্কে আর কী বলব।^{৫৪}

ব্যাখ্যা: প্রতিটি ফিতনার মধ্যে রয়েছে একটি আকর্ষণ। যারা বেদ্বীন তারা অজ্ঞতার দরুণ বা একে দ্বীন মনে করায় তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আর যারা দ্বীনদার তারা তাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে নিপতিত হয়। এসব ফিতনার উদাহরণ হচ্ছে ঐ সব সংক্রামক ব্যাধিগুলোর ন্যায়, যা পৃথিবীতে হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ব্যাধির প্রকোপ যে এলাকায় দেখা দেয়, সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়া কখনও সুস্থতার নিদর্শন নয়, বরং সুস্থতার লক্ষণ হচ্ছে সেগুলো উপেক্ষা করা। এক্ষেত্রে নিরাময় লাভের একমাত্র পন্থা হচ্ছে, ঐ পরিবেশ থেকে বের হয়ে অন্যত্র পলায়ন করা। এই সুস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে ইমাম বুখারী র. পৃথক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন।

অতীতের সংঘটিত বিভিন্ন ফিতনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূর্ববর্তী পূণ্যবান লোকেরা যখনই তাদের যুগে কোনো ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথখুজে পাননি, তখন ঐ ফিতনায় ঝাঁপ দেয়ার পরিবর্তে তারা সেগুলো থেকে দূরে অবস্থান করেছেন। যদি উম্মত একটি হাদীসের অর্থ অনুধাবন

^{৫২}. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ২৬৩।

^{৫৩}. বুখারী ও মুসলিম।

^{৫৪}. আবু দাউদ।

করত, তাহলে এ সব ফিতনা কখনও প্রবল আকার ধারণ করত না। আর যদি কোনো বেদ্বীন তাতে নিপতিত হয়েও যেত, তাহলে কমপক্ষে দ্বীনদার ব্যক্তিদের দ্বীন তো তাদের অনিষ্টকর কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ রয়ে যেত। কিন্তু যখন ঐ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রইল না, তখন বেদ্বীনরা ঐ সব ফিতনাকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করল আর দীনদাররা সংশোধনের লক্ষ্যে তাতে যোগদান করলেন। পরিণামে তারা সংশোধনের পরিবর্তে নিজেদের দ্বীনকেও খুইয়ে বসলেন। আল্লাহই সাহায্যকারী। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা দাজ্জাল। দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, কেউ যেন তাকে দেখতেও না যায়। কেননা তার চেহারার অপনয়নও মুমিনের ঈমানের ক্ষতি সাধন করবে।

স্মরণ রাখা উচিত, মুখ ও অস্ত্র উভয়ের দ্বারা জিহাদ করা উম্মতের ওপর ফরয। কিন্তু যখন মনে করা হবে যে, এই জিহাদ মুসলমানদের অভ্যন্তরে অনৈক্য ও ভাঙ্গনের সৃষ্টি করবে, তাতে হক-বাতিলের পার্থক্য অবশিষ্ট থাকবে না এবং সংশোধনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি হবে। তখন তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে সাহাবীদের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা বলা হল এবং তাঁর সম্মুখে এই আয়াত পাঠ করা হলঃ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً (কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ততক্ষণ অব্যাহত রাখ, যতক্ষণ ফিতনা বিদ্যমান থাকে)। - (সূরা আনফাল: ৩৯)

তখন উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন, ফিতনা দূরীভূত করার জন্য যে যুদ্ধ ছিল, তাতো আমরা করে ফেলেছি। এখন তোমরা ঐ যুদ্ধেরই সূচনা করছ, যার মাধ্যমে আরো বিভিন্নমুখী ফিতনার সৃষ্টি হবে। স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং আত্মিক শক্তির সঠিক ধারণা না নিয়ে ফিতনার মুকাবিলা করতে যাওয়া শুধু আবেগ ছাড়া কিছু নয়। ফিতনাগুলোকে দূর করার জন্য প্রথমে ফিতনার কারণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই হচ্ছে বুদ্ধি-বিবেচনা ও শরীয়তের হুকুম। যখন এর প্রতি লক্ষ্য না করে শুধুই উচ্ছাস প্রদর্শন করা হয়, তখন তা পরাজয়ের কারণে পরিণত হয়। ঠিক তেমনিভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা জোশ দ্বারা বেষ্টিত হয়, তখন তা-ও শুধু মস্তিষ্ক প্রসূত দর্শনে লিপ্ত হয়ে যায়। কামিয়াবীর মূলতন্ত্র হচ্ছে, জোশের সাথে হুঁশ বিদ্যমান থাকা।

মুর্দা দিলের বাকপটু আলিম উম্মতের জন্য হুমকি

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, বসরার এক প্রতিনিধি দল হযরত উমর রা. এর কাছে এসেছিল। এর মধ্যে আহনাফ ইবনে কায়েস নামে এক ব্যক্তি ছিল। যখন মজলিস শেষ হয়ে গেল, সবাই বিদায় জানালেন। কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়েসকে তাঁর কাছে রেখে দিলেন। দুই বছর কেটে যাওয়ার পর হযরত উমর রা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলতে পার তোমাকে কেন যেতে বাধা দিয়েছিলাম? পরবর্তীতে তিনি নিজেই বললেন, তোমাকে যেতে এই জন্য বাধা দিয়েছিলাম যে, হযূর সা. আমাদের ঐ মুনাফিক থেকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, যে শুধু মৌখিক আলিম। তোমার ব্যাপারে ভয় হচ্ছিল, তুমি আবার ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছ কি না? কিন্তু এক বছর তোমাকে এখানে রেখে বুঝতে পারলাম, তুমি তাদের মধ্যে নও।

হযরত আবু উসমান নাহদী র. বলেন, আমি হযরত উমর রা. কে মিসরে বসে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা ঐ মুনাফিক থেকে বেঁচে থাক, যারা আলিম। লোকজন জিজ্ঞেস করল, মুনাফিক কিভাবে আলিম হতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন, যারা কথা বলবে তো ঠিক; কিন্তু আমল করবে তার উল্টোটার ওপর।

হযরত উমর রা. ইরশাদ করেন, আমি এ কথাই বলি যে, এ উম্মতকে তার মুনাফিক আলিমরাই ধ্বংস করবে। হযরত আবু উসমান র. বলেন, আমি হযরত উমর রা. কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, এ উম্মতের মধ্যে ঐ সমস্ত মুনাফিকদের আবির্ভাবের আশংকা করছি, যারা আলিম হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, মুনাফিক আবার কিভাবে আলিম হতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন, তারা মৌখিক আলিম তো হবে; কিন্তু অন্তর ও আমলের দিক দিয়ে অজ্ঞ হবে।^{৫৫}

হযরত লোকমানের হিকমতের আশ্চর্যজনক ঘটনা

কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে: وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ.

অর্থ: আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। -সূরা লোকমান: ১২।

^{৫৫}. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ. ৩০৪।

হযরত লোকমান রা. আল্লাহ তা'য়ালার একজন প্রিয় বান্দা ছিলেন। যাকে আল্লাহ তা'য়ালার হিকমত তথা প্রজ্ঞা, বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীনি দূরদর্শিতার মর্যাদায় সমাসীন করেছিলেন। তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। সে কাজগুলো এই: সদা সত্য বলা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা।

তাঁর বিচক্ষণতার একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। যখন তিনি গোলাম ছিলেন, তাঁর মুনীব তাঁকে বলল, একটি ছাগল যবেহ করে তার সবচেয়ে ভাল দুইটি অংশ নিয়ে এসো। তিনি ঐ বকরীর জিহ্বা ও দিল নিয়ে এলেন। এর কিছু দিন পর মুনীব তাঁকে বকরী যবেহ করে তার খারাপ দুটি অংশ নিয়ে আসতে বললেন। তিনি এবারও জিহ্বা এবং দিল নিয়ে এলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি কারো জিহ্বা এবং অন্তর ঠিক হয়ে যায়, তাহলে এটাই সবচেয়ে উত্তম। আর যদি এ দুটি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না।^{৫৬}

গুনাহের কারণে এক পাদ্রী তার ঘরেই লাঞ্চিত হলো

একটি মেয়ে সারাদিন বকরী চরাতো এবং এক আবিদের (ইবাদতকারী) খানকার পাশে গিয়ে রাত কাটাত। তার চার ভাই ছিল। একদিন আবিদ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে মেয়েটির সাথে যিনা করে বসল। মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে গেলে শয়তান এবার তাকে এ কথা বুঝাল যে, এখন তো মানুষের কাছে লজ্জিত হতে হবে। তাই উত্তম হলো এই যে, তাকে হত্যা করে কোথাও দাফন করে দাও। তোমার পাক পবিত্রতা দেখে তোমার ব্যাপারে এ ধরনের চিন্তাও করবে না। আর যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করে, সত্য-মিথ্যা বলে কেটে পড়বে। কে আছে এমন যে, তোমার ব্যাপারে এ ধরনের খারাপ মন্তব্য করতে যাবে? সেও বুঝে নিল যে, কথাতো ঠিকই বলেছে। তাই সে একদিন রাতে সুযোগ বুঝে মেয়েটিকে হত্যা করে জনমানবশূন্য স্থানে পুঁতে রেখে আসল।

এবার শয়তান মেয়েটির চার ভাইয়ের কাছে গেল এবং প্রত্যেককে পুরো ঘটনা জানিয়ে দিয়ে দাফনের স্থানও বলে দিল। সকালে যখন প্রত্যেকে ঘুম থেকে উঠল, তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি আজ এক আশ্চর্য ধরণের স্বপ্নই দেখেছি। কিন্তু আমার তা বলতে সাহস হচ্ছে না। অপর জন বলল, তুমি বল কোনো অসুবিধা হবে না। তারপর সে পুরা ঘটনা খুলে বলল, এই ঘটনা শুনে প্রত্যেকেই বলল যে, আমরাও তো এ ধরণেরই স্বপ্ন দেখেছি। তাই তাদের এখন বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ঘটনাটি সত্য।

অতএব, তারা বাদশাহের নিকট বিচার নিয়ে গেল। বাদশাহর হুকুমে ঐ পাদ্রীকে নিয়ে সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে মেয়েটির লাশ বের করে নিয়ে আসল। পরিপূর্ণ প্রমাণ পাওয়ার পর তাকে বাদশাহর দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এমন সময় শয়তান এসে তাকে বলল যে, এই সব কিছু আমারই চালাকী। এখনও যদি তুমি আমাকে সন্তুষ্ট কর, তাহলে তোমাকে বাঁচিয়ে দিব। সে বলল, আপনি যা বলুন, তা-ই করতে রাখী আছি। শয়তান বলল, আমাকে সিজদা কর। সে তাকে সিজদাও করল। তাকে পুরা বে-ঈমান বানিয়ে শয়তান বলল, আমি তোমার থেকে দায়িত্ব মুক্ত। আমি তো ঐ আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সমস্ত জাহানের মালিক। সুতরাং বাদশাহ পাদ্রীকে হত্যা করার হুকুম দিলেন।^{৫৭}

এক গ্রাম্য ব্যক্তির প্রশ্ন এবং রাসূল সা. এর উত্তর

এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযূর সা. এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করল, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। হযূর সা. তাকে অনুমতি দিলেন। বেদুঈন বলল, হে আল্লাহর রাসূল!

প্রশ্ন: আমি ধনী হতে চাই।

উত্তর: জীবিকা ও অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট হও।

প্রশ্ন: আমি সবচেয়ে বড় আলিম হতে চাই।

উত্তর: তাকওয়া অবলম্বন কর।

প্রশ্ন: আমি সম্মানী ব্যক্তি হতে চাই।

উত্তর: মানুষের কাছে হাত পেত না। সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন: নিজেকে সৎ লোকের মধ্যে গণ্য করতে চাই।

উত্তর: মানুষের উপকার করতে থাক।

প্রশ্ন: ন্যায় পরায়ণ হতে চাই।

উত্তর: যা নিজের জন্য পছন্দ করবে, তা অপরের জন্যও পছন্দ করো।

প্রশ্ন: আমি শক্তিশালী বাহাদুর হতে চাই।

উত্তর: আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ভরসা রাখ।

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বিশেষ মর্যাদা পেতে চাই।

উত্তর: অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'য়ালার যিকির কর।

প্রশ্ন: রিযিকের মধ্যে বরকত পেতে চাই।

উত্তর: সর্বদা অযু অবস্থায় থাকবে।

প্রশ্ন: আমার দু'আ আল্লাহর কাছে কিভাবে কবুল হতে পারে?

উত্তর: কখনও হারাম জিনিস খাবে না।

প্রশ্ন: ঈমানের পরিপূর্ণতা পেতে চাই।

উত্তর: তোমার আখলাক বা চরিত্র সুন্দর কর।

প্রশ্ন: কিয়ামতের দিন গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে চাই।

উত্তর: সহবাসের পর সাথে সাথে গোসল করে নিবে।

প্রশ্ন: গোনাহ থেকে মাফ পেতে চাই।

উত্তর: অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার পড়তে থাকবে।

প্রশ্ন: কিয়ামতের দিন চেহারায় নূর নিয়ে উঠতে চাই।

উত্তর: কারো প্রতি জুলুম করো না।

প্রশ্ন: আমি চাই যে আল্লাহ তা'য়ালার আমার ওপর দয়াশীল হবেন।

উত্তর: তুমি আল্লাহ তা'য়ালার বান্দাদের ওপর দয়া কর।

প্রশ্ন: আমি চাই, আল্লাহ আমার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।

উত্তর: তুমি তাঁর বান্দাদের দোষত্রুটি গোপন রাখ।

প্রশ্ন: অপমান বা অপদস্ত হওয়া থেকে বাঁচতে চাই।

উত্তর: যিনা থেকে বেঁচে থাক।

প্রশ্ন: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয় হতে চাই।

উত্তর: যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয় তাকে বন্ধু বানিয়ে নাও।

প্রশ্ন: আমি আল্লাহ তা'য়ালার অনুগত বান্দা হতে চাই।

উত্তর: ফরয আহকামগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় কর।

প্রশ্ন: আমি কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে হতে চাই।

উত্তর: আল্লাহর ইবাদত এভাবে কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, অথবা যেন এমন হয় যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

প্রশ্ন: হে আল্লাহর রাসূল সা. কোন জিনিস গোনাহ মারফের কারণ হবে?

উত্তর: চোখের পানি, বিনয়ী এবং অসুস্থতা।

প্রশ্ন: কোন জিনিস দোষখের আগুনকে ঠাণ্ডা করে দিবে?

উত্তর: দুনিয়ার মুসীবতের ওপর ধৈর্যধারণ করলে।

প্রশ্ন: কোন জিনিস আল্লাহ তা'য়ালার রাগকে ঠাণ্ডা করে দেয়?

উত্তর: গোপনে সদকা করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

প্রশ্ন: সবচেয়ে খারাপ কাজ কি?

উত্তর: দূর্ব্যবহার ও কৃপণতা।

প্রশ্ন: সবচেয়ে ভাল কাজ কি?

উত্তর: উত্তম চরিত্র, নম্রতা ও ধৈর্য।

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'য়ালার ক্রোধ থেকে বাঁচতে চাই।

উত্তর: মানুষের ওপর রাগ কর না।^{৫৮}

আসমাউল হুসনার বর্ণনা

১. মানুষ তার স্বভাবগত দুর্বলতার কারণে উৎসাহ পাওয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মুমিন মাত্রই উচিত ছিল যে, যখনই সে জানতে পারবে, আমার প্রিয় রবের প্রিয় নাম। আর তিনি এই সমস্ত নামগুলো দ্বারা তাঁকে ডাকতে এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে এই নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। তাহলে তো সে নিজেকে ঐ নামের মধ্যে বিলিয়ে দিত। এবং নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ঐ নামের যিকিরে মোহান্বিত করে সেই সম্পদ পেয়ে ফেলত, যা ঐ নামের মধ্যে লুকায়িত আছে।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষের অন্তরে এই ধরনের আবেগের সৃষ্টি হয় না। তাই তাদের আসমাউল হুসনার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য তার কিছু গুণাবলী এখানে পেশ করা হল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কুরআন ও হাদীস থেকে নেয়া হয়নি; বরং অতীতে আল্লাহর ওলীরা এই প্রিয় নামগুলোর যিকির দ্বারা যে ফায়দাগুলো পেয়েছিলেন তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যেন অন্যরাও এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এই স্বল্প পরিসরে আসমাউল হুসনার সবগুলো ফায়দা তো জমা করা সম্ভবপর নয়, বরং এটা তো এমন হলো যে, জান্নাতে ফুলের দ্রাণ নিয়ে জান্নাতের প্রতি উৎসাহিত করা। সুগন্ধি তার নিজ স্থানে ঠিক আছে; কিন্তু ঐ জিনিসের স্বাদ তো অবশ্যই তার চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। সুতরাং এই ফায়দাগুলো সুগন্ধি সাদৃশ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান ও এক্বীনের সাথে ঐ নামগুলো পড়বে। সে ঐ স্বাদ পাবে যা সুগন্ধি থেকেও অনেক উত্তম।

২. মানুষ আসমাউল হুসনার সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কয়েকবার মাত্র এই নামগুলো পড়েই এত বেশী ফায়দা কিভাবে অর্জন করা যায়? এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে আমার এতটুকু আরম্ভ যে, সে যেন তার অন্তরে এ কথার অবতারণা করে, আসলে ঐ নামগুলো কোনো সত্তার? এই সত্তার চেয়ে বড় সত্তা আর আছে কি না? হতেই পারে না। তাহলে আর এত দ্বিধা দ্বন্দের কি আছে? নিশ্চয় আসমাউল হুসনার যিকির দ্বারা ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর চেয়েও বেশ ফায়দা পাওয়া যায়। তবে কেউ তো আমল করে দেখতে পারে।

৩. সব কিছুর ক্ষেত্রে সংখ্যা ও পরিমাণের বেশ প্রভাব রয়েছে। ইউনানী চিকিৎসকদের অষুধ প্রণালী পড়ে দেখুন। ছটাক, তোলা, মাশা পরিমাণও কিছু কম বেশী হলে অষুধের কার্যকারীতার মধ্যে পরিবর্তন চলে আসে। অথচ জিনিস একটাই। কিন্তু পরিমাণ এবং ওজনের কম বেশী তার কার্যকারীতাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

এক ব্যক্তি কোনো কথা একবার শুনেই মুখস্থ করতে পারে। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি একই কথা তিনবার শোনা দ্বারা মুখস্থ করতে পারে। অথচ তাদের প্রত্যেকের কান ও মুখ একই। এক ব্যক্তির মুখস্থ শক্তি কতটুকু? এ ধারণাটা অনেক সময় সংখ্যা এবং পরিমাণের দ্বারাও

অনুমান করা হয়। এমনভাবে ঠাণ্ডা গরমের তাপমাত্রারও বেশ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বর্তমান যুগের অত্যাধুনিক যন্ত্রগুলোও সংখ্যা এবং পরিমাপের প্রভাবকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে। হযূর আকরাম সা. কিছু দু'আ এবং কালিমার সাথে তার সংখ্যাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যা সংখ্যা এবং পরিমাপের কার্যকর হওয়ার মযবূত ও গ্রহণযোগ্য দলীল।

৪. মানুষ তার জীবনের মাঝে দ্বীন এবং দুনিয়াকে পৃথক করে রেখেছে। অথচ ইসলাম এ দুটির সমন্বয়ে পরিচালিত। সুতরাং যেই আসমাউল হুসনার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পার্থিব উপকারগুলো উল্লেখ আছে, তেমনিভাবে তার সাথে অগণিত দ্বীনি ফায়দাও রয়েছে। আবার যেই নামগুলোর মধ্যে দ্বীনি ফায়দা রয়েছে, সেই নামগুলোর মধ্যে পার্থিব ফায়দাও রয়েছে।

৫. আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন ব্যক্তিদের এমন দীন দান করেন, যা তার দুনিয়ায় চলার জন্য মঙ্গল হয়। এমনভাবে তাকে এমন দুনিয়া দান করেন, যা তার দ্বীনের ওপর চলার জন্য সহজ হয়।

৬. কোনো কাজে লাভবান হওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, এ সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কুদরতী হাতে রয়েছে। সুতরাং ঐ যিকির, ওযীফা এবং দু'আ দ্বারা তখনই উপকৃত হতে পারবে। যখন তা একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করবে। আল্লাহ তা'য়ালা যদি রাযী থাকেন, তাহলে সমস্ত ফায়দা আর উপকার কাজে আসবে। আর আল্লাহই যদি রাযী না থাকেন, তাহলে আর কিসের যিকির? কিসের ওযীফা।

৭. যদি কোনো ভাল জিনিসকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহলে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা ছাড়া আর কিছুই অর্জন হয় না। খাবার যতই দামী হোক না কেন? যদি তা আপন স্থানে না ঢেলে নাক অথবা কান দিয়ে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে কোনো লাভ হবে না, বরং ক্ষতি হবে। সুতরাং আসমাউল হুসনার যিকির দ্বারা নিজের কোনো মন্দ উদ্দেশ্য হাসিল করার অর্থই হচ্ছে নিজেকে নিজে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার অসন্তুষ্টির ভয় অন্তরে থাকা দরকার এবং এই নামের যিকির দ্বারা আত্মসংশোধনের অভিপ্রায় অন্তরে থাকা চাই।

৮. বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ নামাবলীর যিকির দোষনীয় নয়। কিন্তু কাজের কথা হল এই যে, প্রথমে ঐ নামগুলো বাছাই করবে, যেগুলোর মধ্যে আত্মসংশোধন, মাখলুক থেকে বিমুখতা এবং আল্লাহ তা'য়ালার মুহাব্বতের গুণাবলী রয়েছে। এরপর বাকীগুলো পড়ে নিবে এবং সর্বদা এ কথা স্মরণে রাখবে যে, সমস্ত নামগুলোই শ্রেষ্ঠতম ও মর্যাদা সম্পন্ন। তাই সব আসমাউল হুসনার-ই যিকির করবে।

৯. এই আসমাউল হুসনাগুলো ঘরের সন্তানাদিদের মুখস্থ করাবে এবং এই নামগুলোর যিকির দ্বারা নিজ ঘর ও মসজিদসগুলোকে ঈমানী নূরে নূরান্বিত করবে।

১০. গুনাহের কারণে এবং বিপদে পেরেশান, দুঃখ-দুর্দশায় আক্রান্ত মুসলমান এক দিকে যাকে প্ররোচক আত্মা বিষাক্ত সাপের ন্যায় দংশন করে যাচ্ছে। অপর দিকে শয়তান সর্বদা তার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছে এবং তাকে ইসলাম ও মানবতার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে জুলুম, অহংকার, প্রবৃত্তির পূজা, বদ অভ্যাস, হারাম ও নাজায়েয জিনিসের দিকে নযর করিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্রকে বদলিয়ে দিয়ে শয়তানের জাহান্নামী দলে शामिल হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছে। প্রবৃত্তি ও শয়তানের ষড়যন্ত্রের শিকার এই মুসলমানদের পার্থিব বিপদাপদ, দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটন এবং অপমান-অপদস্তকে কাজে লাগিয়ে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। এই অসহায় মুসলমানরা কোথায় যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মানুষকে সৃষ্টিকারী এবং মুহাব্বতকারী আল্লাহ তা'য়ালার যিনি অতি দয়ালু, মেহেরবান, শক্তিশালী, দয়াময়, প্রেমময় এবং সুপ্রতিষ্ঠাকারী তিনিই একমাত্র বান্দাকে এই বিপদাপদ এবং দুঃখ-বেদনা অভাব, অনটন থেকে মুক্তি দিতে পারেন। বান্দাতো শুধু এ দিকে মনোযোগী হোক এবং আসমাউল হুসনার বাগিচায় ঘুরে বেড়িয়ে দেখুক। ইনশাআল্লাহ প্রতি কদমে আনন্দিত হবে এবং খুশীতে আত্মহারা হয়ে অন্তরে এক প্রশান্তি অনুভব করতে থাকবে। প্রতি মুহূর্তে ঐ বাগিচায় ঘুরতে থাকবে। যতই ঘুরবে, ততই রুহানী পিপাসা বৃদ্ধি হতে থাকবে। হায়! যদি কোনো বান্দা এই আসমাউল হুসনাগুলো মুখস্থ করে নিত।

আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলী জানা কেন প্রয়োজন

কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় আসমাউল হুসনা এবং আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলী অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তা ব্যতীত পৃথিবী সৃষ্টিকারীর (আল্লাহ তা'য়ালার) পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, যা মানুষের সংশোধনের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও প্রয়োজনীয়। যেমন: কোনো ব্যক্তির এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহই রিযিকদাতা অথচ সে আল্লাহকে অদ্বিতীয় জানা সত্ত্বেও অনেক কিছুকে সে রিযিকদাতা বলে মনে করে, কেউ তার পিতাকে, তার স্বামীকে, তার দেশ প্রধানকে রিযিকদাতা মনে করছে। আবার কেউ তার ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্যকে রিযিকদাতা মনে করছে। এমনভাবে যে ব্যক্তির এ কথা জানা নেই, আল্লাহ তা'য়ালার কঠিন শাস্তি দাতা এবং সে আল্লাহ তা'য়ালার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায় এবং গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে না। যে ব্যক্তির আল্লাহ তা'য়ালার এ গুণ সম্পর্কে জানা নেই যে, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। সে আল্লাহ তা'য়ালার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায় এবং এ কথা মনে করে আমি এত বড় পাপী, আমার গোনাহ কখনও মার্ফ হবে না। তারপর সে বেপরওয়া হয়ে যায়।

মোটকথা, আসমাউল হুসনা এবং আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলীর পরিচয় ব্যতীত মানবজাতির সংশোধন এবং আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

আসমাউল হুসনার সংখ্যা এবং মুখস্থকারীদের জন্য সুসংবাদসমূহ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযূর সা. ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালার আসমায়ে হুসনা (গুণবাচক নাম) নিরানব্বইটি, যে ব্যক্তি এই নামগুলো মুখস্থ করবে (এবং তার ওপর ঈমান আনবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মিশকাত শরীফ-১৯৯)

এখানে এ কথা জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ তা'য়ালার নাম শুধু নিরানব্বইটি নয়। কুরআন-হাদীসে এ নামগুলো ছাড়াও আরো ভালো

ভালো অনেক নাম রয়েছে। এমনভাবে অন্যান্য আসমানী কিতাবগুলোতে আল্লাহ তা'য়ালার এমন কিছু নাম রয়েছে, যা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফের উপরোল্লিখিত হাদীসে শুধু ঐ নামেরই আলোচনা এসেছে, যা মুখস্থ করলে জান্নাতবাসী হতে পারবে। সুতরাং ঐ নামগুলো মুখস্থ করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ বুঝে-শুনে তা মুখস্থ করবে। আর আল্লাহ তা'য়ালাকে ঐ সমস্ত গুণে গুণান্বিত মনে করা এবং তা মনে প্রাণে মেনে নেয়া, যেন তাঁর প্রতি আপন আকীদা ও বিশ্বাস সঠিক থাকে। এমনভাবে এই নামের যিকির বারবার করা উচিত। যাতে তার ফাযায়েল এবং সুন্দর গুণাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। আর এটাই ঐ নামগুলো মুখস্থ করার সবচেয়ে বেশী ফায়দা।

আল্লাহ তা'য়ালার আপন মেহেরবানীতে আমাদের সকলকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে এবং ফাযায়েল দ্বারা সুসজ্জিত করে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন॥

তিরমিযী শরীফের হাদীস ও তার তরজমা

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আল্লাহ তা'য়ালার যেই নামগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে। তার ব্যাখ্যা তিরমিযী শরীফের হাদীসে করা হয়েছে। এই জন্য এখানে সর্ব প্রথম তিরমিযী শরীফের হাদীস এবং তরজমা দেয়া হল। এরপর ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক নামের অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِئَةٌ غَيْرَ وَاحِدَةٍ. مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

الْحَفِیْظُ الْمُقِیْتُ الْحَسِیْبُ الْجَلِیْلُ الْكَرِیْمُ الرَّقِیْبُ الْمُجِیْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِیْمُ
الْوَدَّودُ الْمَجِیْدُ الْبَاعْثُ الشَّهِیْدُ الْحَقُّ الْوَكِیْلُ الْقَوِیُّ الْمَتِیْنُ الْوَالِیُّ الْحَمِیْدُ
الْمُحْصِی الْمُبْدِئُ الْمُعِیْدُ الْمُخِیُّ الْمُمِیْتُ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ
الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدَّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِیُّ
الْمُتَعَالِ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُتَّقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمُلْكُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِیُّ الْمُغْنِیُّ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِیُّ الْبَدِیْعُ الْبَاقِیُّ
الْوَارِثُ الرَّشِیْدُ الصَّبُّورُ.

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। হযূর সা. ইরশাদ করেন:
আল্লাহ তা'য়ালার আসমায়ে হুসনা (গুণবাচক নাম) নিরানব্বইটি। যে
ব্যক্তি এই নামগুলো মুখস্থ করবে (এবং তার ওপর ঈমান আনবে) সে
জান্নাতে যাবে।

আল্লাহ তা'য়ালার, যিনি একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি ছাড়া আর
কোনো মাবুদ নেই। অতি মেহেরবান, পরম দয়ালু, রাজাধিরাজ, আল-
কুদ্দুস-নিষ্কলুষ, আস-সালাম-শান্তি বিধায়ক, আল-মুমিন-নিরাপত্তা বিধায়ক,
আল-মুহাম্মিন-নিগাহবান, আল-আযীয-প্রবল, আল জাব্বার- পরাক্রমশালী,
আল-মুতাকাব্বির- অহংকারের অধিকারী, আল-খালিক- সৃষ্টিকর্তা, আল-
বারী-উন্মোচকারী, আল মুসাওবীর-রূপদানকারী, আল গাফ্ফার-মহাক্ষমাশীল,
আল কাহ্‌হার- মহাপরাক্রান্ত, আল ওয়াহ্‌হাব- মহাবদান্য, আর রায্যাক-
রিযিক দাতা, আল ফাত্তাহ- মহা বিজয়ী, মহা উদ্ঘাটক, আল আলীম-মহা
জ্ঞানী, আল কাব্বিয-সংকোচনকারী, আল বাসিত- সম্প্রসারণকারী, আল
খাফিয- অবনমনকারী, আর রাফী-উন্নয়নকারী, আল মুইয়য-সম্মানদাতা, আল
মুযিলল-হতমানকারী, আস সামী'-সর্বশ্রোতা, আল বাসীর-সর্বদ্রষ্টা, আল
হাকাম-মীমাংসাকারী, আল 'আদল-ন্যায়নিষ্ঠ, আল লাতীফ- সুক্ষ্ম
দক্ষতাসম্পন্ন, আল খাবীর-সর্বজ্ঞ, আল হালীম- অতিসহিষ্ণু, আল আজীম-
মহিমাময়, আল গাফুর- ক্ষমাশীল, আশ্ শাকুর-গুণগ্রাহী, আল 'আলী-
অত্যাচ্ছ, আল কাবীর- বিরাট, মহান, আল হাফীজ- মহারক্ষক, আল মুকীত-
আহার্যদাতা, আল হাসীব- মহাপরীক্ষক, আল জালীল- প্রতাপশালী, আল

কারিম-মহামান্য, দয়াদ্র, আর রাকীব- নিরীক্ষণকারী, আল মুজীব- দুআ কবুলকারী, আহ্বানের প্রতি উত্তরদানকারী, আল ওয়াসি'-সর্বব্যাপী, আল হাকীম-হিকমত ওয়ালা, বিচক্ষণ, আল ওয়াদূদ- প্রেমময়, আল মাজীদ- গৌরবময়, আল বা'ইছ- পুনরুত্থানকারী, আশ শাহীদ-প্রত্যক্ষকারী, আল হাক্ক-মহাসত্য, আল ওয়াকীল- তত্ত্বাবধায়ক, আল কাবিয়্যু-শক্তিশালী, আল মাতীন-দৃঢ়তাসম্পন্ন, আল ওয়ালী-অভিভাবক, বন্ধু, আল হামীদ- প্রশংসিত, আল মুহসী- সংখ্যা নিরূপণকারী, আল মুবদি'-আদি দ্রষ্টা, আল মুঈদ- পুনঃসৃষ্টিকারী, আল মুহই-জীবনদাতা, আল মুমীত- মরণদাতা, আল হায়্যু- চিরঞ্জীব, আল কায্যুম-স্বয়ং স্থিতিশীল, আল ওয়াজিদ-অবধায়ক, প্রাপক, আল মাজিদ-মহান, আল ওয়াহিদ-একক, আস সামাদ-অমুখাপেক্ষী, আল কাদির-সামর্থ্যশালী, আল মুকতাদির-ক্ষমতাশালী, আল মুকাদ্দিম-অগ্রবর্তীকারী, আল-মুআখখির-পশ্চাত্ত্বর্তীকারী, আল আওয়াল-সকল কিছু প্রথম, অনাদি, আল আখির-সকল কিছু শেষ, অনন্ত, আজ জাহির- প্রকাশ্য, আল বাতিন-অভ্যন্তর, গুপ্ত, আল ওয়ালী- কার্য নির্বাহক, আল মুতাআল-সমুন্নত, আল বারর- ন্যায়বান, আত তাওয়াব- মহা তওবা কবুলকারী, আল মুনতাকিম-প্রতিশোধ গ্রহণকারী, আল 'আফুবু- ক্ষমা প্রদর্শনকারী, আর রাউফ- কোমল, আল মালিকুল মূলক- রাজ্যের অধিকারী, যুল জালালী ওয়াল ইকরাম-মহিমাম্বিত ও মাহাত্ম্যপূর্ণ, আল মুকসিত- ন্যায় পরায়ণ, আল জামি'-একত্রকারী, আল গানী-অভাবমুক্ত, আল মুগনী- অভাব মোচনকারী, আল মানি'-প্রতিরোধকারী, আয যারর- অকল্যাণকর্তা, আল নাফি'-উপকারকারী, আল নূর- জ্যোতি, আল হাদী-পথ প্রদর্শক, আল বাদী'-অভিনব সৃষ্টিকারী, আল বাকী- চিরস্থায়ী, আল ওয়ারিছ- উত্তরাধিকারী, আর রশিদ- কল্যাণ পথে পরিচালনাকারী, আস্ সাবুর- ধৈর্যশীল । (তিরমিযী: খ.২, পৃ.১৮৯)

(১) ﷻ (আল্লাহ) এর বৈশিষ্ট্য:

আল্লাহ (ইহা তার সত্তাগত নাম, যিনি একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত ।

এর দশটি বৈশিষ্ট্য:

(১.) প্রতিদিন এক হাজার বার আল্লাহর এই নাম পাঠ করলে ঈমানের ওপর বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অর্জন হয় ।

(২) যে ব্যক্তি তার কোনো কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য নির্জনে বসে এই নাম পড়বে, তার কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যা আল্লাহ তা'য়ালা দূর করে দিবেন।

(৩) যে অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করতে ডাক্তাররা অপারগ, তার ওপর দয় করলে, তার যদি মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে না আসে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে সুস্থ হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর একশত (১০০) বার এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কাশফ (অন্তর্দৃষ্টি) দ্বারা সম্মানিত করবেন।

(৫) এই নামটি ৬৬ বার কাগজে লিখে ধুয়ে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করালে, আল্লাহ তা'য়ালা সুস্থতা দান করবেন। (চাই তার ওপর জ্বীনের আছর হোক না কেন)

(৬) জ্বীন আছর করেছে এমন ব্যক্তির জন্য কোনো একটি পাত্রে সেই পাত্রের পরিধি অনুযায়ী الله লিখে উক্ত ব্যক্তির ওপর পানি ছিটিয়ে দিলে শয়তান পালিয়ে যায়।

(৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ শব্দের যিকির মুহাব্বতের সাথে করবে এবং তাঁর মহত্ত্বের ওপর কোনো সন্দেহ করবে না, সে সত্যবাদীদের মধ্যে শামিল হবে।

(৮) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সাতবার هو الله الرحيم পড়বে, সে সর্বদা ঈমান অবস্থায় থাকবে এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে হেফাযত থাকবে।

(৯) যে ব্যক্তি এক হাজার বার (الله) পড়বে, তার অন্তরে ঈমান ও মারেফাতকে মযবূত করে দেয়া হবে।

(১০) যে ব্যক্তি জুমআর দিন আসরের নামাযের পর কিবলামুখী হয়ে বসে মাগরিব পর্যন্ত يا الله يا رحمن পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে যা কিছু চাইবে, আল্লাহ তাকে তা দান করবেন।

(২) الرَّحْمَنُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আর রাহমান: মেহেরবান) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) প্রতি নামাযের পর আল্লাহর এই নাম পড়লে অন্তরের গাফলত এবং নিষ্ঠুরতা দূর হয়। পার্থিব মুআমালায় সাহায্য করা হয়।

(২) যে ব্যক্তি এই নাম অধিক পরিমাণে পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সব ধরনের অপছন্দনীয় কাজ থেকে হেফাযত করবেন।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম লিখে পানিতে ধুয়ে পান করবে, সে বাতজ্বর থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

(৪) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর দু'শ আটানব্বই বার এই নাম পড়বে, তার ওপর সর্বদা আল্লাহ তা'য়ালা রহমত বর্ষিত হতে থাকবে।

(৫) যে ব্যক্তি একচল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একচল্লিশ (৪১) বার **يا رحمن الدنيا والآخرة وريحها** পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে দিবেন।

(৬) যে ব্যক্তি কোনো যালিম বাদশাহের কাছে যাওয়ার সময় **يا رحمن** পড়বে, আল্লাহ তাকে ঐ যালিমের জুলুম থেকে হেফাযত করবেন।

(৩) الرَّحِيمُ এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য:

(আর রাহীম: পরম দয়ালু) এর দশটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ (১০০) বার আল্লাহর এই নাম পড়ার অভ্যাস করবে, তার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা রহমত বর্ষিত হতে থাকবে এবং সমস্ত সৃষ্টি তার প্রতি সদয় হবে।

(২) যে ব্যক্তি এই নামের যিকির অধিক পরিমাণ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বদা তার দু'আ কবুল করবেন এবং পার্থিব বিপদাপদ হতে নিরাপদে রাখবেন।

(৩) যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারী বাদশাহের কাছে যাওয়ার সময় **يا رحمن** পড়তে থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ঐ যালিমের জুলুম থেকে নিরাপদে রাখবেন এবং কাজে সফলতা দান করবেন।

(৪) যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই নাম পাঁচশত (৫০০) বার পড়বে, সে ধন-সম্পদের অধিকারী হবে এবং সমস্ত সৃষ্টিজীব তার প্রতি সদয় হবে।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম ফজরের নামাযের পর একশত (১০০)বার পড়বে আল্লাহ তা'য়ালার সমস্ত সৃষ্টি তার প্রতি দয়াবান হবে।

(৬) যে ব্যক্তি এই নাম সকালে নামাযের পর পাঁচশত পঞ্চাশ (৫৫৫) বার পড়বে সে মাখলুকের মুখাপেক্ষী হবে না।

(৭) যে ব্যক্তি يارحمن الدنيا ورحيمها একচল্লিশ (৪১) দিন যাবত পড়বে তার চাহিদা পূরণ হবে।

(৮) যে ব্যক্তি এই নাম প্রতিদিন একশত (১০০) বার পড়বে তার অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালার নম্রতা ও সহমর্মিতা এনে দিবেন। অর্থাৎ ইহা অন্তরের কঠোরতাকে দূর করার সহজ আমল।

(৯) যে ব্যক্তি কোনো অপছন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে সে যেন অধিক পরিমাণে الرحمن الرحيم পড়ে। ইনশাআল্লাহ সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

(১০) যদি এই নাম লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি কোনো গাছের গোড়ায় ঢালা হয়, তাহলে সেই গাছের ফলে বরকত হয়।

(৪) الْمَلِكُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মালিক: বাদশাহ) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এই নাম দুপুরে একশত বিশ (১২০) বার পড়বে, তাকে আল্লাহ তা'য়ালার অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দান করবেন।

(২) যে ব্যক্তি আল্লাহর এই নাম পড়বে তার নফস তার অনুসারী হবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার তাকে সম্মান ও মহত্ত্ব দান করবেন।

(৩) যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় এই নাম তিন হাজার (৩০০০) বার পড়ে যে উদ্দেশ্যে দু'আ করবে, আল্লাহ তা'য়ালার তা পূরণ করবেন।

(৪) যদি ধনী ব্যক্তি এবং বাদশাহ (শাসক বা উচ্চপদস্থ লোক) এই নামের সাথে القدوس মিলিয়ে পড়ে, তাহলে তার সম্পদ ও দেশ নিরাপদ থাকবে।

(৫) যে ব্যক্তি এই নামকে প্রতিদিন ফজরের পর একশত বিশ (১২০) বার পড়ার অভ্যাস করে, সে আল্লাহর মেহেরবানীতে ধনী হয়ে যাবে।

(৬) যদি কোনো বাদশাহ বা শাসক নিয়মিত এই নামকে পড়ার অভ্যাস করে, তাহলে বড় বড় শত্রুরাও তার অনুগত হয়ে যাবে।

(৭) যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর عَلَّمَ لِي অধিক পরিমাণে পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধনী করে দিবেন।

(৫) الْقُدُّوسُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-কুদ্দুস: নিষ্কলুষ) নয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এক হাজার (১০০০) বার আল্লাহর এই নাম পড়বে, সে সমস্ত মাখলুক এমনকি প্রবৃত্তি থেকেও বেপরওয়া হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তি শত্রু থেকে বাঁচার জন্য পলায়ন কালে এই নাম অধিক পরিমাণে পড়বে, সে নিরাপদ থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি সফর কালে এই নাম সর্বদা পড়তে থাকবে, সে কখনও ক্লান্ত হবে না।

(৪) যে ব্যক্তি তিনশত উনিশ (৩১৯) বার এই নাম কোনো মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যে পড়ে শত্রুকে খাওয়াবে, সেই দুশমনের অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিবেন।

(৫) যে ব্যক্তি অপরাহ্নের পর একশত সত্তর (১৭০) বার এই নাম পড়বে তার অন্তরে আল্লাহ পাকের নূর প্রকাশ পাবে এবং আধ্যাত্মিক রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

(৬) যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন (৪০) পর্যন্ত নির্জনে বসে এক হাজার (১০০০) বার এই নাম পড়বে, তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে এবং দুনিয়াতে তার সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

(৭) যে ব্যক্তি এই নাম রাতের শেষাংশে এক হাজার (১০০০) বার পড়বে, তার শরীর থেকে অসুখ-বিসুখ দূর হয়ে যাবে।

(৮) যে ব্যক্তি জুমার নামাযের পর একশত পঞ্চাশ (১৫০) বার পড়ে তা একটি রুটির ওপর লিখে খাবে, সে সমস্ত বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা পাবে এবং নেক আমল করার সৌভাগ্য লাভ করবে।

(৯) যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের পর এই নাম দুটি রুটিতে লিখে খাবে, সে ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত হবে।

(৬) اَلْسَّلَامُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আস-সালাম: শান্তি দাতা, যিনি সব ধরনের দোষ-ত্রুটি ও দূর্বলতা থেকে পবিত্র) এর দশটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সর্বদা ফজরের নামাযের পর এক হাজার (১০০০)বার আল্লাহর এই নাম পড়বে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়বে।

(২) এই নাম একশত একত্রিশ (১৩১) বার অথবা একশত একষটি বার পড়ে অসুস্থ ব্যক্তির ওপর দম করলে আল্লাহ পাক সুস্থতা দান করবেন।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম অধিক পরিমাণে পড়বে, এবং লিখে সাথে রাখবে, সে দুশমন থেকে নির্ভয়ে থাকবে।

(৪) অসুস্থ অথবা ভীতু ব্যক্তির ওপর যদি এই নাম একশ এগারো (১১১) বার পড়ে দম করা হয়, তাহলে সে অসুস্থতা এবং ভয় থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৫) এই নাম ছয়শত নব্বই (৬৯০) বার মিষ্টি জাতীয় খাদ্য-দ্রব্যে দম করে শত্রুকে খাওয়ালে সদয় হয়ে যায়।

(৬) যদি কেউ একশত একুশ (১২১) বার এই নাম এবং **سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّهِ الرَّحِيمِ** পড়ে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির ওপর দম করে, তাহলে হয়ত সে ঐ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে, নতুবা তার রোগটা কিছুটা হলেও কমে যায় বা হালকা হয়।

(৭) যদি কেউ অসুস্থ ব্যক্তির মাথার কাছে বসে একশত ছত্রিশ (১৩৬) বার সে গুনতে পারে এতটুকু উচ্চ আওয়াযে পড়ে, তাহলে সে ঐ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(৮) প্রত্যেক নামাযের পর পনের (১৫) বার **اَللّٰهُمَّ يَا سَلَامٌ سَلِّمْ** পড়লে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৯) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই দু'আ পড়তে থাকবে, সে সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(১০) এই নাম একশত পনের (১১৫) বার পড়ে কোনো রুগীর ওপর দম করলে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুস্থতা দান করবেন।

(৭) الْمُؤْمِنُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মু'মিন: নিরাপত্তাদানকারী) এর নয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহর এই নামটি পড়বে তার ঈমান মযবূত হবে এবং মাখলুক তার অনুসারী ও বিশ্বাসী হবে।

(২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন তিন বার এই নাম পাঠ করবে, মাখলুকের ভয় তার অন্তরে থাকে না।

(৩) যে ব্যক্তি একশত ছত্রিশ (১৩৬) বার এই নাম পড়বে, সে অত্যাচারীর অত্যাচার এবং সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৪) যদি কোনো ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর নিয়মিত এই নাম ছত্রিশ (৩৬) বার পড়ে, তাহলে তার জান মাল হেফায়ত থাকবে।

(৫) ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে يا سلام يا مؤمن পড়বে, বিশেষ করে যদি কোনো মুসাফির অধিক পরিমাণে এই নাম পড়ে, আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা নসীব হবে।

(৬) যে ব্যক্তি কোনো ভয়-ভীতির সময় ছয়শত ত্রিশ (৬৩০) বার এই নাম পড়বে, সে সব ধরনের ভয় ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৭) যে ব্যক্তি এই নাম একশত পনের বার পড়ে নিজের ওপর দম করে, ইনশাআল্লাহ্ সে সব ধরনের ভীতি ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৮) ভয়ের সময় দুইশত ত্রিশ (২৩০) বার এই নাম পড়লে ইনশাআল্লাহ্ সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে।

(৯) যে ব্যক্তি এই নাম পড়ে অথবা লিখে সাথে রাখবে, তার যাহির ও বাতিন (বাহির-ভিতর) আল্লাহ তা'য়ালার হেফায়তে থাকবে।

(৮) الْمُهَيِّمُنُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুহাইমিনু-রক্ষাকারী) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে আল্লাহর এই নাম উনত্রিশ বার পড়বে, সে দুশ্চিন্তামুক্ত হবে।

(২) যে ব্যক্তি গোসল করে নির্জনে মনোযোগের সাথে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং একশত (১০০) বার এই নাম পড়বে, তার অন্তরে নূর পয়দা হবে, তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে এবং মনোবল দৃঢ় হবে।

(৩) যে ব্যক্তি সর্বদা এই নাম পড়তে থাকবে, সে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৯) **الْعَزِيزُ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-আযীয: পরাক্রমশালী) এর দশটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত ৪০ বার আল্লাহর এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সম্মানিত ও অমুখাপেক্ষী করে দিবেন।

(২) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ৪১ বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না এবং অপদস্থ হওয়ার পর সম্মানিত হবে।

(৩) যদি রাতের শেষাংশে লোকজন জমা হয়ে দুই হাজার বার এই নাম পড়ে, তাহলে আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

(৪) যে ব্যক্তি **يا عزيز من كل عزيز بحق يا عزيز** দু'আটি পড়বে, সে সকল সৃষ্টিজীবের মাঝে প্রিয়পাত্র হবে।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম চুরানব্বই (৯৪) দিন যাবত চুরানব্বই (৯৪) বার পড়বে, সে সম্মানিত ও সফলকাম হবে।

(৬) যে ব্যক্তি এই নাম চারশত এগারো (৪১১) দিন যাবত দু'শত (২০০) বার শুরুতে ও শেষে দুরুদ শরীফের সাথে পড়বে, তার সব কাজ আল্লাহ তা'য়ালা সহজ করে দিবেন।

(৭) যে ব্যক্তি সকালে কোনো শাসক বা বিচারকের কাছে যাওয়ার সময় এই দু'আ একচল্লিশ (৪১) বার পড়বে, শাসক তার প্রতি সদয় হবে।

(৮) যে ব্যক্তি ইশার পর দু'শত (২০০) বার **يا عزيز من كل عزيز** পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার ওপর নাযিল হবে।

(৯) যে ব্যক্তি লাগাতার সাতদিন পর্যন্ত এক হাজার (১০০০) বার এই নাম পড়বে, তার শত্রুকে আল্লাহ তা'য়ালা ধ্বংস করে দিবেন।

(১০) যে ব্যক্তি শত্রুবাহিনীর দিকে হাতে ইশারা করে সত্তর বার এই নাম পড়বে, আল্লাহর হুকুমে সেই শত্রুবাহিনী পরাজয় বরণ করবে।

(১০) اَلْجَبَّارُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-জাব্বার: ক্ষমতাশালী) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দু'শ ছাব্বিশ (২২৬) বার এই নাম পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ সে অত্যাচারীর অত্যাচার ও ক্রোধ থেকে হেফাযতে থাকবে।

(২) যদি কোনো বাদশাহ এই নাম নিয়মিত পড়তে থাকে, তাহলে অন্য কোনো বাদশাহ তার ওপর বিজয়ী হতে পারবে না।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম সর্বদা পড়তে থাকবে, সে মাখলুকের গীবত এবং গালমন্দ থেকে হেফাযতে থাকবে। এমনভাবে সে যালিমের জুলুম থেকে ও হেফাযতে থাকবে।

(৪) এই নামের সাথে ذوالجلال والإكرام মিলিয়ে পড়লেও আল্লাহ তা'য়ালা বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন।

(১১) اَلْمُتَكَبِّرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুতাকব্বির: মাহাত্ম্যশীল) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহর এই নামের ওয়ীফা পড়তে থাকবে, তাকে আল্লাহ তা'য়ালা সম্মান ও মহত্ব দান করবেন এবং কেউ তার বিরোধীতা করতে পারবে না।

(২) কোনো ব্যক্তিকে নির্লজ্জতা থেকে বিরত রাখতে এই নাম দশবার পড়ে তার ওপর দম করলে, সে ঐ ধরনের কাজ থেকে সংযমী হবে।

(৩) যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের পূর্বে দশবার এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে পরহেযগার ও সু-সন্তান দান করবে।

(৪) যে ব্যক্তি এই নামকে প্রত্যেক কাজের শুরুতে নিয়মিতভাবে পড়বে, সে তার কর্মে কোনো বাধার সম্মুখীন হবে না।

(৫) যে ব্যক্তি নামকে ২১ বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে স্বপ্নে ভয় পাবে না।

(৬) যে এই নামকে ছয়শত বাষটি দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ছয়শত বাষটি বার পড়বে, সে প্রভাবশালী ও মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হবে।

(৭) যে ব্যক্তি শত্রুকে ভয় করে এই নামটি নিয়মিত পড়তে থাকে, ইনশাআল্লাহ সে তার দুশমনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।

(১২) الْخَالِقُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-খালিক: স্রষ্টা) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি মধ্যরাতের পর এক ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশী সময় নিয়ে এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তর ও চেহারাকে নূরে পরিপূর্ণ করে দিবেন।

(২) হারানো সন্তান বা মাল ফিরে পেতে পাঁচ হাজার (৫০০০) বার এই নাম পড়লে ঐ হারানো ব্যক্তি বা বস্তু ফিরে পাবে।

(৩) যে ব্যক্তি সাত দিন পর্যন্ত লাগাতার এই নাম একশ (১০০) বার পড়বে, সে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৪) যে ব্যক্তি এই নাম এক হাজার (১০০০) বার পড়বে, তাকে আল্লাহ তা'য়ালা সু-সন্তান দান করবেন।

(৫) যে ব্যক্তি সর্বদা لَا خَالِقَ পড়তে থাকবে আল্লাহ তা'য়ালা একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, যে ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইবাদত করতে থাকে।

(৬) যে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে তিনশ (৩০০) বার এই নাম পড়বে, তার শত্রুরা পরাজয় বরণ করবে।

(১৩) الْبَارِئُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-বারিউ: উদ্ধাবনকারী) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যদি কোনো ডাক্তার আল্লাহর এই নাম পাবন্দীর সাথে সর্বদা পড়তে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার হাতে শেফা দান করবেন।

(২) যে ব্যক্তি শনিবারে এই নাম একশত (১০০) বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করবেন।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম দু'শ চুয়াল্লিশ (২৪৪) বার কোনো জায়েয উদ্দেশ্যে পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(৪) যে ব্যক্তি এই নাম সর্বদা পড়তে থাকবে, তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এক সৎ বন্ধুর ব্যবস্থা করে দিবেন।

(৫) যদি কোনো বন্ধ্যা মহিলা সাত দিন রোযা রেখে পানি দ্বারা ইফতার করার পর একুশবার **الْبَارِئُ الْمَصُورُ** পড়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে পুত্র সন্তান লাভ করবে।

(৬) যে ব্যক্তি সাত দিন পর্যন্ত নিয়মিত একশত (১০০) বার এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে রোগ থেকে মুক্তি এবং বিপদাপদ থেকে হেফাযত রাখবেন।

(৭) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সহজ হয়ে যাবে।

(১৪) **الْمُصَوِّرُ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুসাউভিরু: আকৃতি দাতা) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) কোনো ব্যক্তি সাতদিন পর্যন্ত রোযা রেখে সূর্যাস্তের পর ইফতার করার পূর্বে একুশ (২১) বার এই নাম পড়ে পানিতে দম করে ঐ পানি কোনো বন্ধ্যা নারীকে পান করালে, তার বন্ধ্যাত্ব দূর হয়ে যায়।

(২) যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় এসে সাত বার এই নাম পড়ে স্ত্রী সহবাস করে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নেক সন্তান দান করবেন।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার মুশকিল কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি অয়ু করার পর শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা স্থায়ী কপালের উপর এই নাম লিখবে, সে যার সাথেই সাক্ষাত করবে সে তার বন্ধু হয়ে যাবে।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম পড়ে পানির উপর দম করে পান করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

(৬) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সহজ হয়ে যাবে।

(১৫) اَلْغَفَّارُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-গাফ্ফার: ক্ষমাশীল) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

- (১) যে ব্যক্তি يا غفار সর্বদা পড়তে থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালার তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তার অন্তরের কু-প্রবৃত্তি দূর হয়ে যাবে।
- (২) যে ব্যক্তি ياغفار اغفرلي ذنوبي জুম'আর নামাযের পর একশত (১০০) বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালার তাকে মাফ করে দিবেন এবং আখেরাতে দয়া ও ক্ষমার আশাবাদী বানিয়ে দিবেন।
- (৩) যে ব্যক্তি প্রতিদিন আসরের নামাযের পর ياغفار اغفرلي পড়বে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার তাকে ক্ষমা প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।
- (৪) যে ব্যক্তি এই নাম জুম'আর পরে একশত (১০০) বার পড়বে, তার মধ্যে ক্ষমার নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাবে। দারিদ্রতা দূর হবে এবং ধারণাতীত রিযিকের ব্যবস্থা হবে।
- (৫) ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ওপর এই নাম পড়ে ফুক দিলে তার ক্রোধ দূর হয়ে যাবে।

(১৬) اَلْقَهَّارُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-ক্বাহ্হার: মহা পরাক্রান্ত) এর নয়টি বৈশিষ্ট্য:

- (১) যে ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়, সে যেন ঘরে অথবা মসজিদে খালি মাথায় হাত উঠিয়ে একশত বার يا قهار পড়ে, ইনশাআল্লাহ তার প্রয়োজন আল্লাহ তা'য়ালার মিটিয়ে দিবেন।
- (২) যে ব্যক্তি ইশরাকের নামাযের পর সিজদা করে সাত বার يا قهار পড়বে, আল্লাহ পাক তাকে ধনী বানিয়ে দিবেন।
- (৩) যে ব্যক্তি শত্রুর অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ও দুশমনকে ধ্বংস করার জন্য সূর্যোদয়ের সময় এবং রাতের শেষভাগে এই দু'আ পড়বে একশ বার পড়বে (يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ) তারপর বলবে,

(خُذْ حَقِّي مِمَّنْ ظَنَّنِي وَعَدَا عَلَيَّ)

(৪) যে ব্যক্তি এই নামের যিকির অধিক পরিমাণে করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তর থেকে দুনিয়া ও গায়রুল্লাহর মুহাব্বত দূর করে দিবেন। শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি যাদুর আসরের কারণে স্ত্রী মিলনে ব্যর্থ হয়, তাহলে চীনা মাটির পাত্রে এই নাম লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে পান করবে। ইনশাআল্লাহ যাদুর আসর কেটে যাবে।

(৬) যে ব্যক্তি দুনিয়ার মুহাব্বতে লিপ্ত, সে অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ দুনিয়ার মুহাব্বত তার অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাকের মুহাব্বত পয়দা হবে এবং সে ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করবে।

(৭) কোনো অত্যাচারী অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এই নাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিনশত ছয় (৩০৬) বার পড়লে আল্লাহ পাক তাকে নিরাপদে রাখবেন। সে শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে। শাসক তার প্রতি মেহেরবান হবেন এবং তার অন্তর থেকে সব ধরণের ভয়-ভীতি দূর করে দেয়া হবে।

(৮) যে ব্যক্তি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এই নাম একশত (১০০) বার পড়বে, আল্লাহ পাক তার সমস্যা সমাধান করে দিবেন।

(৯) শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য ফরয ও সুন্নতের মাঝে এই নাম একশত (১০০) বার পড়া অত্যন্ত উপকারী আমল।

(১৭) **اَلْوَهَّابُ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-ওয়াহ্‌হাবু: মহাদাতা) এর বারোটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এই নাম প্রতিদিন সাত বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন, যাদের দু'আ সর্বদা কবূল করে থাকেন।

(২) যে ব্যক্তি এই নাম এশার পর এক হাজার চারশত চৌদ্দ বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার রিয়িকের অভাব দূর করে দিবেন।

(৩) অভাব-অনটনে পতিত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়লে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধারণাতীতভাবে দারিদ্রতা থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন।

(৪) যে চাশতের নামাযের পর সিজদার আয়াত পড়ে সিজদার মধ্যে সাতবার এই নাম পড়বে, আল্লাহ পাক তাকে মাখলুক থেকে বেপারওয়া করে দিবেন।

(৫) যে ব্যক্তি রিযিকের প্রশস্ততা চায়, সে যেন চাশতের সময় চার রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরানোর পর সিজদায় গিয়ে এই নাম একশত চার (১০৪) বার, যদি সময় কম থাকে তাহলে পঞ্চাশ বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে সম্পদশালী হবে।

(৬) যদি কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে মধ্যরাতে ঘরে অথবা মসজিদের আঙ্গিনায় তিনবার সিজদা করত হাত উঠিয়ে একশ (১০০) বার এই নাম পড়বে। (এই আমলটি তিন অথবা সাত রাত করবে) ইনশাআল্লাহ প্রয়োজন পূর্ণ হবে।

(৭) যে ব্যক্তি ইশার পর এক হাজার একশত পঞ্চাশ (১১৫০) বার এই নাম পড়বে সে ঋণী থাকবে না।

(৮) যে ব্যক্তি অভাব-অনটনের সময় অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে অথবা লিখে সাথে রাখবে, অথবা চাশতের নামাযের শেষ সিজদায় নয়শত চল্লিশ (৯৪০) বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধারণাতীতভাবে অভাব-অনটন থেকে মুক্তি দান করবেন।

(৯) ঈমান হিফায়তের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত দু'আটি অত্যন্ত পরীক্ষিত আমল। তাই প্রতি নামাযের পর দু'আটি সাত বার পড়বে:

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

(১০) যে ব্যক্তি নামকে الكريم ذا الطول এর সাথে মিলিয়ে পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার সব ধরনের কাজে বরকত দান করবেন।

(১১) সব জিনিসের মধ্যে বরকত পাওয়ার জন্য এই নামকে الكافي এর সাথে মিলিয়ে পড়া অত্যন্ত ফলপ্রসূ আমল।

(১২) যদি কেউ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে কোনো খোলা ময়দানে গিয়ে দু'আর মত দুই হাত উঠিয়ে একশত (১০০) বার يا وهاب পড়বে। ইনশাআল্লাহ তার সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

(১৮) الرِّزْقُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(তার-রায্যাক: রিযিকদাতা) এর নয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি নিয়মিত দুপুর বেলা এই নাম বিশ (২০) বার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এমন জ্ঞান দান করবেন, যদ্বারা সে সুস্থ এবং কঠিন বিষয়গুলো সহজে বুঝে নিতে পারবে।

(২) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পূর্বে আপন ঘরের চার কোণে দশবার করে এই নাম পড়ে দম করবে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা তার রিযিকের দরজা খুলে দিবেন। অসুস্থতা ও দারিদ্রতা তার ঘরে প্রবেশ করবে না। (চার কোণে নামটি পড়ার সময় ডান কোণা থেকে কিবলার দিকে মুখ করে পড়বে।)

(৩) যে ব্যক্তি ফজরের ফরয ও সুন্নাতের মাঝে একচল্লিশ (৪১) দিন যাবত পাঁচশত পঞ্চাশ (৫৫০) বার এই নাম পড়বে সে সম্পদশালী হবে। (এই নামটি পড়ার ক্ষেত্রে ফজরের নামায জামাতের সাথে পড়া এবং শুরুতে ও শেষে এগারো বার দরুদ শরীফ পড়া জরুরী।)

(৪) যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর খালি মাথায় يا رزاق ترزق من تشاء یا এগারো (১১) বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার ওপর রিযিকের দরজা খুলে দিবেন।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ (৫৪৫) বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার রিযিকে বরকত দান করবেন এবং তার কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।

(৬) যে ব্যক্তি এই নাম প্রতিদিন নির্জনে বসে এক হাজার (১০০০) বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য লাভ করবে।

(৭) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর নিয়মিত এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা গায়েব থেকে তার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

(৮) যে ব্যক্তি এই নামকে সতের (১৭) বার ঐ ব্যক্তির সামনে পড়বে, যার কাছ থেকে কাজটা আদায় করা যাবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা তার কাজটা আদায় করে দিবেন।

(৯) যে ব্যক্তি জেল খানা থেকে মুক্তির জন্য এই দু'আ একশত (১০০) বার পড়বে, আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করবেন। আর যদি রোগ মুক্তির জন্য পড়ে, তাহলে রোগ থেকে মুক্তি পাবে। ইনশাআল্লাহ।

(১৯) اَلْفَحُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-ফাতাহ: মহাবিজয়ী) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর বুকে হাত রেখে একাত্তর (৭১) বার এই নাম পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে ঈমানের নূর দ্বারা ভরে দিবেন। এবং সত্যের পথে চলতে গিয়ে যে সব বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সেসব বাধা থেকে দূরে রাখবেন। তার সব কাজ সহজ করে দিবেন, রিযিকের মধ্যে বরকত দান করবেন।

(২) যার স্মরণ শক্তি কম, এমন ব্যক্তি চীনা মাটির পাত্রে এই নাম লিখে জিহ্বা দ্বারা চেটে খাবে। আল্লাহ তা'য়ালা তার স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে দিবেন।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম সাত বার পড়বে, তার অন্তরের ময়লা দূর হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার অন্তরের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। সর্ব কাজে বরকত দান করা হবে।

(২০) اَلْعَلِيمُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-আলীমু: সর্বজ্ঞানী) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে يا عَلِيمُ পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জ্ঞান ও মারেফাতের দরজা খুলে দিবেন। যা কিছু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তা-ই দেয়া হবে। স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হবে।

(২) যে ব্যক্তি মনযোগের সাথে এই নাম পড়বে, সে আল্লাহ তা'য়ালার মারেফাত অর্জন করবে। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দেড়শত (১৫০) বার এই নাম পড়বে, সে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর উপর পূর্ণ বিশ্বাসী হবে।

(৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর একশত (১০০) বার يا عَلِيمُ الغیب পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি কোনো কাজের ব্যাপারে ইস্তেখারা করতে চায়, সে বৃহস্পতিবার রাতে দুই রাকাত নামাযের পর একশত (১০০) বার এই নাম পড়ে শুয়ে পড়বে। ইনশাআল্লাহ সে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

(৫) যে ব্যক্তি কোনো অজানা বিষয়ে জানতে চায়, সে প্রথমে দু'রাকাত নামায পড়ে দরুদ শরীফ পড়বে এবং **سبحانك لا علم لنا إلا ما** এবং **يا عليم علمني يا خبير** সত্তর বার পড়বে এবং **يا عليم علمني** একশত বার পড়ে নিজ উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে শুয়ে যাবে। যদি ঘুম না আসে তাহলে উঠে কোনো মজলিসে চলে যাবে। সেখানে লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলে ইশারার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য জেনে নিবে।

(৬) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর একশত বার **يا عالم الغيب والشهادة** পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিবেন।

(৭) যদি কোনো ব্যক্তি **يا علام الغيوب** এর যিকিরটি এত অধিক পরিমাণে করে যে, সে তার নিজের ওপর স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার রূহকে উর্দ্ধজগতে ভ্রমণ করাবেন।

(২১) الْقَابِضُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-কাবিয়ু: সংকোচনকারী) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এই নাম ত্রিশ (৩০) বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে।

(২) যে ব্যক্তি এই নাম চল্লিশ (৪০) দিন যাবত প্রতিদিন চার বা চল্লিশ (৪০) লোকমায় লিখে খেয়ে নিবে, সে ক্ষুধা এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। এমনভাবে সব ধরনের জখম ও ব্যাথা থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম মধ্য রাতে পড়বে, তার শত্রু পরাস্ত হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কিছু উলামায়ে কিরাম বলেন, **الْبَاسِطُ** কে **الْقَابِضُ** এর সাথে **المقدم** কে **المؤخر** এর সাথে, **الحی** কে **الميت** এর সাথে, **المذل** কে **المز** এর সাথে, **النافع** কে **الضار** এর সাথে এবং **المعطي** কে **المانع** এর সাথে

যিকির করা উত্তম। আর এর মধ্যে প্রত্যেক নাম (উদাহরণস্বরূপ المذل) কে অন্য ইসিমের (উদাহরণ স্বরূপ: المعز) সাথে মিলানো ব্যতীত পড়া অনুচিত। (আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।)

(২২) الْبَاسُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-বাসিতু: সম্প্রসারণকারী) এর দশটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এই নাম চাশতের নামাযের পর দশবার পড়বে, সে তার সর্ব কাজে সফলতা পাবে। ইনশাআল্লাহ কখনও সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

(২) যে ব্যক্তি আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে এই নাম দশবার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধনী বানিয়ে দিবেন।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম চল্লিশ (৪০) বার পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর একশত চল্লিশ (১৪০) বার এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সকল কঠিন কাজ থেকে মুক্তি দান করবেন।

(৫) সব ধরনের জটিলতা থেকে মুক্তির জন্য বাহাত্তর (৭২) দিন যাবত প্রতিদিন বারো হাজার (১২,০০০) বার এই নাম পড়বে।

(৬) যে ব্যক্তি তিন রাতে সোয়া তিন লাখ (১,২৫,০০০) বার بِاسُ এই নামকে শুরুতে ও শেষে একশত বার দরুদ শরীফসহ পড়বে। ইনশাআল্লাহ গায়েব থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা হবে। (তিন রাত পর প্রতিদিন একশত বার পড়বে)।

(৭) যে ব্যক্তি শেষরাতে চোখ বন্ধ করে এগারো বার এই নাম পড়ে হাতে ফুক দিয়ে চেহায়ায় মুছে নিবে, এরপর চোখ খুলে হাত দেখে পুণরায় বাহাত্তর (৭২) বার এই নাম পড়ে নিম্ন লিখিত দু'আটি পড়বে:

اللهم زد ثم زد ولا تنقص وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.

ইনশাআল্লাহ ঐ দিন সে ক্ষুধার্ত থাকবে না।

(৮) যে ব্যক্তি প্রতিদিন বাহাত্তর (৭২) বার এই নাম পড়বে, তাকে আল্লাহ তা'য়ালা সব ধরনের বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ রাখবেন।

(৯) যে ব্যক্তি এই নাম রাতের শেষাংশে হাত উঠিয়ে দশবার পড়বে, সে সর্বদা হাসি-খুশী থাকবে। কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট থাকবে না এবং ধারণাতীতভাবে সর্ব কাজে বরকত লাভ করবে।

(১০) যে ব্যক্তি এই নাম প্রতিদিন পড়বে এবং লিখে নিজের সাথে রাখবে, ইনশাআল্লাহ সে দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকবে। গায়েব থেকে রিযিকের ব্যবস্থা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন।

(২৩) الْخَافِضُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-খাফিযু: অবনমকারী) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এই নাম পাঁচশত (৫০০) বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার চাহিদাগুলো পূরণ করে দিবেন। শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। সর্বদা আল্লাহ তা'য়ালার হেফাযতে থাকবে।

(২) যে ব্যক্তি এই নাম এক হাজার (১০০০) বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে সর্বপ্রকার শত্রু থেকে হেফাযতে থাকবে।

(৩) যদি কেউ তিনটি রোযা রেখে চতুর্থ দিন কয়েকজন মিলে এক মজলিসে বসে সাত হাজার (৭০০০) বার অথবা (অপারগতায় সত্তর বার) এই নাম পড়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহ শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়ে, তৎকালীন শাসনকর্তা তার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে।

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি পেরেশানীর সম্মুখীন হয়ে প্রত্যেক নামাযের পর এই নাম এক হাজার চারশত একাশি (১,৪৮১) বার পড়তে থাকে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে উক্ত পেরেশানী থেকে মুক্তি দান করবেন।

(৬) যে ব্যক্তি যালেমের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য সত্তর (৭০) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে উক্ত জুলুম থেকে রেহাই পাবে।

(২৪) الرَّافِعُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আর্ রাফিউ: উন্নয়নকারী) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার মাগরিব অথবা ইশার নামাযের পর চারশত চল্লিশ (৪৪০) বার এই নাম পড়বে, মানুষের মাঝে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাব পড়বে।

(২) যে ব্যক্তি মধ্য রাতে অথবা দুপুরে এই নাম একশত বার (১০০) পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য করে নিবেন এবং ধনী ও মাখলুক থেকে বেপরওয়া বানিয়ে দিবেন।

(৩) যে ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্যে এই নাম (২০) বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি প্রতি মাসের ১৪ তারিখের মধ্য রাতে এই নাম একশত (১০০) বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাখলুক থেকে বেপরওয়া বানিয়ে দিবেন।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম তিনশত একান্ন (৩৫১) বার পড়বে, সে সকলের প্রিয় পাত্র হবে।

(৬) যে ব্যক্তি এই নাম সত্তর (৭০) বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে যালিম ও দৃষ্টকারীদের থেকে নিরাপদে থাকবে।

(২৫) الْمُعَزُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুঈযু: সম্মানদাতা) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সোমবার বা শুক্রবার মাগরিবের নামাযের পর চল্লিশ (৪০) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মানুষের মাঝে সম্মানিত ও প্রভাবশালী বানিয়ে দিবেন।

(২) যে ব্যক্তি সোমবার বা শুক্রবার ইশার নামাযের পর এই নাম একশ চল্লিশ (১৪০) বার পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মানুষের মাঝে মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী বানিয়ে দিবেন। সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না এবং সর্বদা আল্লাহ তা'য়ালায় হেফাযতে থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি একশত চল্লিশ (১৪০) দিন যাবত সোম বার বা শুক্র বার রাতে নিয়মিত একচল্লিশ (৪১) বার এই নাম পড়বে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবে।

(২৬) الْمَذِلُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুযিল্লু: অপমানকারী) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) পঁচাত্তর (৭৫) বার এই নাম পড়ে সিজদায় গিয়ে যে কোনো দু'আ করলে, আল্লাহ তা'য়ালা তার দু'আ কবুল করবেন।

(২) যে ব্যক্তি পঁচাত্তর (৭৫) বার অথবা একুশ (২১) বার يا مذل المذل পড়ে সিজদায় রত হয়ে এই দু'আ করবে যে, “হে আল্লাহ! আমাকে অমুক বিদ্বৈষ পোষণকারী ও যালিমে অত্যাচার থেকে নিরাপদ রাখুন।” আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে হেফাযতে রাখবেন।

(৩) যে ব্যক্তি প্রতি দিন কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাতশত সত্তর (৭৭০) বার يا مذل كل جبار بقهر عزيز سلطانك পড়বে, তার শত্রু পরাজয় বরণ করবে।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি তার ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণকারীর থেকে টালবাহানার স্বীকার হয়, এই এই নাম অধিক পরিমাণে পড়লে ইনশাআল্লাহ সে তার ঋণ পরিশোধ করে দিবে।

(২৭) السَّمِيعُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আস্ সামিউ: সর্বশ্রোতা) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার চাশতের সময় নামাযের পর পাঁচশত (৫০০) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার সব দু'আ কবুল হবে।

(২) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি করে দিবেন।

(৩) যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার চাশতের নামাযের পর পাঁচশত (৫০০) বার অথবা প্রতিদিন একশত (১০০) বার এই নাম পড়ে যেই দু'আ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই কবুল করবেন। (এই যিকিরের মাঝে কারো সাথে কোনো কথা বলবে না)

(৪) যে ব্যক্তি বৃহস্পতি বার ফজরের সুন্নাত ও ফরয নামাযের মাঝে এই নাম একশত (১০০) বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার ওপর আল্লাহ পাকের বিশেষ করুণার দৃষ্টি হবে।

(২৮) اَلْبَصِيرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-বাসীরু: সর্বদ্রষ্টা) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের পরে অথবা আগে একশত বার يا بصير পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি এবং তার অন্তরে ঈমানের আলো দান করবেন। তাকে ভাল কথা ও কাজের তৌফিক দান করবেন।

(২) যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝে একশত (১০০) বার এই নাম পড়বে, তার ওপর আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ করুণার দৃষ্টি থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে চোখের যাবতীয় রোগ থেকে হেফাযত করবেন। তার জন্য এ দু'আও করা যেতে পারে: اللهم يا سميع يا بصير متعني وبصيري وأجعلها الوارث مني.

(৪) যে ব্যক্তি প্রতিদিন আসরের নামাযের পর এই নাম সাত বার পড়বে, সে আকস্মিক মৃত্যু হতে রক্ষা পাবে।

(৫) যে ব্যক্তি জুমআর খুতবার পূর্বে এই দু'আ একশত (১০০) বার পড়বে, তার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের দৃষ্টি থাকবে।

(২৯) اَلْحَكْمُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-হাকামু: মীমাংসাকারী) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি শেষ রাতে অযু করে নিরানব্বই (৯৯) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা তার দিলকে হিকমত ও ঈমানের আলো দ্বারা আলোকিত করবেন।

(২) যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে এই নাম অধিক পরিমাণে পড়তে পড়তে আত্মহারা ও মাতোয়ারা হয়ে যাবে, আল্লাহ পাক তাকে কাশফ ও ইলহামের দ্বারা সম্মানিত করবেন।

(৩) যে ব্যক্তি বৃহস্পতি বার রাতে এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরের ময়লা দূর করে দিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আশি (৮০) বার এই নাম পড়বে, সে কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষী হবে না।

(৩০) اَلْعَدْلُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-আদলু: ন্যায়নিষ্ঠ) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি জুমআর রাতে বিশ টুকরা রুটির ওপর এই নাম লিখে খাবে, আল্লাহ তা'য়ালা মাখলুককে তার অনুগত করে দিবেন।

(২) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে গায়েব থেকে রিযিক দান করবেন এবং নেক আমলের তৌফিক দান করবেন।

(৩) যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর এক হাজার (১০০০) বার এই নাম পড়বে, সে আসমানী বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৩১) اَللّٰطِيفُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-লাতীফু: সুক্ষ্ম) এর আটটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি একশত তেত্রিশ (১৩৩) বার يا لَطِيفُ পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার রিযিকের মধ্যে বরকত এবং তার সব কাজ কর্ম সহজেই আদায় হবে।

(২) যে ব্যক্তি অভাব-অনটন, রোগ-শোক এবং অসহায় অবস্থায় অথবা অন্য কোনো মুসীবতের মধ্যে আক্রান্ত হবে, সে উত্তমরূপে অযু করে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং নিজ মকসূদ ও উদ্দেশ্য দিলে রেখে একশত (১০০) বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ মাকসূদ পূর্ণ হবে।

(৩) যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত তিহাতুর (১৭৩) বার এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করে দিবেন এবং তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

(৪) মেয়ে বিয়ে দেয়াসহ, সৌভাগ্য অর্জন ও সব ধরনের অসুস্থতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রতিদিন অযু করে দুই রাকাত নামায পড়ে একশত (১০০) বার এই নাম পড়বে।

(৫) দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জনের জন্য কোনো উন্মুক্ত স্থানে দু'আ কবুল হওয়ার শর্তগুলোর প্রতিলক্ষ্য রেখে ষোল হাজার ছয়শত একচল্লিশ (১৬,৬৪১) বার এই নাম পড়বে।

(৬) যে ব্যক্তি একশত ষাট (১৬০) বার এই নাম পড়বে এবং এর সাথে এই আয়াত পড়বে: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

ইনশাআল্লাহ সকল প্রকার ভয় ও আশংকা থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৭) অসুস্থতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য এই নামের সাথে অন্য কোনো আয়াতে শেফা পড়ে নিবে। ইনশাআল্লাহ সে সুস্থতা লাভ করবে।

(৮) সব ধরনের দুশ্চিন্তা ও বালা-মুসীবত থেকে মুক্তি লাভের জন্য এই নামের যিকির অত্যন্ত উপকারী আমল।

(৩২) الْخَيْرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-খাবীর: সর্বজ্ঞ) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সাত দিন পর্যন্ত অধিক পরিমাণে আল্লাহর এই নাম পড়তে থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালার তাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করবেন, সে তার উদ্দিষ্ট কাজে পথ প্রদর্শক হিসাবে পায়।

(২) যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়নার মধ্যে পতিত হবে, সে অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ উক্ত রিপু থেকে রেহাই পাবে।

(৩) যদি কেউ এস্তেখারা করতে চায়, তাহলে একচল্লিশ (৪১) দিন যাবত তিনশত (৩০০) বার يا خير أخبرني পড়তে থাকবে। তারপর যদি আবার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তিনশত (৩০০) বার এই নাম পড়ে গুয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ ঐ কাজের ভাল-মন্দের প্রতি ইঙ্গিত পাবে।

(৪) যদি কোনো ময়লুম ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়ে, ইনশাআল্লাহ সে উক্ত জুলুম থেকে মুক্তি পাবে।

(৩৩) الْحَلِيمُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-হালীমু: সহিষ্ণু) এর নয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহর এই নাম পড়বে, সে সব কাজে সফলতা পাবে এবং সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।

(২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন যোহরের নামাযের পর নয়বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ সে মানুষের মাঝে শ্রদ্ধার পাত্র হবে।

(৩) যে ব্যক্তি শত্রু, অভিযোগকারী অথবা বিচারকের সামনে পানি দ্বারা হাত ভিজিয়ে এগারবার **يا حليم** পড়ে মুখের ওপর ভিজা হাত বুলিয়ে দেয়। ইনশাআল্লাহ দুশমন কিছুই করতে পারবে না। বিচারক তার প্রতি সদয় হবে।

(৪) এই নাম কাগজে লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে উক্ত পানি বাগানে ছিটিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ ফসলাদি সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। তাতে পরিপূর্ণতা আসবে ও বরকত হবে।

(৫) যে ব্যক্তি বাদশাহের মুখোমুখি হয়ে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে তার ক্রোধের শিকার হবে না।

(৬) যে ব্যক্তি এই নাম পড়বে, সে নম্র-ভদ্র ও ধৈর্যশীল হবে।

(৭) যে ব্যক্তি কোনো গাছের চারা লাগানোর সময় আটশ (২৮) বার এই নাম পড়বে, সে গাছ সব ধরনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৮) যদি কোনো প্রধান ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়ে, তাহলে তার নেতৃত্ব নিরাপত্তার সাথে পূর্ণবহাল থাকবে।

(৯) যে ব্যক্তি এই নাম কাগজে লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে নিজ পেশায় ব্যবহৃত জিনিসগুলোর ওপর মর্দন করবে, তার কাজ-কর্মে বরকত হবে।

(৩৪) **الْعَظِيمُ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-আযীমু: মহিমাময়) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি কোনো শাসকের পক্ষ থেকে যুলুমের শিকার হয়, সে বারো বার আল্লাহর এই নাম পড়ে নিজের ওপর দম করবে। ইনশাআল্লাহ জুলুম থেকে মুক্তি পাবে।

(২) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সব ধরনের রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(৩) যে ব্যক্তি সাত (৭) বার এই নাম পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করবে, ইনশাআল্লাহ তার পেটে কোনো ধরনের ব্যাথা হবে না।

(৩৫) اَلْغُفُورُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-গাফুর: পরম ক্ষমাকারী) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহর এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরের ময়লা দূর করে দিবেন।

(২) জ্বর ও মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত অথবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি এই নাম কাগজে লিখে সেই নকশার ছাপ রঙটিতে নিয়ে খায়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুস্থতা ও দুশ্চিন্তা মুক্ত জীবন দান করবেন।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে চরিত্রহীনতা এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন এবং তার মাল ও সন্তানাদির মধ্যে বরকত দান করবেন।

(৩৬) اَلشَّكُورُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আশ-শাকুর: গুণগ্রাহী) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এই নাম একচল্লিশ (৪১) বার পানিতে দম করে সেই পানি চোখের উপর ছিটিয়ে দিবে, তার দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

(২) যে ব্যক্তি অভাব-অনটন অথবা এজমা রোগে আক্রান্ত, সে এই নাম কোনো কাগজে লিখে তা শরীরের ওপর ফিরিয়ে নিবে এবং পানিতে দম করে তা পান করে নিবে। ইনশাআল্লাহ উপকার পাবে।

(৩) যে ব্যক্তি আর্থিক অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত, সে এই নাম দৈনিক একচল্লিশ (৪১) বার পড়বে। ইনশাআল্লাহ সে উক্ত অভাব-অনটন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

(৪) যে ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি কম সে প্রতিদিন একচল্লিশ (৪১) বার এই নাম পড়বে এবং মুখের লাল চোখে লাগাবে। এমনভাবে পানিতে দম করে তা পান করে নিবে। ইনশাআল্লাহ দৃষ্টি শক্তি বাড়তে থাকবে।

(৫) যদি কোনো অভাবী ব্যক্তি এই নাম একুশ (২১) বার পড়ে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধনী বানিয়ে দিবেন। এমনভাবে যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তাকে আল্লাহ তা'য়ালা মাখলুকের মাঝে সম্মানিত করবেন।

(৬) যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচ হাজার (৫০০০) বার এই নাম পড়বে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালার তাকে উচ্চমর্যাদা দান করবেন।

(৩৭) اَلْعَلِيُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-আলীয্যু: উচ্চ ও উন্নত) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি আল্লাহর এই নাম সর্বদা পড়তে থাকবে এবং লিখে নিজের কাছে রাখবে, ইনশাআল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সচ্ছলতা ও মাকসুদ হাসিল হবে।

(২) যে ব্যক্তি তিনবার এই নাম পড়ে ব্যাথার স্থানে ফুঁক দিবে, ইনশাআল্লাহ তার ব্যাথা ভাল হয়ে যাবে।

(৩) যদি কোনো অভাবী ব্যক্তি একশত দশ (১১০) বার এই নাম পড়ে। তাকে আল্লাহ পাক ধনী বানিয়ে দিবেন এবং দুনিয়াতে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

(৪) যদি এই নাম লিখে শিশুর গলায় বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে সে দ্রুত বড় হতে থাকবে। মুসাফির যদি এই নাম লিখে নিজের কাছে রাখে। আল্লাহ পাক তাকে অতি শীঘ্রই তার আপনজনের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। অভাবী ব্যক্তিকে ধনী বানিয়ে দিবেন।

(৫) এই নাম মাশায়েখ, বুয়ুর্গ, ছাত্র এবং মারেফাতের পথিকদের জন্য এক আধ্যাত্মিক খাজানা। যদি এই নামের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার অপর নাম العليم কে মিলিয়ে পড়া যায়, তাহলে তা বড় যিকিরের মধ্যে গণ্য করা হয়।

(৩৮) اَلْكَبِيرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-কাবীরু: সুমহান) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) আল্লাহর এই নাম অধিক পরিমাণে পড়তে থাকলে আল্লাহ তা'য়ালার তার ওপর ইলম ও মারেফাতের দরজা খুলে দেখেন।

(২) এই নাম কোনো খাদ্য-দ্রব্যের ওপর পড়ে স্বামী-স্ত্রীকে খাওয়ালে পরস্পরে মুহাব্বত সৃষ্টি হয়।

(৩) যে ব্যক্তি নিজ পদ থেকে অপসারিত হয়েছে, সে সাতটি রোযা রাখবে এবং প্রতিদিন এক হাজার বার **يا كبير** পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে নিজ পদে পূর্ণবহাল হবে এবং মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হাসিল করবে।

(৪) যে ব্যক্তি এই নাম অধিক পরিমাণে পড়বে, মানুষের মাঝে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

(৫) যদি কোনো বাদশাহ বা শাসক এই নামের যিকির করতে থাকে, তাহলে তার (প্রভাব ও মহত্ব মানুষের মাঝে) অধিনস্তদের মাঝে তার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং তার সকল পরিকল্পনাগুলো সহজেই বাস্তবায়ন হবে।

(৬) যে ব্যক্তি নয় বার এই নাম পড়ে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির ওপর দম করবে। ইনশাআল্লাহ সে উক্ত অসুস্থতা থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(৭) যে ব্যক্তি এই নাম একশত (১০০) বার পড়বে, সে সকলের প্রিয় পাত্র হবে।

(৩৯) **أَلْحَفِظُ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-হাফীযু: মহারক্ষক) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে **يا حفيظ** এর যিকির করতে থাকবে এবং লিখে নিজের কাছে রাখবে, ইনশাআল্লাহ সে সকল প্রকার ভয় ও আশংকা এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।

(২) কঠিন বিপদের সফরে নিজ জান-মালের নিরাপত্তার জন্য এই নামের যিকির অত্যন্ত ফলদায়ক। এমনকি যদি এই নাম পড়ে হিংস্র প্রাণীদের মাঝেও গুয়ে পড়ে, ইনশাআল্লাহ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এই ইসিমের যিকিরের পর তিনবার এই দু'আ পড়বে: **يا حفيظ إحتفظني**।

(৩) যে ব্যক্তি প্রতি দিন ষোল (১৬) বার এই নাম পড়বে, তার অন্তরে মাখলুকের ভয় থাকবে না।

(৪) যে ব্যক্তি মাগরিবের পর একচল্লিশ (৪১) বার ক্বিবলার দিকে মুখ করে **يا حافظ يا رقيب يا مجيب يا الله يا الله** পড়বে, ইনশাআল্লাহ গায়েব থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা হবে।

(৫) যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত প্রতিদিন সত্তর (৭০) বার করে এই নাম পড়ে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির ওপর দম করবে, ইনশাআল্লাহ সে উক্ত রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(৬) যে ব্যক্তি এই নাম পড়বে এবং লিখে নিজের কাছে রাখবে, ইনশাআল্লাহ সে দুবে মারা যাওয়া, জ্বিন-ভূত এবং বদ নযর থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৪০) الْمُقِيتُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুকীতু: আহার্যদাতা) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি খালি পেয়ালার মধ্যে সাত বার আল্লাহর এই নাম পড়ে দম করবে এবং তা থেকে নিজে পানি পান করবে অথবা অন্য কাউকে পান করাবে, ইনশাআল্লাহ তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। এই আমলটি বিপদজনক সফরে নিরাপত্তার জন্য অনেক উপকারী।

(২) যে ব্যক্তির চোখ উঠেছে অথবা চোখে ব্যাথা, সে দশবার এই নাম পড়ে দম করবে। ইনশাআল্লাহ উক্ত রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(৩) অভাবী অথবা খারাপ কাজে অভ্যস্ত ব্যক্তি বা খুব কান্নাকাটি করে এমন শিশুদের জন্য খালি পাত্রে এই নাম সাত বার পড়ে দম করবে এবং তাতে পানি ঢেলে সেই পানি পান করাবে। ইনশাআল্লাহ উপকৃত হবে।

(৪) যদি কোনো রোয়াদার ব্যক্তির প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, তাহলে সে কোনো ফুলের ওপর এই নাম একশ (১০০) বার পড়ে তার ছাণ নিবে, ইনশাআল্লাহ সে প্রতি দিন রোযা রাখতে সক্ষম হবে।

(৫) যে ব্যক্তি এই নামকে اللَّهُ এর সাথে মিলিয়ে সাত বার পড়বে, সে মানসিক রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

(৬) যে ব্যক্তি সাত বার এই নাম পড়ে পানিতে দম করে পান করবে। ইনশাআল্লাহ গায়েব থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করা হবে। সে কখনও ক্ষুধার্ত থাকবে না।

(৪১) الْحَسِيبُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-হাসীবু: হিসাব গ্রহণকারী) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি কোনো চোর, হিংসাকারী শত্রু অথবা বদ নযর থেকে ভয় করবে, সে বৃহস্পতিবার থেকে আরম্ভ করে আট দিন পর্যন্ত সকাল (সূর্যোদয়ের পূর্বে) সন্ধ্যায় (সূর্যাস্তের পূর্বে) সত্তর (৭০) বার **حَسِي** الله **الحَسِيبُ** পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সত্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন।

(২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন **حَسِي** الله **الحَسِيبُ** পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে সর্ব প্রকার বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম সত্তর (৭০) বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে দুশমনের অনিষ্ট থেকে হেফায়ত থাকবে।

(৪) যে ব্যক্তি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে, সে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা একশত পঁয়তাল্লিশ (১৪৫) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা তার সকল সমস্যা সমাধান করে দিবেন।

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি হিসাবের ব্যাপারে নিজের ভাই-বা অন্য কারো থেকে দূর্নীতির আশংকা করে, তাহলে সাত দিন পর্যন্ত সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এই নাম পড়বে।

(৬) **الحَسِيبُ** এর মধ্যে ইসমে আযমের দিকে ইশারা রয়েছে।

(৪২) الْجَلِيلُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল- জালীলু: মহিমাম্বিত) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি তেহাত্তর (৭৩) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার সম্মান ও মহত্ত্ব হাসিল হবে।

(২) যে ব্যক্তি দশ (১০) বার এই নাম পড়ে আসবাবপত্রের ওপর দম করবে, তার মালামাল চুরি হওয়া থেকে হেফায়ত থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে এবং মিশক-জাফরান দ্বারা লিখে পান করবে অথবা নিজের কাছে রাখবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক তাকে সম্মান, মর্যাদা ও মহত্ত্ব দান করবেন।

(৪৩) الْكَرِيمُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-কারীমু: অনুগ্রহকারী) এর দুইটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি দৈনিক শয়নকালে يا كريم পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাবে আল্লাহ পাক তাকে উলামা এবং নেককারদের মধ্যে সম্মান দান করবেন। এবং গায়েব থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

(২) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ذو الطول الوهاب الكريم পড়বে, তার ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করা হবে।

(৪৪) الرَّقِيبُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আর রাক্বীবু: পর্যবেক্ষণকারী) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) আল্লাহর এই নাম অধিক পরিমাণে পড়লে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি হেফাযত থাকে।

(২) যদি কারো কোনো বস্তু হারিয়ে যায়, অধিক পরিমাণে এই নাম পড়ার দ্বারা হারানো বস্তু ফিরে পাবে।

(৩) যদি গর্ভপাত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, গর্ভবতী মহিলার ওপর এই নাম সাত বার পড়ে দম করবে। ইনশাআল্লাহ উপকার পাবে।

(৪) যদি কোনো সফরে যাওয়ার সময় নিজের পরিবারবর্গের মাঝে কারো ওপর বিপদের আশংকা থাকে, তাহলে তার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে সাত বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ সে নিরাপদে থাকবে।

(৫) যে ব্যক্তি নিজ পরিবারবর্গ এবং ধন-সম্পদের ওপর সাত বার অথবা সত্তর (৭০) বার এই নাম পড়ে দম করবে। ইনশাআল্লাহ সে সর্ব ধরণের বিপদাপদ থেকে হেফাযত থাকবে।

(৬) শরীরে কোথাও ফোঁড়া হলে এই নাম তিনবার পড়ে দম করবে। ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।

(৭) যে ব্যক্তি নিজের কোনো মাল (গাড়ী ইত্যাদি) কোথাও রেখে আসার সময় এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ ঐ মাল চুরি হওয়া থেকে হেফাযত থাকবে।

(৪৫) الْمُجِيبُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুজীবু: কবুলকারী) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে بِمِجِيبٍ পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের দরবারে তার দু'আ কবুল হতে থাকবে।

(২) যে ব্যক্তি এই নাম লিখে নিজের কাছে রাখবে, সে আল্লাহ তা'য়ালার হেফাযতে থাকবে।

(৩) যদি কারো মাথা ব্যাথা হয়, তাহলে তিন বার এই নাম পড়ে দম করবে। ইনশাআল্লাহ মাথা ব্যাথা দূর হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি সূর্য উঠার সময় এই নাম পড়ার অভ্যাস করবে, ইনশাআল্লাহ তার দু'আ কবুল হবে।

(৪৬) الْوَاسِعُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-ওয়াসিউ: সর্বব্যাপী) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহর এই নাম পড়বে, সে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য লাভ করবে। এমনভাবে আল্লাহ তা'য়ালার তাকে সম্মান, উঁচু হিম্মত, ধৈর্য, অন্তরের প্রশস্ততা এবং ব্যবসায় উন্নতি দান করবেন।

(২) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার ওপর রহমতের ফেরেশতা নাযিল হবে।

(৩) যে ব্যক্তি সর্বদা এই নাম পড়তে থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালার গায়েব থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন এবং তার কোনো অভাব-অনটন থাকবে না।

(৪) যাকে বিচ্ছু দংশন করেছে, এই নাম সত্তর (৭০) বার পড়ে দম করলে সেই বিচ্ছুর বিষ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

(৫) যে ব্যক্তি রিযিকের প্রশস্ততার জন্য এই নাম অধিক পরিমাণ পড়তে থাকবে। আল্লাহ তার ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করবেন।

(৪৭) الْحَكِيمُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-হাকীমু: প্রজ্ঞাময়) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক তার ইলম ও হেকমতের দরজা খুলে দিবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে সে নিয়মিত এই নাম পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

(৩) যে ব্যক্তি যোহরের পর নব্বই (৯০) বার এই নাম পড়বে, মাখলুকের মাঝে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

(৪) যে ব্যক্তি বাহাত্তর (৭২) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে না। তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

(৫) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার ইলম ও হিকমতের দরজা খুলে দিবেন। সে অনেক সুস্বপ্ন রহস্যের ভেদ জানতে পারবে।

(৪৮) الْوَدُودُ এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য:

(আল-ওয়াদুদু: প্রেমময়) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এক হাজার (১০০০) বার يا ودود পড়ে খাবারের উপর ফুঁক দিবে এবং স্ত্রীর সাথে বসে খাবার খাবে ইনশাআল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ দূর হয়ে যাবে এবং পরস্পরের মধ্যে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে।

(২) যে ব্যক্তির সন্তান খারাপ কাজে লিপ্ত, সে জুমআর নামাযের পর এক হাজার এক (১০০১) বার এই নাম পড়ে কোনো মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যের ওপর দম করবে, তারপর দু' রাকাত নামায পড়ে ঐ মিষ্টি তাকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ সে ভাল হয়ে যাবে।

(৩) এই নামের যিকির জ্বীনকে বশীভূত করার জন্য অত্যন্ত উপকারী আমল।

(৪) যে ব্যক্তি কোনো দুশ্চিন্তা বা পেরেশানীর সম্মুখীন হবে, সে দু'রাকাত নামায পড়ে নিম্নের দু'আটি পড়বে। ইনশাআল্লাহ সে দুশ্চিন্তামুক্ত হবে।

দু'আটি নিম্নরূপ:

اللهم يا ودود (তিনবার) يا ذاالعرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد اسئلك
بنور وجهك الذي ملاً اركان عن شك وبقدرك التي قدرت بها علي جميع خلقك
وبرحمتك التي وسع كل شئ لا إله إلا أنت (يا غياث المستغيثين أغثني)

(শেষ আয়াতটি তিনবার পড়বে।)

(৪৯) اَلْمَجِيْدُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মাজীদু: গৌরবময়) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি কোনো কষ্টদায়ক রোগ, কুষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হবে, সে চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখবে এবং ইফতারের সময় বেশী বেশী এই দু'আ পড়তে থাকবে এবং পানিতে দম করে সেই পানি পান করবে। ইনশাআল্লাহ সেই রোগ দূর হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তি বিশ (২০) দিন পর্যন্ত রোযা রেখে ইফতারের সময় সাতান্ন (৫৭) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে সমস্ত কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(৩) যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে নিরানব্বই বার এই নাম পড়ে নিজের ওপর দম করবে, সমবয়সীদের মাঝে তার সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

(৪) এই নাম অধিক পরিমাণে পড়লে প্রচণ্ড গরমে পিপাসার কষ্ট থেকে দূরে থাকবে।

(৫) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়তে থাকবে, সে আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবে।

(৫০) اَلْبَاعِثُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-বা'ইসু: পুনরুত্থানকারী) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি শোয়ার সময় বুকের ওপর হাত রেখে একশত (১০০) বার বাعث يا পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার অন্তর ইলম ও হিকমত দ্বারা উজ্জীবিত হবে।

(২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত (১০০) বার এই নাম পড়ার অভ্যাস করবে, ইনশাআল্লাহ তার নেক কাজ করার তৌফিক হবে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম সাত বার পড়ে নিজের উপর দম করে কোনো শাসকের সামনে উপস্থিত হবে। সেই শাসক তার উপর মেহেরবান হবে।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় সর্বদা বিদ্যমান থাকবে।

(৫১) الشَّهِيدُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আশ-শাহীদু: প্রত্যক্ষকারী) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তির স্ত্রী অথবা সন্তানাদি অবাধ্য সে সকাল বেলা তার কপালের ওপর হাত রেখে একুশ বার (মতান্তরে একত্রিশবার) يَا شَهِيد পড়ে ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ তারা তার অনুগত হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তি পাবন্দীর সাথে এই নাম পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ তার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে।

(৩) তাসাউফের পথিকদের ও শাহাদাতের মৃত্যু কামনাকারীদের জন্য এই নামের যিকির অত্যন্ত উপকারী আমল।

(৫২) الْحَقُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-হাক্কু: সত্য) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক হাজার (১০০০) বার আল্লাহর এই নাম পড়বে, সে সচ্চরিত্রের অধিকারী হবে।

(২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ বার اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِين لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালার তার অভাব-অনটন দূর করে দিবেন। ইনশাআল্লাহ সকল কাজ সহজেই আদায় হবে।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহর এই নাম পড়বে, সে সকলের প্রিয় পাত্র হবে।

(৪) যে ব্যক্তি চতুর্ভূজ ধরণের কাগজের চারকোণে এই নাম লিখে মধ্যরাতে কাগজটিকে হাতের তালুতে রেখে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াবে এবং এই নাম একশত নিরানব্বই (১৯৯) বার পড়বে ইনশাআল্লাহ হারানো বস্তু ফিরে পাবে।

(৫) যদি কোনো করেদী মধ্য রাতে খালি মাথায় একশত আট (১০৮) বার এই নাম পড়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে অচিরেই মুক্তি পাবে।

(৫৩) الْوَكِيلُ এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য:

(আল-ওয়াকীলু: কর্মবিধায়ক) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি কোনো আসমানী বিপদের ভয়ের সময় অধিক পরিমাণে وَكِيْلُ পড়তে থাকে, ইনশাআল্লাহ সে সর্ব প্রকার বিপদ থেকে হেফাযতে থাকবে।

(২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন আসরের নামাযের সময় সাত বার এই নাম পড়বে, সে আল্লাহ তা'য়ালার হেফাযতে থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি দশ বার এই নাম পড়ে নিজের ওপর দম করবে এবং লিখে তার পানি পান করবে, ইনশাআল্লাহ সে সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালার তার সকল কাজের দায়িত্ব নিয়ে নিবেন। সে প্রবৃত্তির পূজারী হবে না।

(৫) যে ব্যক্তি একশত ছিয়ানব্বই (১৯৬) বার এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালার তাকে অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে নিরাপদ রাখবেন। তার অন্তরে মাখলুকের কোনো ভয় থাকবে না।

(৬) এই নামকে ইসমে আযমের মধ্যে গণ্য করা হয়।

(৭) যে কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই নামটির যিকির অত্যন্ত উপকারী আমল।

(৫৪) الْقَوِيُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-কাবিয়্যু: শক্তিশালী) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি কম হিম্মত, দুর্বল ও মযলুম, সে অত্যাচারী শক্তির শত্রুকে প্রতিহত করার নিয়তে অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ শত্রু পরাজিত হবে।

(২) অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এক হাজার (১০০০) বার এই নামের যিকির অত্যন্ত উপকারী আমল।

(৩) রিযিকের অভাব দূর হওয়ার জন্য এক হাজার বার এই নামের যিকিরের সাথে নিম্নে লিখিত আয়াতটিও মিলিয়ে পড়বে:

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ.

ইনশাআল্লাহ তার প্রতি দয়া বা মেহেরবানী করা হবে এবং তার জন্য মঙ্গলের দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে শক্তিশালী হয়ে যাবে। শীঘ্রই উচ্চ পদে উন্নতি লাভ করবে।

(৫) যার শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী তাকে প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না, তাহলে অল্প কিছু আটার খামির নিয়ে তা দিয়ে বুটের দানার মত এক হাজার একশত (১১০০) টি দানা বানাবে এবং প্রতিটি দানায় **يَا قَوِيُّ** পড়ে ফুঁক দিয়ে মুরগীর সামনে রেখে দিবে। ইনশাআল্লাহ শত্রু পরাজিত হবে।

(৬) জুমার দিন এই নাম অধিক পরিমাণে পড়লে স্মৃতিশক্তি বাড়বে।

(৫৫) **الْمَتِينُ** এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য:

(আল মাতিনু: দৃঢ়তা সম্পন্ন) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে সকল মহিলাদের দুধ কম হয় বা একেবারেই হয় না। তাকে এই নাম **الْمَتِينُ** কাগজে লিখে ধুয়ে পান করালে ইনশাআল্লাহ প্রচুর পরিমাণে দুধ হবে।

(২) যে সকল বাচ্চাকে দুধ ছাড়ানো হয়েছে এবং সে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে না। তাকে এই নাম মোবারক দশবার লিখে পান করালে ইনশাআল্লাহ ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে।

(৩) কেউ যদি তার অংশীদারীর অংশ পেতে চায়, সে যেন রবিবার দিন প্রথম প্রহরে ঐ নিয়ত করে তিনশত ষাটবার (৩৬০) এই নাম মোবারক পড়ে। তাহলে ইনশাআল্লাহ সে তার অংশ পেয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি এই নামটি বেশি বেশি আওরাতে থাকবে, সে বিপদ থেকে মুক্তি পাবে এবং সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। (ইনশাআল্লাহ)

(৫) কোনো দুশ্চরিত্রের ছেলে বা মেয়েকে দশ বার আল **(الْقَوِيُّ الْمَتِينُ)** পড়ে দম করে। তাদের পরিশুদ্ধী হবে এবং তারা খারাপ কর্ম থেকে ফিরে যাবে।

(৫৬) اَلْوَلِيُّ এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য:

(আওয়ালিইয়ু: আভিভাবক/সাহায্যকারী/বন্ধু) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে এই নাম বেশি বেশি পড়বে সে আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাবে এবং তাকে (বেলায়াতে আযম) অধ্যাত্মজগতের উচ্চপদে বসানো হবে। আর তার অন্তর চক্ষু খুলে দেওয়া হবে।

(২) কেউ যদি কোনো সমস্যায় পড়ে তাহলে সে যেন জুমআর রাতে এক হাজার বার আল্লাহর এই নাম মোবারক পড়ে। ইনশাআল্লাহ! তার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং সে ওলিদের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

(৩) যদি কেউ স্ত্রীর নিকট যাওয়ার সময় আল্লাহর এই নাম পড়ে। তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মঙ্গল হবে।

(৪) যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর স্বভাব চরিত্র নিয়ে মনক্ষুন্ন বা নারাজ থাকে। তাহলে সে যখন স্ত্রীর নিকট এই নাম টি পড়বে। ইনশাআল্লাহ! সে ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়ে যাবে।

(৫৭) اَلْحَمِيدُ এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য:

(আল-হামীদু: প্রশংসিত) এর আটটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি পঁয়তাল্লিশ (৪৫) দিন পর্যন্ত নির্জনে বসে নিয়মিতভাবে তিরানব্বই (৯৩) বার يا حميد পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার খারাপ অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার সকল কাজগুলো সহজেই আদায় হবে।

(৩) যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তায় অভ্যস্ত, সে কোনো পাত্রে الحميد লিখে নব্বই (৯০) বার এই নাম পড়ে তাতে দম করবে। ইনশাআল্লাহ তার সকল খারাপ অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তির মুখে জড়তা রয়েছে (অর্থাৎ কথা স্পষ্ট নয়) তাকে এই নামটি ধুয়ে পান করলে ইনশাআল্লাহ সে স্পষ্ট কথা বলতে পারবে।

(৫) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর নিরানব্বই (৯৯) বার এই নাম পড়ে হাতে দম করে চেহারায় মুছে নিবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ইয্যত-সম্মান ও গায়েবী সাহায্য দান করবেন এবং তার চেহারা নূরান্বিত হবে।

(৬) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর এই নাম একশত (১০০) তার পড়ার অভ্যাস করবে, ইনশাআল্লাহ সে সত্যবাদীদের মধ্যে গণ্য হবে।

(৭) যে ব্যক্তি এই নাম ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর ছেষটি (৬৬) বার পড়ার অভ্যাস করবে। ইনশাআল্লাহ তার সৎ কাজ-কর্মের তৌফিক হবে।

(৮) সূরা ফাতিহার পর এই নাম লিখে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করালে ইনশাআল্লাহ সে সুস্থতা লাভ করবে।

(৫৮) الْمُخْصِي এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুহসী: হিসাব গ্রহণকারী) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে এক হাজার (১০০০) বার আল্লাহর এই নাম পড়বে, সে কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকবে।

(২) যে ব্যক্তি রুটির দশটি টুকরোর ওপর এই নাম বিশ (২০) বার পড়ে ফুঁক দিবে এবং তা খাবে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের সকল মাখলুক তার অনুগত হয়ে যাবে।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালার ধ্যান-খেয়াল পয়দা হবে।

আর যদি কেউ এই নামকে আল্লাহ তা'য়ালার নাম الْحَيُّ এর সাথে মিলিয়ে পড়ে, তাহলে তাকে অনেক জ্ঞান দান করা হবে।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

(৫) যে ব্যক্তি দশবার এই নাম পড়বে, সে আল্লাহ তা'য়ালার হেফাযতে থাকবে।

(৫৯) الْمُبْدِئ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুবদিউ: আদিপ্রষ্টা) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, সে সর্বদা সত্য কথা বলবে।

(২) যদি কোনো গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে সাহরীর সময় নব্বই (৯০) বার এই নাম পড়ে শাহাদাত আব্দুল দ্বারা পেট অথবা পিঠে ফিরিয়ে নিবে। ইনশাআল্লাহ গর্ভপাত হবে না।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার সৎ কাজের তৌফিক হবে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

(৪) যে ব্যক্তির কোনো মাল হারিয়ে গিয়েছে, সে এই নাম পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ হারানো বস্তু ফিরে পাবে।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম লিখে নিজের কাছে রাখবে, সে সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৬০) الْمُعِيدُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুঈদু: পুণঃসৃষ্টিকারী) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) নিখোঁজ ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যখন ঘরের সব লোক ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ঘরের চার কোণের প্রত্যেক কোণে সত্তরবার করে ۞ پڑবে। ইনশাআল্লাহ সাত দিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি ফিরে আসবে অথবা তার খোঁজ পাওয়া যাবে।

(২) যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, সে প্রত্যহ এক হাজার (১০০০) বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ সে সঠিক দিক নির্দেশনা পাবে এবং অন্তরের ব্যাকুলতা দূর হবে।

(৩) যদি কেউ কোনো কথা অথবা কোনো জিনিস ভুলে যায়, তাহলে এই নামের যিকির দ্বারা উক্ত কথা বা জিনিস স্মরণে চলে আসবে।

(৬১) الْمُخِي এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুখী: জীবনদাতা) এর আটটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এক হাজার (১০০০) বার এই নাম পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ মানসিক প্রফুল্লতা ও শারিরিক সুস্থতা লাভ করবে।

(২) অসুস্থ ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়লে অথবা অন্য কোনো অসুস্থ ব্যক্তির ওপর পড়ে দম করলে, ইনশাআল্লাহ সে সুস্থতা লাভ করবে।

(৩) যে ব্যক্তি উনানব্বই (৮৯) বার **الحی** পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিবে, ইনশাআল্লাহ সে সব ধরনের বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত থাকবে।

(৪) যে ব্যক্তির কোনো ব্যাথা অথবা অঙ্গহানী হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, সে **الحی** সাত বার পড়বে। ইনশাআল্লাহ রোগ থেকে নিরাময় লাভ করবে।

(৫) যে ব্যক্তি বাতের ব্যাথা থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য সাত দিন যাবত এই নাম সাত বার পড়ে দম করবে, ইনশাআল্লাহ সে উক্ত রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(৬) যে ব্যক্তির কারো থেকে বিচ্ছেদ অথবা বন্দী হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, সে অধিক পরিমাণে এই নামের যিকির করতে থাকবে।

(৭) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার অন্তর ঈমানী আলোয় আলোকিত হবে।

(৮) যদি কোনো ব্যক্তি কারো রোষণলে পড়ে, তাহলে রুটির টুকরোর ওপর আটান্ন (৫৮) বার এই নাম পড়ে দম করবে। ইনশাআল্লাহ নিরাপদ থাকবে।

(৬২) **الْمُئْتِ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুমীতু: মৃত্যুদাতা) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এত অধিক পরিমাণে এই নামের যিকির করতে থাকে, সে তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না।

(২) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ নফস তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

(৩) যে ব্যক্তি অপচয় করায় অভ্যস্ত অথবা তার ইবাদতে একাগ্রতা আসে না, সে ঘুমানোর সময় বুকের ওপর হাত রেখে **المیت** পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ নফস তার অনুগত হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি সাতবার এই নাম পড়ে দম করবে, ইনশাআল্লাহ তার ওপর যাদুর আসর পড়বে না।

(৬৩) الْحَيُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-হাইয়্যু: চিরঞ্জীব) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি প্রতিদিন তিনবার الْحَيُّ পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে কখনো অসুস্থ হবে না।

(২) যে ব্যক্তি এই নাম চীনা মাটির পাত্রে মেশক ও গোলাপের পানি দ্বারা লিখে মিঠা পানির দ্বারা ধৌত করে পান করে অথবা অন্য কোনো রুগীকে পান করায়, ইনশাআল্লাহ সে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান হয়ে যাবে।

(৩) যে ব্যক্তি এক হাজার বার এই নাম পড়ে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির উপর দম করবে, সে দীর্ঘজীবী হবে এবং তার রুহানী শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কঠিন কাজের সম্মুখীন হয়, তাহলে একটা সময় নির্ধারণ করে পাঁচশত বার এই নাম পড়বে। (এই নাম পড়ার আগে ও পরে দরুদ শরীফ পড়ে নিবে)

(৫) যদি কেউ এই নাম একশত বিশ বার (১২০) কাগজে লিখে দরজার ওপর টাঙ্গিয়ে রাখে, তাহলে সকলে মহামারী থেকে রক্ষা পাবে।

(৬৪) الْقَيُّومُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য;

(আল-কায়্যুমু: (সুপ্রতিষ্ঠ, সংরক্ষণকারী) এর নয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি প্রতিদিন নির্জনে বসে সতের (১৭) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তার অন্তর ঈমানের নূরে নূরান্বিত হবে।

(২) যে ব্যক্তি অনিদ্রায় ভুগছে, সে এই দুই আয়াত পড়বে:

وَنَحْسِبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ (সূরা কাহাফ:১৮) فَضْرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ

ইনশাআল্লাহ তার ঘুম আসবে। আর যে অতি নিদ্রায় অভ্যস্ত, তার মাথার ওপর الْقَيُّومُ পড়ে দম করবে। ইনশাআল্লাহ তার অতিনিদ্রা দূর হয়ে যাবে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি চায় তার অন্তর সর্বদা যিন্দা থাকুক, সে যেন প্রতিদিন চল্লিশ (৪০) বার এই দুআ পড়ে: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

(৪) জেনে রাখা উচিত, এই দুইটি নাম অত্যন্ত মহৎ নাম। তাসাউফের পথিকদের জন্য এই নামের যিকির খুবই উপকারী আমল।

হযর সা. তার মেয়ে হযরত ফাতিমা রা. কে সকাল-সন্ধ্যা নিম্ন লিখিত দু'আটি পড়তে বলেছেন:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله وتكلمي إلي نفسي طرفة عين.

(৫) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

(৬) যে ব্যক্তি নির্জনে বসে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করবে।

(৭) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত يا حي يا قيوم পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ তার অলসতা দূর হবে।

(৮) যে ব্যক্তি প্রতিদিন একচল্লিশ (৪১) বার এই দু'আ পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার মূর্দা দিল যিন্দা হয়ে যাবে। দু'আটি এই:

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أني أسئلك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا.

(৬৫) এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-ওয়াজিদু: প্রাপক) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি খাওয়ার সময় يا واجد পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ উক্ত খাদ্য তার দিলের শক্তি বৃদ্ধি ও নূরান্বিত হওয়ার কারণ হবে।

(২) যে ব্যক্তি নির্জনে এই নাম পড়বে, সে ধন-সম্পদের অধিকারী হবে।

(৩) যে ব্যক্তি খাওয়ার সময় প্রত্যেক লোকমায় এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সেই খানা তার পেটে নূর হবে।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার অন্তর ধনী হয়ে যাবে।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ সে যালিমের জুলুম থেকে নিরাপাদ থাকবে।

(৬) যে ব্যক্তি এই নাম পড়তে পড়তে আত্মভোলা হয়ে যাবে, তার অন্তরে এমন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটবে, যার ধারণাও সে করেনি।

(৬৬) الْمَاجِدُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মাজিদু: মহান) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি নির্জনে এই নাম এত অধিক পরিমাণে পড়বে যে, তা পড়তে পড়তে অচেতন হয়ে পড়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তার কুলবের মধ্যে আল্লাহ পাকের নূর প্রকাশ পেতে থাকবে।

(২) যদি কেউ এই নাম পড়ে পানিতে দম করে অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে সুস্থ হয়ে যাবে।

(৩) যে ব্যক্তি দশবার এই নাম কোনো শরবতে দম করে পান করবে, ইনশাআল্লাহ সে কখনও অসুস্থ হবে না।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, সে মাখলুকের দৃষ্টিতে সম্মানিত ও শ্রদ্ধার পাত্র হবে।

(৬৭) الْوَاحِدُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-ওয়াহিদু: একক) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক হাজার বার الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার অন্তর থেকে মাখলুকের মুহাব্বত ও ভয় দূর হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তির কোনো সন্তানাদি না হয়, সে এই নাম লিখে নিজের কাছে রাখবে। ইনশাআল্লাহ সে নেক সন্তান লাভ করবে।

(৩) যে ব্যক্তি একাকী থাকতে ভয় পায়, সে অযুর সাথে এক হাজার বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ তার ভয় দূর হয়ে যাবে।

(৬৮) الْاِخْدُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-আহাদু: এক, অদ্বিতীয়) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক হাজার বার الْاِخْدُ الْاِخْدُ পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার অন্তর থেকে মাখলুকের মুহাব্বত ও ভয় দূর হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তির কোনো সন্তানাদি না হয়, সে এই নাম লিখে নিজের কাছে রাখবে। ইনশাআল্লাহ সে নেক সন্তান লাভ করবে।

(৩) হুযূর সা. এক ব্যক্তিকে এই দু'আ করতে শুনলেন,

اللهم اني أسئلك بأنني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي يلد ولم تكن له كفوا أحد.

অতঃপর হযূর সা. ইরশাদ করলেন, এই ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ঐ ইসমে আযমের দ্বারা দু'আ করেছে, যদ্বারা দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়।

(৪) যে ব্যক্তি এই নাম পড়বে, সে অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম নয় বার পড়ে কোনো শাসকের সামনে উপস্থিত হবে, উক্ত শাসক তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবে।

(৬) যদি কোনো ব্যক্তিকে সাপে কাটে, তাহলে এই নাম একশত এক (১০১) বার পাঠ করে দংশিত স্থানে দম করবে। ইনশাআল্লাহ সাপের বিষ নষ্ট হয়ে যাবে।

(৭) যে ব্যক্তি নির্জনে এক হাজার বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে ফিরিশতাদের মত আখলাকের অধিকারী হয়ে যাবে।

(৬৯) **الصَّمَدُ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আস-সামাদু: অনপেক্ষ) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সাহরীর সময় সিজদায় মাথা রেখে একশ পনের বার অথবা একশ পঁচিশ বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সততা হাসিল হবে এবং সে কোনো ধরনের যুলুমের শিকার হবে না।

(২) যে ব্যক্তি অযুর সাথে এই নামের যিকির করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ সে মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে।

(৩) যে ব্যক্তি একশ চৌত্রিশ (১৩৪) বার এই নাম পড়বে, সে মাখলুকের মুখাপেক্ষী হবে না। এবং সে কখনও ক্ষুধার্ত থাকবে না।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়তে থাকবে, তার সকল কাজগুলো সহজেই হয়ে যাবে।

(৫) যে ব্যক্তি এক হাজার বার এই নাম পড়বে, সে শত্রুর উপর বিজয়ী হবে।

(৭০) الْقَادِرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-ক্বাদিরু: শক্তিশালী) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যদি কোনো ব্যক্তি অযুতে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় এই নামটি পড়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে কোনো যালিমের হাতে গ্রেফতার হবে না। এবং কোনো শত্রু তার ওপর বিজয় লাভ করতে পারবে না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে একচল্লিশ (৪১) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার সেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম লিখে নিজের কাছে রাখবে, সে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৪) যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়ে একশত বার الْقَادِرُ পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালার তার শত্রুদের লাঞ্চিত বা অপদস্থ করবেন (যদি সে সত্যের ওপর থাকে।)

(৭১) الْمُقْتَدِرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুক্বতাদিরু: ক্ষমতামণ্ডলী) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠার পর অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে অথবা কমপক্ষে বিশ বার করে পড়বে। ইনশাআল্লাহ তার সকল কাজ সহজে এবং সুচারুরূপে সমাধা হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তি এই নাম পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ তার দুশমন পরাস্ত হবে।

(৩) যে ব্যক্তি প্রতিদিন বিশ বার এই নাম যিকির করবে। ইনশাআল্লাহ তার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের দৃষ্টি থাকবে।

(৪) যে ব্যক্তি এই নাম মনযোগ সহকারে পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার অলসতা দূর হয়ে যাবে।

(৫) যে ব্যক্তি সত্যিকারার্থে মযলুম, সে মাসের শেষরাতে কোনো অন্ধকার রুমে খালি যমীনে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাতের শেষ সিজদায় الْقَوِي الْقَوِي الْمُقْتَدِرُ পড়ে যালিমের বিরুদ্ধে দু'আ করবে। ইনশাআল্লাহ তার দু'আ কবুল হবে।

(৭২) اَلْمُقَدِّمُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুকাদ্দিমু: অগ্রবর্তী) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি যুদ্ধের সময় অধিক পরিমাণে এই নাম পড়তে থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শক্তি দান করবেন এবং শত্রু থেকে তাকে নিরাপদ রাখবেন।

(২) যে ব্যক্তি সর্বদা يا مقدم পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ সে আল্লাহ পাকের অনুগত হয়ে যাবে।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে এবং তার নফস আল্লাহ তা'য়ালার অনুগত হয়ে যাবে।

(৪) যদি কোনো মিষ্টি দ্রব্যের ওপর নয় বার এই নাম পড়ে দম করে কাউকে খাওয়ানো হয়, ইনশাআল্লাহ সে তার প্রতি আসক্ত হবে।

(৭৩) اَلْمَوْخَرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুআখখিরু: পশ্চাদবর্তীকারী) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার তওবা নসীব হবে।

(২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক বার এই নাম নিয়মিত পড়বে ইনশাআল্লাহ সে আল্লাহ পাকের এমন সান্নিধ্য লাভ করবে এবং সে তা ব্যতীত লাভ করবে না।

(৩) উলামায়ে কিরাম বলেন, যে ব্যক্তি المقدم এবং المؤخر কে এক সাথে মিলিয়ে একুশ বার পড়বে, তার সকল জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি আটচল্লিশ (৪৮) দিন যাবত তিন হাজার বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে যা কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করবে, তাই পাবে।

(৫) যে ব্যক্তি আটচল্লিশ (৪৮) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার নফস তার অনুগত হবে।

(৬) যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার এই নাম পড়বে, সে তার সকল কাজকর্মে পূর্ণতা লাভ করবে।

(৭) হুযূর সা. থেকে এই দুআ বর্ণিত:

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدمت المؤخر
وأنت علي كل شيء قدير.^{৯৭}

(৭৪) الْأَوَّلُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-আউয়ালু: প্রথম অর্থাৎ অনাদি) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) মুসাফির ব্যক্তি শুক্রবার এক হাজার বার এই নাম পড়লে ইনশাআল্লাহ অতি সত্ত্বর সে নিরাপদে স্বদেশ ফিরে আসবে।

(২) যে ব্যক্তির ছেলে সন্তান হয় না, সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক চল্লিশ বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে এবং সব ধরনের কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে।

(৩) যে ব্যক্তি চল্লিশ (৪০) জুমআ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইশার নামাযের পর এক হাজার বার এই নাম পড়বে, তার সকল চাহিদা পূরণ করা হবে।

(৪) যে ব্যক্তি প্রতিদিন এগারো বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সমস্ত মাখলুক তার প্রতি দয়াবান হবে।

(৫) যে ব্যক্তি একশত বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার স্ত্রী তাকে মুহাব্বত করবে।

(৭৫) الْآخِرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-আখিরু: শেষ অর্থাৎ অনন্ত) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি ইশরাক নামাযের পর পাঁচশত বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি ও অন্তরে নূর হাসিল হবে।

(২) ঝড় তুফানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এই নাম অধিক পরিমাণে পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকবে।

(৩) যদি ঘরের দেয়ালে এই নাম লিখে রাখে, তাহলে দেয়াল ধ্বসে পড়ার থেকে হেফাযত থাকবে।

(৪) যে ব্যক্তি এগারো বার এই নাম পড়ে সুরমার ওপর দম করবে এবং তা চোখে লাগাবে। ইনশাআল্লাহ মানুষ তার প্রতি দয়াবান হবে।

(৫) যে ব্যক্তি জুমআর দিন পাঁচশ বার এই নাম পড়বে, তার অন্ত করণে আল্লাহর নূর সৃষ্টি হবে।

(৬) এই নামের যিকির মারেফাতের পথিকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

(৭৬) الظَّاهِرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আজ জাহিরু: প্রকাশ্য, বাহ্যিক) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যেই ব্যক্তি ইশরাক নামাযের পর পাঁচশত (৫০০) বার আল্লাহর এই নামটি পড়বে। আল্লাহ তা'য়ালা তার চোখের জ্যোতি এবং অন্তরে নূর দিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ!

(২) যদি বৃষ্টি বা এ জাতীয় কিছু ভয় হয়, তবে এই নামটি বেশি বেশি পড়বে। ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকবে।

(৩) যদি ঘরের দেয়ালে এই নাম লিখে রাখা হয়, ইনশাআল্লাহ দেয়াল নিরাপদ থাকবে।

(৪) যে কেউ এগার (১১) বার এই নাম পড়ে সুরমায় দমকরে চোখে লাগায়। তাহলে মানুষ তার প্রতি দয়াবান হবে।

(৫) জুমআর দিন পাঁচশত (৫০০) বার এই নাম মোবারক পড়লে অন্তরে নূর হবে এবং ইনশাআল্লাহ শত্রু নমনীয় হবে।

(৬) এটা কাশ্ফের যিকির। অর্থাৎ অন্তর খুলে যাওয়ার জিকির।

(৭৭) الْبَاطِنُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-বাতিনু: অদৃশ্য) এর আটটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি দৈনিক তেত্রিশ (৩৩) বার باطن یا পড়বে, তার নিকট আধ্যাত্মিক রহস্যাবলী প্রকাশ পেতে থাকবে। তার অন্তরে আল্লাহ পাকের মুহাব্বত পয়দা হবে।

(২) যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়ে:

هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو علي كل شيء قدير.

আয়াতটি একশত পঁয়তাল্লিশ (১৪৫) বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হবে।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম একচল্লিশ (৪১) বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার ঈমানের নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এই নামের যিকির করবে। মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি হবে।

(৫) যে ব্যক্তি দৈনিক এশা, ফজর অথবা যে কোনো নামাযের পর দিলে দিলে অথবা মুখে উচ্চারণ করে তিনশত ষাট (৩৬০) বার এই নাম পড়বে, সে রুহানী শক্তির অধিকারী হবে এবং সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

(৬) যদি কোনো আমানতের কিছু বস্তু নিজের কাছে অথবা মাটির নীচে রাখতে হয়, তাহলে একটি কাগজে الباطن লিখে ঐ আমানতের বস্তুর সাথে রেখে দিবে। ইনশাআল্লাহ কেউ এর মধ্যে খেয়ানত করতে পারবে না।

(৭) যে ব্যক্তি দৈনিক তিন বার এক ঘন্টা পর্যন্ত এই নাম পড়বে। তার অন্তরে আল্লাহ পাকের মুহাব্বত পয়দা হবে।

(৮) যে ব্যক্তি দৈনিক যে কোনো নামাযের পর আশি (৮০) বার এই নাম পড়বে, সে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

(৭৮) الْوَالِي এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-ওয়ালিয়্যু: অধিপতি) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) কেউ যদি আপন অথবা অন্য কারো ঘর বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে চায়, সে যেন তিনশত বার এই নাম পড়ে নেয়। ইনশাআল্লাহ সে ঘর সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(২) যদি কাউকে বশ করতে হয়, তাহলে এগারো বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে অনুগত হয়ে যাবে।

(৩) নতুন চীনামাটির পেয়ালার মধ্যে এই নাম লিখে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ঐ পানি ঘরের মধ্যে ছিটিয়ে দিলে ঐ ঘরঃ সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, মাখলুকের মাঝে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

(৫) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়তে থাকবে, সে আকস্মিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে।

(৬) এই নাম অধিক পরিমাণে পড়লে বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৭) এই নামের যিকির করলে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য বেশী উপকারী যারা অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। যেমন: শাসক, অফিসার, বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ।

(৭৯) اَلْمُتَعَالِي এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুতা'আলীউ: (সর্বোচ্চ মর্যাদাবান) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নামের যিকির করবে, তার সকল প্রকার বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে।

(২) যে মহিলা ঋতু অবস্থায় অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ তার কষ্ট দূর হবে।

(৩) কোনো পাপ কাজে অভ্যস্ত মহিলা যদি গোনাহ থেকে তওবা করে এই নামের যিকির অধিক পরিমাণে করতে থাকে, তাহলে তার ঐ খারাপ অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

(৪) রবি বার রাতে গোসল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে এই নাম তিন বার পড়ে যে দু'আ করবে। ইনশাআল্লাহ সেই দু'আ কবুল হবে।

(৫) এই নামের যিকির অধিক পরিমাণে করলে মাখলুকের মাঝে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

(৬) যে ব্যক্তি বিচারকের কাছে যাওয়ার সময় এই নাম পড়বে। বিচারের রায় তার পক্ষে হবে।

(৭) শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য সাত দিন যাবত দৈনিক এক হাজার বার এই নাম পড়বে।

(৮০) اَلْبُرُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল- বাররু: কৃপাময়, পরম উপকারী) এর নয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি গুনাহের মধ্যে লিপ্ত। সে দৈনিক সাত বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ ঐ সব গুনাহের প্রবণতা দূর হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তি ঝড়-তুফানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে নিরাপদে থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি দুনিয়ার মুহাব্বতে লিপ্ত, সে অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার অন্তর থেকে দুনিয়ার মুহাব্বত দূর হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি নিজ সন্তানের ওপর জন্ম হওয়ার সাথে সাথে সাতবার এই নাম পড়ে ফুক দিবে এবং তাকে আল্লাহ তা'য়ালার ওপর সোপর্দ করবে, তাহলে সন্তান বালগ হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম পড়বে, সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে।

(৬) যে ব্যক্তি জল অথবা স্থলপথে সফরকালে এই নাম পড়বে, সর্ব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে।

(৭) যে ব্যক্তি এই নাম পড়ে আপন সন্তানের মাথায় ফুক দিয়ে এই দু'আ পড়বে, তার উক্ত দু'আ কবুল হবে। সে কখনও ইয়াতীম এবং অবাধ্য হবে না। দু'আটি এই: اللهم بارك ببركة هذا الإسم ربه لا يتيما ولا لئيمًا.

(৮) কবীরা গোনাহ করনে ওয়ালা যদি সাতশ বার পড়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তার গোনাহ থেকে তওবা নসীব হবে।

(৯) যদি এই নামের সাথে يا رحيم मिलিয়ে يا رحيم পড়ে, তাহলে তার দু'আ কবুল হবে।

(৮১) اَلتَّوَّابُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আত তাওয়াবু: তওবা কবুল কারী) এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের পর তিনশত ষাট (৩৬০) বার ঐ নামটি পড়বে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার সত্যিকারের তওবা করার তৌফিক দান করবেন।

(২) যে ব্যক্তি অধিকহারে ঐ নামটি পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ তার সমস্ত কাজ সহজ হবে এবং অন্তর অনুগত্যে খুশি হবে।

(৩) যদি কোনো জালেমের ওপর দশ (১০) বার পরে ফু দেয়া যায়। ইনশাআল্লাহ তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের পর **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ** পড়বে। ইনশাআল্লাহ তার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(৫) যে ব্যক্তি এক চল্লিশ দিন পর্যন্ত আটশত বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ তাকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত দ্বারা খুশি করা হবে।

(৬) যদি কোনো ব্যক্তি এই নামটি লিখে এবং বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে মদপানকারী ব্যক্তিকে পান করালে। সে তার অভ্যাস ছেড়ে দিবে এবং সে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর অনুগত্য হয়ে যাবে।

(৮২) **اَلْمُنْتَقِمُ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুনতাক্বিমু: শাস্তিদাতা) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সত্যের ওপর আছে, অথচ শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাহলে সে তিন জুমআ পর্যন্ত অধিক পরিমাণে **يا منتقم** পড়বে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ নিজে তার শত্রু থেকে প্রতিশোধ নিবেন।

(২) যে ব্যক্তি মধ্যরাতে এই নাম কোনো উদ্দেশ্যে পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালার তার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করবেন।

(৩) যে ব্যক্তি এশা বা ফজরের নামাযের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক এক হাজার এক বার **يا منتقم** পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার শত্রু ধ্বংস হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার চোখে কখনও ব্যাথা হবে না।

(৮৩) **اَلْعَفُو** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-আফউ: ক্ষমাকারী) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ তার গোনাহসমূহকে মাফ করে দেয়া হবে। এবং নেক আমলের তৌফিক হবে।

(২) যে ব্যক্তি তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এই নামের যিকির করবে, তার সব শত্রুগুলো মিত্র হয়ে যাবে। মানুষের মাঝে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

(৩) মাখলুকের ভয় দূর করার জন্য এই নাম অধিক পরিমাণে পড়বে।

(৪) যদি এই নামের সাথে الغفور মিলিয়ে পড়া হয়, তাহলে ইহা দু'আ কবুলের জন্য বেশী সহায়ক হবে।

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি একশত ছাপ্তান্ন (১৫৬) বার এই নাম পড়ে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাখলুকের ভয় থেকে হেফাযত রাখবেন।

(৮৪) الرَّؤُوفُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আর-রাউফু: দয়াদ্র) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি কোনো মযলুমকে যালিমের হাত থেকে মুক্ত করতে চায়, সে যেন দশ বার এই নাম পড়ে। ইনশাআল্লাহ যালিম সুপারিশ কবুল করে নিবে।

(২) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, যালিমের অন্তর তার উপর সদয় হবে। সকলে তার বন্ধুতে পরিণত হবে।

(৩) যে ব্যক্তি দশবার দরুদ শরীফ পড়ে দশবার এই নাম পড়বে, তার ক্রোধ দূর হয়ে যাবে। অন্য ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ওপর ফুঁক দিলে তার ক্রোধও দূর হয়ে যাবে।

(৮৫) الْمَلِكُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(মালিকুল মুলক: সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর এই নাম পড়তে থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে ধনী এবং মাখলুক থেকে বেপরওয়া করে দিবেন। সে কারো মুখাপেক্ষী থাকবে না।

(২) যে বাদশাহ দেশকে বিজয় করতে চায়, সে এই নাম অধিক পরিমাণে পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ সে তার উদ্দেশ্যে সফলকাম হবে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি الْمَلِكُ يَا الْمَلِكُ یا ایاکرام ویا ایاکرام অধিক পরিমাণে পড়তে থাকে, তাহলে গরীব থেকে ধনী হয়ে যাবে।

(৪) যে বাদশাহ তার শাসনের স্থায়িত্ব চায়, সে যেন অধিক পরিমাণে এই নাম পড়ে।

(৮৬) ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(যুল জালালি ওয়াল ইকরাম: মহিমাময় মহানুভব) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ পড়তে থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে সম্মান ও মহত্ব দান করবেন এবং মাখলুক থেকে তাকে বেপরওয়া করে দিবেন।

(২) কিছু উলামায়ে কিরাম একে ‘ইসমে আযম’ বলে থাকেন।

যে ব্যক্তি يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيدِكَ الْخَيْرُ وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

দু’আটি একশত বার পড়ে পানিতে দম করে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করাবে, ইনশাআল্লাহ সে সুস্থতা লাভ করবে। আর যদি কোনো পেরেশান দিল ওয়ালা এই নাম পড়ে, তাহলে তার অন্তর খুশী হবে।

(৩) যে ব্যক্তি দৈনিক পাবন্দীর সাথে তিনশত তেত্রিশ (৩৩৩) বার

يَا مَالِكُ الْمَلِكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ পড়বে, মাখলুক তার অনুগত হয়ে যাবে।

(৮৭) الْمُقْسِطُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুক্‌সিতু: ন্যায়পরায়ণ) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি দৈনিক এই নাম পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ সে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদে থাকবে।

(২) যদি কোনো জায়েয মাকসূদের জন্য সাতশ বার এই নাম পাঠ করে, ইনশাআল্লাহ সে মাকসূদ পূর্ণ হবে।

(৩) যে ব্যক্তি দৈনিক সত্তর বার এই নাম পাঠ করে, তার দুঃখ-দুর্দশা আল্লাহ তা’য়ালা দূর করে দিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি একশত বার এই নাম পড়বে, সে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৫) এই নামের যিকির অধিক পরিমাণে করলে, ইবাদতে একাগ্রতা আসবে।

(৮৮) اَلْجَامِعُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-জামিউ: একত্রকারী) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সে চাশতের সময় গোসল করে এবং আকাশের দিকে মুখ করে দশবার

يا جامع পড়বে এবং একটি আঙ্গুল বন্ধ করবে, এভাবে প্রত্যেক দশবারের পর একটি করে আঙ্গুল বন্ধ করতে থাকবে। অবশেষে উভয় হাত মুখমণ্ডলের উপর ফিরিয়ে নিবে। ইনশাআল্লাহ্ তারা শীঘ্রই একত্রিত হবে।

(২) যদি কোনো বস্তু হারিয়ে যায়, তাহলে اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه এই দু'আ পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ হারানো বস্তু ফিরে পাবে।

(৩) জায়েয মহাব্বতের জন্য এই দু'আ কার্যকর।

(৪) আপন আত্মীয়-স্বজন যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের একত্রিত করার জন্য একশত চৌদ্দ (১১৪) বার খোলা আকাশের নীচে এই নামের যিকির করবে। ইনশাআল্লাহ্ সকলকে ফিরে পাবে।

(৮৯) اَلْغَنِيُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-গানিয্যু: ধনী) এর আটটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সত্তরবার يا غني পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার মালের মধ্যে বরকত দান করবেন এবং ইনশাআল্লাহ্ সে কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না।

(২) যে ব্যক্তি কোনো বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরীণ বালা-মুসীবতে পতিত হবে সে নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর এই নাম পড়ে ফুঁক দিতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ পরিত্রাণ পাবে।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম এক হাজার বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ্ সে ধনী হয়ে যাবে। কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

(৪) যে ব্যক্তি এই নাম লিখে নিজের কাছে রাখবে, সে কখনো গরীব হবে না।

(৫) যে ব্যক্তি এই নাম লিখে তার মালের সাথে রেখে দিবে ইনশাআল্লাহ তার মালের মধ্যে বরকত হবে।

(৬) যে ব্যক্তি এই নামের যিকির করতে থাকবে, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো ধরনের ব্যাথা থাকবে না।

(৭) যে ব্যক্তি বৃহস্পতি বার দিন এক হাজার বার এই নাম পড়বে, সে ধন-সম্পদের অধিকারী হবে।

(৮) যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের পর সত্তর বার পাবন্দীর সাথে নিম্নে বর্ণিত দু'আটি করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধনী বানিয়ে দিবেন।

দু'আটি হলো এই:

اللهم يا غني يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود إكفني بحلالك
عن حرامك وبطاعتك من معصيتك وبفضلك عن سواك.

(৯০) **الْمُعْنَى** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মুগনীউ: অভাব মোচনকারী) এর এগারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি প্রথমে ও শেষে এগার বার দরুদ শরীফ পড়ে এগার শত বার ওযীফার ন্যায় এই নাম পড়বে, তাকে আল্লাহ তা'য়ালা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্য দান করবেন। ফজরের অথবা এশার নামাযের পর উক্ত আমল করবে এর সাথে সূরায়ে মুযাম্মিলও তিলাওয়াত করবে।

(২) যে ব্যক্তি এক হাজার দুইশত সাতষটি (১২৬৭) বার এই নাম পাবন্দীর সাথে পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে ধনী হয়ে যাবে।

(৩) যে ব্যক্তি এই নাম লিখে নিজের কাছে রাখবে, সে কখনো গরীব হবে না।

(৪) যে ব্যক্তি দশ জুমআ পর্যন্ত প্রত্যেক জুমআয় এক হাজার বার অথবা দশ বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে মাখলুকের মুখাপেক্ষী হবে না।

(৫) যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের পূর্বে সত্তর বার মনে মনে এই নামটি পড়বে, সে তার স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করবে।

(৬) যদি কোনো অভাবী ব্যক্তি ফজরের ফরয ও সুন্নতের মাঝে দু'শ বার, যোহর, আসর ও মাগরিবের পর দু'শ বার এবং ইশার পর তিন শত বার এই নাম পড়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে ধন-সম্পদের অধিকারী হবে।

(৭) যে ব্যক্তি দৈনিক এগারশত বার এই নাম পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা দান করবেন।

(৮) যে ব্যক্তি এগারশত বার يا مغني এবং বিসমিল্লাহর সাথে এগারশত বার لا حول ولا قوة الا بالله এবং বিসমিল্লাহ ছাড়া একশ বার দরুদ শরীফ এবং দুই বার সূরায়ে মুয়াম্মিল পড়বে, তার রিযিকের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত বরকত দান করবেন।

(৯) যদি কোনো ব্যাথার স্থানে হাত রেখে এই নাম পড়া হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ তার ব্যাথা উপশম হবে।

(১০) যে ব্যক্তি দৈনিক এগারশত একুশ বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে কখনও কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

(১১) যে ব্যক্তি সূরায়ে দোহা পড়ে এই নাম পড়বে এবং নিম্নলিখিত দু'আটি পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা গায়েব থেকে তার জন্য গায়েবী সাহায্য পাঠাবেন। দু'আটি এই:

اللهم يسرنى لليسر الذي يسرته لكثير من خلقك وأغنني بفضلك عن سواك.

(৯১) الْمَانِعُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-মানিউ: প্রতিরোধকারী) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যদি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া অথবা তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তাহলে শোয়ার সময় বিশ বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ ঝগড়া ও তিক্ততা দূর হয়ে যাবে এবং পরস্পরের মধ্যে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে।

(২) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৩) যদি কোনো বিশেষ এবং জায়েয উদ্দেশ্যের জন্য এই নাম পড়ে, তাহলে তার মাকসূদ হাসিল হবে।

(৪) যে ব্যক্তি এই নাম একশ বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ পরস্পরের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ হয়ে যাবে।

(৫) যে ব্যক্তি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সকাল-সন্ধ্যা এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার সকল উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

‘৯২) اَلْضَّارُّ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আয-যাররু: অকল্যাণের মালিক) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি জুমআর রাত্ৰিতে একশত বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ সে সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে এবং সে আল্লাহ তা’য়ালার নৈকট্য লাভ করবে।

(২) যে ব্যক্তি এই নাম পড়ে কোনো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দু’আ করবে, আল্লাহ তা’য়ালার উক্ত অত্যাচারী ব্যক্তিকে ধ্বংস করে তাকে জুলুম থেকে হেফাযতে রাখবেন।

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’য়ালার নৈকট্য অর্জনের এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, সে ব্যক্তি জুমআর রাতে একশত বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ সে এই মর্যাদার ওপর মযবুত থাকবে। আর এই মর্যাদার সামনে বাহ্যিক কোনো যোগ্যতা কাজে আসবে না।

(৪) যে ব্যক্তি প্রতি জুমআর রাতে এবং চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে একশত বার ইশার নামাযের পর এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ মানুষের মাঝে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

(৫) যে ব্যক্তি প্রতি জুমআর রাতে একশত বার اَلْضَّارُّ النَّافِعُ পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে নিজ গোত্রের মাঝে সম্মানিত এবং শারীরিক সুস্থতা লাভ করবে।

‘৯৩) اَلنَّافِعُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আন-নাফিউ: কল্যাণকারী) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি নৌকা অথবা অন্য কোনো যানবাহনে আরোহণ করার পর অধিক পরিমাণে اَلنَّافِعُ পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ সে সকল বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকবে।

(২) যে ব্যক্তি কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে একচল্লিশ (৪১) বার এই নাম পড়বে, তাহলে তার কাজ ইচ্ছানুযায়ী হাসিল হবে।

(৩) যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের সময় এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে নেক সন্তান লাভ করবে।

(৪) যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তির ওপর এই নাম পড়ে দম করা হয়, তাহলে সে সুস্থতা লাভ করবে।

(৫) যে ব্যক্তি রজব মাসে এই নামের যিকির করবে, ইনশাআল্লাহ সে আল্লাহর রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত হবে।

(৬) যে ব্যক্তি চার দিন যাবত এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে কখনও চিন্তাযুক্ত থাকবে না।

(৭) যে ব্যক্তি হজ্বের সফরে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসবে।

(৯৪) اَلنُّوْرُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আন-নূর: জ্যোতির্ময়) এর চারটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি জুমআর রাতে সাত বার সূরায়ে নূর এবং এক হাজার বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার অন্তর আল্লাহর নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তি এই নামকে النافع এর সাথে মিলিয়ে পড়ে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির ওপর দম করবে, সে সুস্থতা লাভ করবে।

(৩) যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে পাবন্দীর সাথে এই নাম পড়বে, তার অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত হবে।

(৪) যে ব্যক্তি কোনো অন্ধকার কক্ষে চোখ বন্ধ করে এই নামের যিকির করতে করতে আত্মভোলা হয়ে যাবে, তাহলে সে এমন এক আশ্চর্য ধরণের নূর দেখতে পাবে, যদ্বারা অন্তর আলোকিত হয়ে যাবে। এই ইসিমের যিকির আহলে কাশফদের জন্য অত্যন্ত উপকারী আমল।

(৯৫) اَلْهِدٰی এর অর্থ ও তার বৈশিষ্ট্য:

(আল-হাদিউ: পথ প্রদর্শক) এর আটটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে অধিক পরিমাণে هِدٰی پড়বে এবং শেষে মুখের ওপর হাত ফিরিয়ে নিবে, ইনশাআল্লাহ সে পরিপূর্ণ হিদায়াত লাভ করবে এবং মারেফাত ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(২) যে ব্যক্তি এগারশত (১১০০) বার **يا هادي أهدنا الصراط المستقيم** দু'আটি এশার নামাযের পর পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে কারো মুখাপেক্ষী থাকবে না। এবং হিদায়েতের পথে চলার তৌফিক নসীব হবে।

(৩) যে ব্যক্তি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে, সে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং প্রতি রাকাতে সূরায়ে ফাতিহার পর সূরায়ে ইখলাস পড়বে এবং সালাম ফিরানোর পর এক নিঃশ্বাসে যতটুকু সম্ভব হয় এই নাম পড়ে দু'আ করবে। ইনশাআল্লাহ যে দু'আই করবে, তাই কবুল হবে।

(৪) যে ব্যক্তি সফরকালে রাস্তা হারিয়ে ফেলে, সে **يا هادي أهد** পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

(৫) এই নামের যিকির করলে অথবা লিখে সাথে রাখলে সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়।

(৬) যে ফরয নামাযের পর চারশত বার এই নাম পড়বে, সে বড় ধরনের সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

(৭) যদি কোনো বাদশাহ অধিক পরিমাণে এই নামের যিকির করতে করতে আত্মহারা হয়ে যায়, তাহলে তার প্রজারা তার অনুসারী হয়ে যাবে।

(৮) তাসাউফের পথিকদের আত্মা উর্দ্ধজগতে ভ্রমনের জন্য এই ইসিমের যিকির অত্যন্ত উপকারী আমল।

(৯৬) **الْبَدِيعُ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-বাদীউ; নমুনাবিহীন সৃষ্টিকারী) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি দুশ্চিন্তা, বিপদ অথবা যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে, সে এক হাজার বার **يا بديع السموات والأرض** পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে তা থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এই নাম অযুর সাথে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যায়, তাহলে যে কাজের ইচ্ছা হবে উক্ত কাজ সে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাবে।

(৩) যদি কেউ ইশার নামাযের পর **يا بديع العجائب بالخير** বা **يا بديع** বারশত (১২০০) বার বার দিন পর্যন্ত পড়বে, তাহলে যে কাজ অথবা মাকসূদের জন্য পড়বে, ইনশাআল্লাহ আমল শেষ হওয়ার পূর্বে তা আদায় হবে।

(৪) যদি কোনো দুশ্চিন্তা অথবা প্রয়োজনে সত্তর হাজার (৭০,০০০) বার **يا بديع السموات والأرض** পড়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(৫) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তাকে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ইলম ও হিকমত দান করা হবে। তার মুখ থেকে এমন জ্ঞানের কথা বের করবেন, যা সে পূর্বে জানত না।

(৯৭) **الْبَاقِي** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-বাকীউ: চিরস্থায়ী) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি এই নাম জুমআর রাতে এক হাজার বার পড়বে, আল্লাহ পাক তাকে সর্ব প্রকার ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন। এবং তার সমস্ত নেক আমল কবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

(২) যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে দৈনিক একশ বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত সে কোনো দুঃখ কষ্টে ভুগবে না।

(৩) যে ব্যক্তি শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য শনিবার দিন যে কোনো সময় দুই রাকাত নামায পড়ে অথবা অবস্থায় একশত বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ তার শত্রু তার অনুসারী হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একশ তের (১১৩) বার এই নাম পড়ার অভ্যাস করবে, ইনশাআল্লাহ তাকে তার পদ থেকে কেউ বরখাস্ত করতে পারবে না।

(৫) যে ব্যক্তি একশত বার **يا باقى** পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ তার সমস্ত আমলগুলো আল্লাহর দরবারে কবুল হতে থাকবে।

(৯৮) **الْوَارِثُ** এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আল-ওয়ারিসু: সত্ত্বাধিকারী) তিনটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় একশত বার **يا وارث** পড়বে, ইনশাআল্লাহ সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ থেকে নিরাপদে থাকবে এবং ঈমানের সাথে তার মৃত্যু হবে।

(২) যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই নাম এক হাজার বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ সর্ব প্রকার দুশ্চিন্তা ও হতবুদ্ধিতা থেকে আল্লাহ পাক তাকে মুক্ত রাখবেন।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়তে থাকবে, তার ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করা হবে এবং তার সমস্ত কাজ সহজেই আদায় হবে। সে নিরাপদে থাকবে এবং তার জীবনের মধ্যে বরকত পাবে।

(৯৯) الرَّشِيدُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আর-রাশীদু: সত্যদর্শী) এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি নিজের কোনো কাজ বা মাকসূদের তদবীর বুঝে না আসে, সে মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে এক হাজার বার رَشِيد يا পড়বে, ইনশাআল্লাহ হয় স্বপ্নে তদবীর দেখবে অথবা অন্তরের মধ্যে তা উদয় হবে।

(২) যদি কেউ এই নাম দৈনিক পড়তে থাকে, তাহলে তার সমস্ত জটিলতা দূর হয়ে যাবে এবং কাজ-কর্মে খুব উন্নতি হবে।

(৩) যে ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে সুসন্তান লাভ করবে।

(৪) কোনো কাজে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য ইশার নামাযের পর একশত বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতে পারবে।

(৫) যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর একশ বার এই নাম পড়বে, তার আমলসমূহ কবুল হবে।

(১০০) الصَّبُورُ এর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(আস-সাব্বুর: ধৈর্যশীল) এর সাতটি বৈশিষ্ট্য:

(১) যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে একশত এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে ঐ দিন সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে এবং শত্রু ও বিদ্বেষপোষণকারীদের মুখ বন্ধ থাকবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার বিপদে পড়ে, সে এক হাজার বিশ (১০২০) বার এই নাম পড়বে। ইনশাআল্লাহ ঐ বিপদ থেকে মুক্তি পাবে এবং চিন্তের প্রশান্তি লাভ করবে।

(৩) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এই নাম পড়বে, তার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং সে হাসি-খুশী থাকবে।

(৪) যে কোনো ধরনের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুই শত আটানব্বই (২৯৮) বার এই নাম পড়বে।

(৫) যে ব্যক্তি কোনো ব্যাথা, দুশ্চিন্তা ও মুসীবতের সম্মুখীন হয়, সে তেত্রিশ (৩৩) বার এই নাম পড়বে, ইনশাআল্লাহ সকল পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।

(৬) যে ব্যক্তি সর্বদা মধ্য রাতে অথবা দুপুরে এই নাম পড়বে, তার শত্রুর নমনীয়তা ও সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য অর্জন হবে। এই নামের যিকির অন্তরের দুঃখ-কষ্ট এবং রাগ দূর করে দেয়।

(৭) এই নামের যিকির মারেফাতের পথিকদের আমল, যদ্বারা ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন হয়।

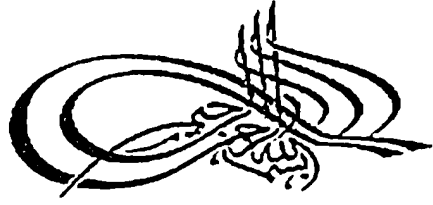
॥ ওয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

মুক্তার চেয়ে দামী

চতুর্থ খণ্ড

অনূদিত

মাওলানা আতিকুল্লাহ শহীদ



আপনার ঘরে রহমত ও বরকতের বারি বর্ষণ

আপনি রহমত ও বরকত হাসিল করতে চাইলে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হোন।

(১) ঘরের সব নারী, পুরুষ নিজেদের দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। ঘুমের আগে ওয়ু করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে। তবেই তা সবার জন্য অনেক উপকারী হবে।

(২) নিজেদের ঘর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে। অবুঝ ও ছোট বাচ্চাদের নির্দিষ্ট স্থানে পেশাব পায়খানা कराবে। বাচ্চারা যদি অনির্ধারিত স্থানে পায়খানা করে দেয় তবে সাথে সাথে সেই স্থানকে পরিষ্কার করতে হবে। বাচ্চাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিও বিশেষ নজর দিতে হবে।

(৩) ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনে কোনো প্রাণীর ছবি রাখা থেকে কঠিনভাবে বিরত থাকতে হবে। গান, বাদ্য, বিভিন্ন যন্ত্র সংগীতের আসবাবপত্র এবং বিনোদনের উপকরণ থেকে নিজের ঘরকে পবিত্র রাখতে হবে। কারণ এই সব বস্তু ঘরে বসবাসকারীদের রহমত থেকে বঞ্চিত করে।

(৪) ঘরে সব সময় কুরআন তেলাওয়াত, যিকির দীনী আলোচনা ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থা করা চাই। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঘর থেকে বিপদ, অকল্যাণ, অসুস্থতা ও পেরেশানি দূর হয়ে যায় এবং ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। যে ঘরে কুরআন কারিমের তেলাওয়াত হয়, হাদীসের আলোকে এমন ঘর আসমানে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টি লাভ করে। ফেরেশতারা আসমান থেকে সেই ঘরগুলোকে এমনভাবে আলোকিত ও চমকিত দেখতে থাকেন যেমন, জমিনে মানুষেরা আসমানে তারকারাজি চমকতে দেখে। এটা কতই না সৌভাগ্যের কথা, কোনো মুমিন এমন সৌভাগ্য ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হতে চায়! অতএব প্রতিটি ঘরের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর নিজে এবং ঘরের সব সদস্যদের তেলাওয়াতের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি যত্নবান হবেন। পাশাপাশি সবাইকে ঘরের পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ নজর রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্টিত হতে হবে। ইনশাআল্লাহ আপনার ঘরে রহমত ও বরকতের বারি বর্ষণ হতে থাকবে।

ভদ্র ও সজ্জন স্বামীরা বিবিদের অভিমান সহ্য করে

কিছু লোক এমন রয়েছে যারা আপন বিবিদের কষ্ট দেয়। একটু বেয়াদবি হলেই তাদের প্রহার করে। বলে, তোমার কিসের অহংকার? কিষ্ট গুনুন...!

সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অধিক আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন আর কে আছে? রাসূল সা. বলেছেন, হে আয়েশা! যখন তুমি রাগ করো, আমার ওপর অভিমান করো তখন আমি বুঝে ফেলি। তিনি আরজ করলেন, হে প্রিয়তম নবী করীম সা. আমার মা বাবা আপনার ওপর কোরবান হোক, আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন আমি অভিমান করেছি? রাসূল সা. বলেন, যখন তুমি আমার ওপর অভিমান করো তখন এভাবে কসম খাও 'ইবরাহিমের রবের কসম'। আর যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো তখন বলো 'মুহাম্মদের রবের কসম'। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, হে দুনিয়াবাসী শোনো, যারা নিজেদের বিবিদের পিটিয়ে সোজা করতে চায় তারা অসভ্য, অভদ্র। আল্লামা আলুসি র. তাফসিরে রুহুল মাআ'নিতে এই বর্ণনা নকল করেছেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, ভদ্র, সজ্জন স্বামীদের ওপর মহিলারা প্রভাব সৃষ্টি করে। কারণ তারা জানে

সে তার অভিমান ভাঙাবে। পক্ষান্তরে অভদ্র স্বামীরা বেতের সাহায্যে এবং গালমন্দ করে স্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আমি এটা পছন্দ করি না, অভদ্র হয়ে আমি তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করি।

হাকিমুল উম্মত রা. বলেন, এক মহিলা খাবারে লবণ একটু বেশি দেয়। স্বামী বেচারী ছিল গরিব মানুষ। ছয় মাস পর সে মুরগি কিনতে পেরেছে। ছয় মাস শুধু ডাল ভাত খেয়ে তার মনে মুরগি খাওয়ার অনেক চাহিদা সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্ত্রী সেই মুরগিতে লবণ বেশি দেয়। স্বামী বেচারী স্ত্রীকে কিছুই বলেনি। চোখ বন্ধ করে সে খেয়েছে এবং বলেছে, হে আল্লাহ! যদি আমার মেয়ে লবণ বেশি দিত তবে আমি এটা চাইতাম আমার জামাই তাকে মাফ করে দিক। আমার কলিজার টুকরোকে কেউ কিছু না বলুক। আমার বিবিও তো কারো কলিজার টুকরো। কোনা মা-বাবার সন্তান। হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমার বান্দিকে ক্ষমা করেছি।

হযরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী র. স্বীয় এক ওয়াজে বলেন, যখন ঐ ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়ে গেল। এক বুয়ুর্গ তাকে স্বপ্ন যোগে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভাই তোমার কী অবস্থা? সে বলল, যখন আল্লাহ আমাকে বললেন, তুমি এই গোনাহ করেছ, ঐ গোনাহ করেছ। তখন আমি মনে করলাম আমাকে দোষখেই যেতে হবে। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালার বললেন, যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম ঐ নেক আমলের জন্য, যা তুমি আমার এক বান্দির ভুলকে ক্ষমা করেছিলে। তাকে তুমি লাঠি দ্বারা প্রহার করনি, যেদিন আমার বান্দির দ্বারা লবণ বেশি হয়েছিল, বরং তাকে তুমি ক্ষমা করেছিলে। তার বিনিময়ে আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করছি।

যত তাহাজ্জুদগুজার ও যিকিরকারী আছে আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যদি তারা কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতপ্রাপ্ত না হয় তবে অধিকাংশের মধ্যে খুব রাগ দেখা যায়। তারা বলে আমার ওপর যিকিরের জালাল সৃষ্টি হয়েছে। হে আমার ভাই! তোমার ওপর তো শয়তান ভর করেছে। যিকিরের কারণে তো আল্লাহর মাখলুকের প্রতি আরো মেহেরবান হওয়া উচিত। অথচ তুমি এতো গরম মেযাজে থাকো যে, নিজেকে ফেরেশতা মনে করো। নিজের মেয়েকে কেউ কষ্ট দিলে সাথে সাথে কোন আমলকারীর কাছে গিয়ে তাবিজ আনবে। আমার মেয়েকে জামাতা প্রহার

করে অথচ তুমি নিজে স্ত্রীকে আঘাত করো এবং গালমন্দ করো। আল্লাহর মাখলুককে যে কষ্ট দিবে সে কখনও আল্লাহর ওলী, প্রিয় বান্দা হতে পারে না। এক লাখ হজ, ওমরা করো, যিকির করো কিন্তু আল্লাহর মাখলুককে কষ্ট দিলে কখনও পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। “পরিপূর্ণ মুমিন সে, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী”। হযরত ডা. আব্দুল হাই র. আমাকে নিজে এই ঘটনা শুনিয়েছেন। বড় পিরানি বেগম হযরতকে বলেছেন, আমি আত্মীয়র বাড়িতে যাচ্ছি। আমাদের পোষা মুরগিগুলো দিনের আটটা সময় ঘর থেকে বের করবেন এবং দানা পানি দিবেন। এত বড় মুজাদ্দিদ, হাকিমুল উম্মত যিনি প্রতিদিন ষাটটি চিঠির উত্তর লিখেন এবং পনের শ’ কিতাবের রচয়িতা তার কি মুরগির কথা স্মরণে থাকে! এখন তো তিনি চিঠির জবাব লিখতে পারছেন না। তাফসিরে বয়ানুল কুরআন লিখতে কলম তুলেছেন কিন্তু সব ইল্ম খতম। কিছুই মনে আসছে না। মনে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। ইল্ম ও জ্ঞান যেন গায়েব হয়ে গেছে। হযরত সেজদায় পড়ে কান্নাকাটি করছেন, হে আল্লাহ! আমার কি ভুল হয়েছে, কি গোনাহ হয়েছে যার কারণে তোমার রহমতের দৃষ্টি আমার থেকে সরে গেছে? আসমান থেকে উচ্চস্বরে আওয়াজ আসলো, আশরাফ আলী! আমার মাখলুক মুরগি তার ডেরাতে অন্ধকারে চিৎকার করছে, আমার মাখলুককে কষ্ট দিয়ে তুমি ইল্ম ও মাআরিফের অপেক্ষা করছ। জলদি যাও মুরগিগুলোকে ছেড়ে দাও। হযরত কেঁপে উঠলেন, দৌড়ে গিয়ে মুরগিগুলোকে মুক্ত করলেন এবং দানা পানি দিলেন। যখন ফিরে এলেন অন্তরে পুনরায় তিনি সব ইল্মের দরিয়া বইতে লাগল। এক প্রাণীর ওপর জুলুমের যদি এই শাস্তি হয় তবে আমাদের কি অবস্থা? আপন ভাই তার ভাইকে, স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দিচ্ছে। মা-বাবা সাথে ঝগড়া, প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেওয়া, সামান্য কথায় পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ এই হচ্ছে বর্তমান আমাদের অবস্থা।

উম্মতের জন্য দু’আ করলে সব মুসলমান সমান নেকী পাবে

ইমাম তিবরানি র. মু’জামে কাবীর গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ন্যূনতম একবার এই দু’আ পড়বে তাকে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে এক একটি

করে নেকী দেয়া হবে। দু'আটি হচ্ছে, “আল্লাহুমাগফিরলী ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত।”

হযরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই দু'আ পড়বে তাকে প্রত্যেক মুমিনের পক্ষ থেকে এক এক নেকী দেয়া হবে।^{৬০}

শয়তানের পনেরো দুশমন

হযরত ফকিহ আবু লাইছ সমরকন্দি র. ‘তাম্বিল গাফিলীন’ গ্রন্থে ওহাব ইবনে মুনাবিহ র. থেকে একটি রেওয়ায়াত নকল করেন। রাসূল সা. শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অভিশপ্ত! তোমার কতজন দুশমন আছে। শয়তান জবাব দিল পনেরো ধরনের লোক আমার দুশমন।

(১) প্রথম দুশমন আপনি রাসূল সা. (২) ন্যায়বিচারক বাদশা (৩) সম্পদশালী বিনয়ী (৪) সত্যবাদী ব্যবসায়ী (৫) বিনয়াবনত আলেম (৬) দয়ালু হৃদয় মুমিন (৭) তাওবার ওপর অবিচল ব্যক্তি (৮) হারাম থেকে পরহেযকারী (৯) সব সময় পবিত্র থাকা মুমিন (১০) কল্যাণকামী মুমিন (১১) অধিক সদকা আদায়কারী মুমিন (১২) মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী মুমিন (১৩) মানুষের উপকার ও কল্যাণকামী মুমিন। (১৪) কুরআন তেলাওয়াতকারী হাফেয ও আলেম। (১৫) রাতে নফল ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী ব্যক্তি।^{৬১}

যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহও তার হয়ে যায়

হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায র. ইত্তিকালের সময় নিজের বিবিকে ওসিয়ত করেছেন, আমাকে দাফন শেষে আমার দুই মেয়েকে নিয়ে অমুক পাহাড়ে যাবে। আসমানের দিকে তাকিয়ে বলবে, হে আল্লাহ! ফুযাইল আমাকে ওসিয়ত করেছে, যতদিন আমি জীবিত ছিলাম নিজের সাধ্য অনুযায়ী আমার মেয়েদেরকে নিজের কাছে রেখেছি। এখন তুমি আমাকে কবরের কয়েদখানায় বন্দি করেছ, তাই আমি আমার মেয়েদেরকে তোমার কাছে সোপর্দ করছি। তাই দাফন শেষে তার স্ত্রী ওসিয়ত মুতাবেক আমল

^{৬০} আলমু'জামুল কাবীর ২৩/৩৮, হাদীস ৮৭৭।

^{৬১} তাম্বিল গাফিলীন পৃ: ৪৮৯।

করলেন। দু'আ করে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলেন। সে সময় ইয়েমেনের আমির নিজের দুই ছেলে নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন এবং তার কান্নাকাটি শুনলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সব ঘটনা খুলে বললেন। ইয়েমেনের আমীর সব কিছু শুনে ওই দুই মেয়েকে নিজের দুই ছেলের সাথে বিয়ে দিলেন। তারপর তাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে ইয়েমেনে চলে গেলেন। যে আল্লাহর হয়ে যায় আল্লাহও তার হয়ে যান।^{৬২}

অহংকারীদের পরিণাম

অহংকার এমন এক ধ্বংসাত্মক রোগ, যা চোখের পলকে আমলকে মিটিয়ে দেয়। অহংকার মানুষকে ধ্বংসের চূড়ান্ত সীমানায় নিয়ে যায়। অহংকারের কারণে মানুষ দুনিয়াতে ধ্বংস হয়। আখেরাতেও তার ভাগ্যে ব্যর্থতা নির্ধারিত থাকে। অহংকারের কারণে মানুষের জীবনে ঘৃণা ও দূরত্ব তৈরি হয়। এমনভাবে আল্লাহ তা'য়ালার কঠিনভাবে নারাজ হন।

অহংকারী ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে নিজেকে সবচেয়ে বড় মনে করে। সে নিজেকে ইলম ও আমলের দিক থেকে বড় মনে করে। অথবা বংশ-গৌরব, ধন-সম্পদ বা সৌন্দর্যের বিবেচনায় নিজেকে বড় মনে করে। অহংকার একটি ক্ষতিকর রোগ। আলেম তার ইলমের কারণে সহজেই ধোকা খায়। নিজেকে ইলমের কারণে অনেক বড় মনে করে অপরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও জাহেল মনে করে। সে আশা করে অন্যরা তাকে সম্মান করুক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তির হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

অহংকার ও দম্ভ ধ্বংস ডেকে আনে। বিনয় ও নম্রতা মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও পরকালে মুক্তির ওসিলা। তাই যে অহংকার ও ধোঁকায় নিপতিত হবে ধ্বংস ও অশুভ পরিণাম তার ভাগ্যে নির্ধারিত থাকবে। পক্ষান্তরে যে বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের হবে দুনিয়াতেও সে সফলতার বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করবে। উপরন্তু আখেরাতেও সফলতা তার পদচুম্বন করবে। আল্লাহ

তা'য়ালার কাছে কামনা এই যে, তিনি সর্বাবস্থায় আমাদেরকে অহংকার ও দস্ত থেকে দূরে রাখুন।

সমুদ্রে হারানো সুঁই দু'আর বরকতে পাওয়া গেল

বনু সা'দ গোত্রের গোলাম হযরত উরওয়া রা. বলেন, একবার হযরত আবু রায়হানা রা. সমুদ্রে সফর করছিলেন, তিনি নিজের কোন কিছু সেলাই করছিলেন, এমন অবস্থায় সমুদ্রে সুঁই হারিয়ে যায়। তিনি তখনই এই দু'আ করলেন, হে আমার রব! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি তুমি অবশ্যই আমার সুঁই ফিরিয়ে দিবে। একটু পর সে সুঁই সমুদ্রের পিঠে ভেসে উঠল। আবু রায়হানা রা. সুঁই তুলে নিলেন।^{৬০}

মেয়েরা নিজেদের ঘরের শোভা হিসেবে জীবন যাপন করবে

মুহতারাম ও সম্মানিত মাওলানা সাহেব,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রশ্ন: আশা করি আপনি কুশলেই আছেন, মনের মধ্যে এই আশা জাগে আমিও স্বামীর মতো ব্যবসা বা কোন চাকরিতে সম্পৃক্ত হই। পরিবারের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে তাহলে আমারও ভূমিকা থাকবে। আমিও স্বামীর ওপর কৃত্ত্ব দেখাতে পারব। স্বামীর উপার্জনে জীবন যাপন করা আমার কাছে ভালো লাগে না। আমি তো পড়া লেখা করেছি। মূল কথা হচ্ছে, মহিলাদেরও ব্যবসা করার অনুমতি থাকা উচিত। তাহলে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সে চলতে পারবে। মেয়েরাও বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে তাদের বিয়ের ঘর আসছে না। আশা করছি এ সমস্যার সমাধান দিবেন, যেন আমি ও আমার স্বামী সন্তুষ্ট হতে পারি। আমার চিন্তা চেতনায় পশ্চিমা ভাবনা ভর করে আছে। বিশেষ করে দু'আর দরখাস্ত করছি। ওয়াসসালাম। দীনি বোন।

উত্তর: নারী জাতি হলো! মা, মেয়ে ও বিবি। মা হিসাবে তিনি একজন মহান এবং অন্যতম ব্যক্তিত্ব। মেয়ে রূপে তিনি একজন অনুগতা এবং বিবির রূপে তিনি একজন দায়িত্বশীলা জীবনসঙ্গিনী। পশ্চিমা গুণমুগ্ধরা এই কথা বলতে পারেন যে, পশ্চিমা সভ্যতায় অনেক বোনেরা বিজ্ঞানী,

পুলিশ, উকিল ও হিসাব বিজ্ঞানী তৈরি করেছে। কিন্তু এ কথা অস্বিকার করা যাবে না যে, পশ্চিমা সভ্যতা, সংস্কৃতি একজন মমতাময়ী মা, অনুগতা মেয়ে এবং দায়িত্বশীলা স্ত্রী অনেক কমই সৃষ্টি করেছে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য তো শুধু ইসলামেরই রয়েছে। ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের মাঝে সমান অধিকার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যেখানে ফরজের সম্পর্ক সেখানে বিধি বিধানের আইন রয়েছে। পুরুষের শারিরিক গঠন হচ্ছে মজবুত, অটুট। তাই তাকে বাইরের কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কষ্ট-পরিশ্রম, দৌড়-ঝাপ, বিবি-বাচ্চাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পুরুষের কাধে ন্যস্ত করা হয়েছে। নারীকে নরম গঠনে সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন মমতাময়ী, ধৈর্যশীলা, ত্যাগ ও কোরবানীর মূর্ত প্রতীক হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঘরের ভেতরের কাজ-কর্ম, বাচ্চাদের লালন-পালন, স্বামীর খেদমত ও আনুগত্যের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নারী ঘরের রাণী। রাসূল সা. সতী-সাধবী নারীকে পুরুষের সর্বোত্তম সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত সাব্যস্ত করেছেন।

প্রত্যেক যুগে, দুনিয়ার প্রতিটি ধর্মে যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েরা ঘর থেকে নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে সমাজে ততদিন পর্যন্ত শান্তি বিরাজ করেছে। পুরুষ ঘরের সব দায়িত্ব মহিলার কাছে ন্যস্ত করে নিশ্চিন্তে বাইরের দুনিয়ার সফলতা ও উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতো। সফলতা তার পদচুম্বন করতো। মায়ের মমতামাখা কোলে চড়ে সন্তান নিজের দেশের একজন প্রাণোৎসর্গকারী সৈনিক, স্বদেশের সেবক, নিজের দীন ও ধর্মের ঝাণ্ডাবাহী ও মুজাহিদ হতো। হতো সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও বুয়ুর্গানে দীন। এদের সবার মায়েরা ঘরের মধ্যে থেকেই নিজেদের বাচ্চাদের তালিম, তারবিত দেওয়ার উত্তম নমুনা তৈরি করেছেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার র. এর মায়ের নসিহত কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ‘মুহাম্মদ আলীর মা বলেছেন, হে বেটা খেলাফত রক্ষার জন্য তোমার জীবন বাজি রাখো।’ চৌদ্দশত বছর পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. রক্তপিপাসু হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিপরীতে তরবারি উত্তোলন করেন। নিজের বৃদ্ধা মা আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে তিনি বিদায় নেন। শতবর্ষী অন্ধ মা

ছেলের শরীর স্পর্শ করলেন এবং ৭৫ বছর বয়সী আব্দুল্লাহর শরীরে লোহার বর্ম অনুভব করলেন। তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাচ্ছ, তোমার শরীরে তো লোহার বর্ম শোভা পায় না। তা খুলে রাখো এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাও। এই ছিল সেই যুগের মায়েরা।

আজকের নারীরা খেলায় মত্ত রয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে নিজেদের উন্নত ও মহৎ দায়িত্বসমূহ ভুলে গেছে। পুরুষের সমানাধিকারের চক্রে পড়ে নিজের ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অথচ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনই তার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু অবুঝ নারীরা বাইরের দুনিয়ায় পা বাড়িয়ে নিজেদের কাঁধে দায়িত্বের বোঝা আরো বাড়িয়ে নিয়েছে। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার চক্রে পড়ে পুরুষের প্রবৃত্তির লালসা ভরা দৃষ্টির শিকার হয়ে নিজেদের অপমানিত করেছে। ঘরের ভিতরে পরিপূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তাবেষ্টিত থেকে রানী হওয়ার পরিবর্তে সমাজের কর্মী বনে গেছে। পুরুষেরা নিতান্তই খুশি তাদের দায়িত্বের অর্ধেক ভার নারীরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। অথচ নারীর মৌলিক কাজে পুরুষ কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করে না।

উপার্জনকারী নারীদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে চলছে। কিন্তু আফসোসের কথা হচ্ছে, এ বিষয়ে নারীরা সজাগ নয়। তার উপার্জনে জীবন মানের অবশ্যই উন্নতি হচ্ছে। ঘরের মধ্যে বিলাস বাসনের উপকরণ বেড়েছে। কিন্তু পারিবারিক জীবন এবং দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাচ্চারা চাকর চাকরানি বা বেবি সেন্টারে বড় হচ্ছে। মায়ের মমতা, আদর, স্নেহ থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। তারা হচ্ছে অবহেলা ও অযত্নের শিকার। মায়ের অনুপস্থিতিতে লোখা-পড়ার মান ও নৈতিকতার পতন ঘটছে।

একজন উপার্জনকারী ক্লান্ত বিবি তার স্বামীর প্রয়োজনকে পূরণ করতে পারছে না। এ কারণে স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে এবং অশান্তিতে ভুগছে। নিজের পেরেশানী ও অশান্তি দূর করতে সে নিজেকে বদ নেশায় আকর্ষণ ডুবিয়ে রাখছে। বিবির নিকট থেকে জৈবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ায় নানা কুচিন্তায় ও মন্দকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। জীবনে তিক্ততা বেড়ে চলছে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ করে যাচ্ছে। নারী যখন উপার্জন করছে সে স্বামীর কাছে

কখনও মাথা নোয়াতে প্রস্তুত নয়। এই অহমিকার কারণে ঘটে যাচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ। অথবা পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী বা পরকীয়ায় লিপ্ত হতে শুরু করে। এই অচলাবস্থায় নিষ্পাপ শিশুদের ভবিষ্যত হয়ে যায় অন্ধকার। উপার্জনকারী নারীর আরেকটি দিক হচ্ছে, বেচারী স্বামীকে স্ত্রীর মর্জি রক্ষার জন্য তাকে চলতে হয়। পক্ষান্তরে অফিসে ম্যাডাম তার বসকে সামনে পেছনে ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার বলতে বলতে গলদঘর্ম হতে হয়। কলেজের মেয়েদের মধ্যে উন্মাদিকতা, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা এখন সাধারণ হয়ে পড়েছে। বয়ফ্রেন্ড থাকা গর্বের বিষয় মনে করা হচ্ছে। কল সেন্টারে চলছে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড। মেয়েদের ইজ্জত, সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে।

আজকাল ভদ্র পরিবারের সন্তানদের বিয়ের জন্য সম্পর্ক খুঁজতে বেগ পেতে হয়। এই বিলাসী মনের, উশুংখল মানসিকতার পড়ুয়া মেয়েদের চাল-চলন দেখে অধিকাংশ ছেলেরাই কম শিক্ষিত, কম বয়সী, দীনদার এবং ভদ্র সুন্দর চরিত্রের মেয়েদের বিবাহ করতে প্রাধান্য দিচ্ছে। নিত্যদিন জোরপূর্বক ধর্ষণ, নানা ধরনের উত্যক্ত করার ঘটনা অহরহ ঘটছে। অর্ধনগ্ন, নির্লজ্জ মেয়েদের দেখে পুরুষেরা কতক্ষণ নিজেদের দৃষ্টি সংযত রেখে প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত রাখতে পারে।

যে নারী দৃষ্টি কাড়তে পারে না সে কিভাবে হৃদয় কাড়বে?

মহিলাদের স্বামীদের জন্য সাজসজ্জা করা ইসলামে পছন্দনীয় বিষয়—

আমরা বেশিরভাগ সময় দেখি নারীরা সারাদিন কাজ শেষে এতোটাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে, সন্ধ্যা হতেই মানসিক ও শারীরিক অবসাদ তাকে ঘিরে ধরে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে, বাচ্চা ও স্বামীর জন্য নাশতা তৈরি করা, বাচ্চাদের খাবার খাওয়ানো, তাদের তৈরি করে স্কুলে পাঠানো, তারপর পরিষ্কার পচ্ছিন্নতার কাজ, দুপুরের আগেই সম্পন্ন করা এবং দুপুরের খাবার তৈরি করা যেন বাচ্চারা ঘরে ফিরেই খাবার খেতে পারে। মোটকথা কাজের এক বিরাট ফিরিস্তি তৈরি হয়। বাচ্চাদের ফেরার পরও বিভিন্ন কাজের ফিরিস্তি তৈরি হয়। যদি দুপুরের পর কিছু সময় মিলে যায় তবে তো আরাম করা যায়। তা না হলে সন্ধ্যায় আবার কাজ শুরু হয়ে যায়। স্বামীর ঘরে ফেরার সময় হয়ে যায়। আর কাজও শেষ করা যায় না।

এমন অবস্থায় স্বামী যখন ঘরে ফিরে আসে আর ঘরের চারদিকে সবকিছু এলোমেলো অবস্থায় থাকে। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো আঁসবাবপত্র, খেলাধুলার সরঞ্জাম দেখে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। বাচ্চাদের চিৎকার, চৈঁচামেচি তাকে আরো বেশি অস্থির করে তুলে। কিচেন ফেরত বেগমের অবিন্যস্ত, এলোমেলো পোশাক, চুল ও ক্লান্ত শ্রান্ত চেহারা দেখে গোবেচারা স্বামী আরো বেশি বিগড়ে যায়। সে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে চায়। কিন্তু বেগমের এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তাকে বাধা দেয়। পরিণামে স্বামীর মন চায় এই অবস্থা থেকে ভিন্ন পথ খুঁজতে। কোথাও দূরে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, যেখানে বাচ্চাদের চৈঁচামেচি, কারো অসন্তুষ্ট চেহারা নিজেকে দেখতে হবে না। বরং হাসিমুখে তাকে কেউ স্বাগত জানাবে, একটি স্বাচ্ছন্দময় পরিবেশে যেখানে চায়ের পেয়ালায় গরম ধোঁয়া ওঠবে, একটু শান্তির পরশ মিলবে; কিন্তু এসব কিছু এখানে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বেচারা স্বামী অল্পতেই রেগে ওঠেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি পরিশ্রম ও কষ্ট করেন এবং অধিক দায়িত্বপ্রায়নও হন। ঘরের কাজে যদি তাদের মন লাগে তবে ঘর আর ঘর থাকবে না। নারীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু নারীরা বলুন তো! আপনার শরীরের কোনো হক কি আপনার একার রয়েছে? আপনার স্বামীর কোনো হক কি আপনার ওপর নেই? আপনি স্বামীর জন্য রূপ চর্চা কেন করবেন না? স্বামীর জন্য রূপ সজ্জা করা ইসলামে পছন্দনীয় কাজ। হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধ থেকে ফেরত হয়ে আমরা বাড়িতে ফিরছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমাদের বললেন, এখন অপেক্ষা কর, রাতে তোমরা তোমাদের বাড়িতে যাবে। যে মহিলা এখনো মাথায় চুল বিন্যাস করেনি সে যেন চুল বিন্যাস করতে পারে, আর যে নারীর স্বামী অনুপস্থিত ছিল সে যেন নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার সুযোগ পায়।^{৬৪}

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের এতো বেশি খেয়াল রাখতেন যেন অজ্ঞাতসারে অবিন্যস্ত চুল, ময়লা কাপড় নিয়ে তারা

স্বামীদের সামনে না আসে। এই কারণে গোসল করে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হয়ে সাজগোজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। যাতে করে স্বামীদের মনে বিরাগ বা অসন্তোষের কোন কারণ সৃষ্টি না হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলারা নিজের স্বামীদের জন্য সাজ সজ্জার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, নিচের ঘটনার মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একবার হযরত আয়েশা রা. উসমান ইবনে মাযউনের বিবিকে দেখলেন, সে সময়ে সাধারণত মহিলারা যে সাজ সজ্জা করতেন তেমন কিছু তিনি করেননি। তিনি সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলেন, উসমান কি কোথাও সফরে গিয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ খ:৬, পৃ:১০৬) অর্থাৎ হযরত আয়েশা রা. হযরত উসমানের বিবিকে সব ধরনের সাজ-সজ্জার উপকরণে সুসজ্জিত দেখেননি তাই তিনি এটা বুঝতে দেরি করেননি যে, হযরত উসমান ইবনে মাযউন কোথাও বাইরে গেছেন, তিনি ঘরে উপস্থিত নেই। মেয়েদেরকে স্বামীর মনোরঞ্জনের প্রতি, তার স্বাস্থ্যের, বাসস্থানের, পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। সারা দিনের কাজের সময়-সূচি এমনভাবে বিন্যাস করা উচিত যে, স্বামী ঘরে আসার আগেই সব কাজ সমাধা হয়ে যাবে। যদি সামান্য কিছু বাকি থাকে তাতে কোন সমস্যা নেই। এ কাজটুকু পরে সেরে নিলেই হবে। আপনি ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তৈরি থাকবেন। সকালে বের হওয়া সারাদিনের ক্লান্ত-শ্রান্ত স্বামীকে ঘরে আসার পর তাকে সুন্দর একটি পরিবেশ দিতে হবে। তাকে হাসিমুখে স্বাগত জানাতে হবে। আপনার হাসিমুখ দেখে এমনিতেই তার সারা দিনের ক্লান্তি অর্ধেক ভুলে যাবে। তার সাথে মিষ্টি কথা বলবে। সারা দিনের পরিশ্রমের ফিরিস্তি তাকে শোনাবেন না। আপনার পরিশ্রমের কথা তিনি ভালো করেই জানেন। তিনি আপনার পরিশ্রমের মনে মনে তারিফ করেন। তবে কিছু পুরুষ প্রশংসার ব্যাপারে কার্পণ্য করে থাকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি আপনার খেদমতের কর্তা স্বীকার করেন না। যদি পুরুষেরাও নিজেদের বিবিদের পরিশ্রম, জীবনের জন্য তাদের ত্যাগের কথা এবং ঈমানদারী ও ধৈর্যের দিলখোলা প্রশংসা করেন তবে স্বামীদের জন্য বিবিদের মুহাব্বতের শক্তি বাড়াতে টনিকের মতো কাজ করবে।

হযরত আলী রা. এর সাথে আল্লাহর বিশেষ কুদরতের নিদর্শন

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা রা. বলেন, হযরত আলী রা. শীতকালে মাত্র একটি লুঙ্গি এবং একটি চাদর গায়ে দিয়ে বাইরে বেরুতেন। এ দুটি কাপড়ই ছিল পাতলা। পক্ষান্তরে গরমের সময় অনেক মোটা কাপড় ও জুব্বা পরিধান করে বাইরে বেরুতেন। লোকেরা আমাকে বলল, আপনার বাবা রাতে হযরত আলী রা. এর সাথে কথা বলেন, আপনি আপনার বাবাকে বলবেন, তিনি হযরত আলী রা. এর সাথে এই ব্যাপারে কথা বলেন। আমি আমার বাবাকে বললাম, “লোকেরা আমিরুল মুমিনের এক কাজ দেখেছে, তাতে তারা বিস্মিত”। আমার বাবা বললেন, সে বিষয়টি কী? তিনি কঠিন গরমের মধ্যেও জুব্বা ও মোটা কাপড় পরে বাইরে বের হন, গরমের কোনো পরওয়া করেন না। এমনভাবে তিনি ঠাণ্ডা থেকে বেঁচে থাকারও কোন চেষ্টা করেন না। আপনি কি তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনেছেন? লোকেরা আমাকে বলল, আপনি রাতে যখন তাঁর সাথে কথা বলবেন এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন।

রাতে যখন আমার বাবা হযরত আলী রা. এর সাক্ষাতে গেলেন, তাঁকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! লোকেরা আপনার কাছে একটি বিষয়ে জানতে চায়। হযরত আলী রা. বললেন, সে বিষয়টি কী? আমার বাবা বললেন, আপনি কঠিন গরমের মধ্যেও তুলাবিশিষ্ট জুব্বা এবং মোটা কাপড় পরিধান করে বাইরে বের হন। পক্ষান্তরে কনকনে শীতের সময়ে মাত্র দুটি পাতলা কাপড় পরে বাইরে বের হন। আপনি না ঠাণ্ডার কোনো পরওয়া করেন না তা থেকে বেঁচে থাকার কোনো চেষ্টা করেন। হযরত আলী রা. বলেন, হে আবু লায়লা! আপনি খায়বার যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে ছিলেন না? আমার বাবা বললেন, আল্লাহর কসম আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম।

হযরত আলী রা. বললেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে হযরত আবু বকর রা. কে পাঠালেন, তিনি সবাইকে নিয়ে দুর্গে আক্রমণ করলেন। কিন্তু দুর্গ জয় করতে পারলেন না। তিনি ফিরে এলেন। এমন সময় রাসূল সা. বললেন, আমি এমন মানুষকে বাণ্ডা দিব যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অনেক বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করবেন এবং সে পলায়নপর মনোবৃত্তিরও নয়। তাই রাসূল সা. আমাকে ডেকে পাঠালেন, আমি হযূরের দরবারে উপস্থিত হলাম। আমার চোখে

ব্যথা অনুভব করছিলাম। আমি কিছু দেখতে পারছিলাম না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার চোখে তাঁর থুথু লাগিয়ে দিলেন। এই দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ঠাণ্ডা ও গরম থেকে হেফাজত কর। তারপর থেকে আমার কখনও ঠাণ্ডা বা গরম অনুভব হয়নি। আবু নাঈম র. এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সা. তার উভয় হাতের তালুতে থুথু লাগিয়ে আমার চোখে বুলিয়ে দেন এবং এই দু'আ করেন, হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে গরম ও ঠাণ্ডা থেকে হেফাজত কর। ওই সত্তার কসম যিনি রাসূল সা. কে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ঠাণ্ডা বা গরমে আমি কখনও কষ্ট পাইনি।

তাবরানী র. বর্ণনা করেন, হযরত সুয়াইদ বিন গাফলাহ রা. বলেন, শীতকালে হযরত আলী রা. এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি শুধু দুটি কাপড় পরে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি আমাদের এলাকা থেকে ধোকা খাবেন না। আমাদের এলাকা আপনার এলাকার মতো নয়। এখানে কঠিন শীত পড়ে। হযরত আলী রা. বললেন, আমার খুব সর্দি লেগে থাকতো। যখন হুযূর সা. আমাকে খায়বার পাঠাতে চাইলেন, আমি বললাম আমার চোখে ব্যথা অনুভব করছি। তিনি আমার চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন। তারপর থেকে আমার না কখনও গরম লেগেছে না ঠাণ্ডা লেগেছে। আর না কখনও চোখ ব্যথা করেছে।

মৃত্যু আসা যতটা নিশ্চিত মানুষ তা থেকে ততটাই গাফেল

ইবনে আবী হাতিমে রয়েছে, এক আনসারীর মৃত্যু শয্যায় মালাকুল মওতকে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মালাকুল মওত তুমি আমার সাহাবীর সাথে সহজ ব্যবহার কর। মালাকুল মওত উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার মন শান্ত রাখুন, অন্তর খুশি রাখুন, আল্লাহর কসম আমি নিজে ঈমানদারের সাথে অনেক নরম ব্যবহার করে থাকি। হে আল্লাহর রাসূল! শুনে রাখুন আল্লাহ তা'য়ালার কসম, গোটা দুনিয়ার সব কাঁচা পাকা ঘর, চাই তা ঙ্গ, শোক বা হুঁলে প্রতিদিন আমি পাঁচবার করে প্রদক্ষিণ করি। প্রত্যেক ছোট বা বড়কে আমি তেমনভাবে জানি, তারা নিজেদেরকে যেভাবে জানে না। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন, আমি তো একটি মশার জান নেওয়ারও ক্ষমতা রাখি না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম করেন।

হযরত জাফর র. বলেন, মালকুল মওত প্রত্যেক মানুষকে পাঁচবার খুঁজে বেড়ানোর অর্থ হচ্ছে, ফেরেশতা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় তাকে দেখে নেয়। যদি সে নামাযের যথাযথ হেফাজত করে তবে ফেরেশতা তার কাছাকাছি থাকে এবং শয়তান দূরে থাকে। তার শেষ সময়ে ফেরেশতা তাকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” মনে করিয়ে দেয়। মুজাহিদ র. বলেন, প্রতিদিন প্রত্যেক ঘরে মালকুল মওত দু’বার করে আসে। কা’ব আহবার রা. তার সাথে এ কথাও বলেন, প্রত্যেক দরজায় অবস্থান করে প্রতিদিন সাতবার দৃষ্টি ফেরায়। তিনি দেখেন তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার আত্মা বের করার হুকুম হয়েছে।^{৬৫}

নিজের ইবাদতের ওপর গর্ব করা উচিত নয়

ইমাম হাকিম শহিদ মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত জাবির রা. সহিহ সনদের সাথে এক দীর্ঘ রেওয়াত বর্ণনা করেন, এই হাদীসটিকে ইমাম মুনির র. আত তারাগিব ওয়া আততারহিবে উল্লেখ করেছেন, আরবি টেক্সট (Text) অনেক লম্বা। তাই এর সার সংক্ষেপ এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

হযরত জাবির রা. বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন, তিনি বললেন, এখনই আমার বন্ধু হযরত জিবরিল আ. তাশরিফ এনেছেন এবং আমাকে বলেছেন, পূর্বের উম্মতের মধ্যে আল্লাহর এক বান্দা নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, সব কিছু ত্যাগ করে সমুদ্রের মাঝে পাহাড় সদৃশ এক টিলাতে চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে একান্তে ইবাদতে মগ্ন হয়। ওই সমুদ্র এতো বিশাল ছিল যে ওই টিলার চারদিক থেকে চার হাজার ফরসখ দূরত্বে সমুদ্রের সীমানা ছিল। সেখানে খাবারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আর সমুদ্রের পানিও যথেষ্ট লবণাক্ত ছিল। আল্লাহ তা’য়ালা নিজের অনুগ্রহে সেখানে একটি আনারের গাছ সৃষ্টি করলেন এবং আঙ্গুল পরিমাণ মিষ্টি পানির একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করলেন। এই আবেদ দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা ইবাদতের মধ্যেই অতিবাহিত করত। চব্বিশ ঘণ্টায় একবার শুধু একটি

আনার খেয়ে নিতো এবং মিষ্টি পানি থেকে একগ্লাস পরিমাণ পানি পান করতো। এভাবেই তার পাঁচশ বছর শেষ হয়ে যায়।

পাঁচশ বছর পর এই আবেদের মৃত্যুর সময় এসে যায়। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই দু'আ করেন, সেজদারত অবস্থায় যেন তার রুহ কবজ করা হয় এবং তার লাশ যেন মাটি ইত্যাদির ওপর হারাম করে দেওয়া হয়। কেয়ামত পর্যন্ত সেজদারত অবস্থায় তাকে ঠিক রাখা হয়। আল্লাহ তা'য়ালার এই দু'আ কবুল করেন। সেজদা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা'য়ালার সেখানে এমন ব্যবস্থা করলেন, কেয়ামত পর্যন্ত সেখানে কোন মানুষের পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়।

কেয়ামতের দিন সেই আবেদকে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেশতাদের বলবেন, আমার এই বান্দাকে আমার অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। ঐ আবেদ তখন বলবে, হে আমার রব! বরং আমাকে আমার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ তা'য়ালার বলবেন, তার আমল, আর তাকে দেওয়া আমার নেয়ামত পরিমাপ কর। পরিমাপ করার পর দেখা যাবে আল্লাহ তা'য়ালার তাকে শুধু যে দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন তার বিনিময়েই পাঁচশ বছরের আমল শেষ হয়ে যায়। তা ছাড়া তার সারা শরীরের আরো যে সব নেয়ামত রয়েছে কান, বাকশক্তি, হাত, নাক, পা, অন্তর, মেধা এইসব নেয়ামতের বদলা বাকি থেকে যায়। তা ছাড়াও আল্লাহ তা'য়ালার পাঁচশ বছর পর্যন্ত তাকে যে মিঠা পানি ও আনারের ব্যবস্থা করলেন এসব নেয়ামতের বদলা তো বাকিই রয়ে গেল। আল্লাহ তা'য়ালার তখন বলবেন, তার পাঁচশ বছরের ইবাদত তো শুধুমাত্র এক নেয়ামতের পরিবর্তেই শেষ হয়ে গেছে। আমার বাকি সব নেয়ামতের বদলা কী হবে? এখন তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও। ফেরেশতা তাকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যেতে থাকবে। সে শুধু চিৎকার করে বলতে থাকবে হে আমার রব! আপনি আপনার রহমতের বিনিময়ে আমাকে জান্নাতে দাখিল করুন। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে, তুমি তোমার পাঁচশো বছরের ইবাদতের অনেক গর্ব করে ছিল। এখন তোমার ইবাদত গেল কোথায়? বিশাল সমুদ্রের মাঝে আমি তোমাকে আনার খাওয়ালাম, পাঁচশ বছর পর্যন্ত মিঠা পানি পান করিয়েছি, আমার এই সব নেয়ামতের বদলা তুমি কি দিয়েছো? সে তখন বলবে, হে আল্লাহ! তুমি নিজের রহমতে আমাকে

জান্নাতে দাখিল করো। তোমার রহমত ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়। পরিশেষে যখন তার বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপন শেষ হবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, আমার রহমতে তাকে জান্নাতে দাখিল করো। অবশেষে সে আল্লাহর রহমতেই জান্নাতে দাখিল হবে।

অনর্থক কথাবার্তা থেকে দূরে থাকা উচিত

‘আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে সে অনর্থক কথাবার্তা বর্জন করবে।’

যদি কেউ ভালো মুসলমান হতে চায়, তবে সে অহেতুক কাজ থেকে দূরে থাকবে। অনর্থক কাজের অর্থ হচ্ছে, বেশি বেশি কথা বলা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঘোরাফেরা করা, হোটেলে সময় কাটানো ইত্যাদি সব কিছু এর অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানকে এসব থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। যে ব্যক্তি নিরর্থক কথা বা কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে সে নিজের দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরে পড়ে, মানুষের দৃষ্টিতে সে নীচ হয়ে যায়, সমাজে তার কোনো সম্মান, মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না।

তাওয়াক্কুলের হাকিকত

“ইসলাম ও সন্তান প্রতিপালন” নামে একটি কিতাব রয়েছে। এই বইয়ে হযরত উমর রা. এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত উমর রা. এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়েছেন, যারা কোন কাজ করতো না। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কেমন লোক? তারা জবাব দিলো আমরা হচ্ছি তাওয়াক্কুলকারী সম্প্রদায়। হযরত উমর রা. বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। তাওয়াক্কুলকারী হচ্ছে তারা যারা নিজেদের জমিনে বীজ বুনার পর আল্লাহর ওপর ভরসা করে। আরো বললেন, তোমাদের কেউ যেন কাজ থেকে হাত গুটিয়ে এই দু'আ না করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে রিযিক দান করো। কারণ, সে জানে আসমান থেকে সোনা, রূপা বর্ষণ হয় না।

হযরত উমর রা. ঐ বুয়ুর্গ যিনি গরীব, অসহায়দেরকে এই বিষয় থেকে বাঁধা দিয়েছেন তারা যেন কাজ-কর্ম ছেড়ে মানুষের দান-সদকার ওপর ভরসা

না করে। তাই তিনি বলেছেন, হে গরীব-দুঃখীরা তোমরা ভালো কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো। মুসলমানদের ওপর বোঝা হইও না।^{৬৬}

হযরত কাতাদাহ রা. রাসূল সা. থেকে তিনটি জিনিস চেয়েছেন

তার চোখের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ কুদরতের নিদর্শন—

বায়হাকী ও ইবনে ইসহাক র. বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধে হযরত কাতাদাহ বিন নোমান রা. এর চোখে তীর লেগেছিল। ফলে চোখ বের হয়ে চেহারায় বেরিয়ে পড়েছিলো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত কাতাদাহ রা. কে বললেন, যদি তুমি চাও এই চোখ ভালো হয়ে যাক, তবে আমি এই চোখকে তার জায়গায় রেখে দিবো। সেটি ভালো হয়ে যাবে। আর যদি তুমি জান্নাতের কামনা করো তবে ধৈর্য ধরো। হযরত কাতাদাহ রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! জান্নাত তো অনেক বড় নেয়ামত ও পুরস্কার। কিন্তু আমার অন্ধ হয়ে থাকা খারাপ লাগে। আপনি আমার চোখ ভালো করে দিন পাশাপাশি জান্নাতের জন্যও দু'আ করুন। তিনি তার চোখের গোলক তুলে তা বৃত্তের মধ্যে স্থাপন করলেন। এই চোখের আলো অপর চোখ থেকেও ভালো হয়ে গেল। আর তার জন্য জান্নাতেরও দু'আ করলেন।

ভিন্ন এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত কাতাদাহ নিজের চোখের পুতুলি হাতে নিয়ে হযূরের দরবারে হাজির হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি ধৈর্য ধারণ করলে তোমার জন্য জান্নাত। আর চাইলে চোখকে তার স্থানে রেখে তোমার জন্য দু'আ করব। হযরত কাতাদাহ রা. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক বিবি রয়েছে যাকে আমি খুব ভালোবাসি। আমার ভয় হচ্ছে আমি যদি অন্ধ থাকি তবে আমার বিবি আমাকে অপছন্দ করবে। রাসূল সা. নিজের পবিত্র হাতে চোখকে তার স্থানে স্থাপন করলেন। আর দু'আ করলেন হে আল্লাহ তুমি তাঁর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দাও।^{৬৭}

^{৬৬} ইসলাম ও সন্তান প্রতিপালন ২/৩৪৩।

^{৬৭} আলইসাবা খ:৩, পৃ:২২৫।

হযরত কাতাদাহ রা. বলেন, উভ্দের দিন রাসূল সা. এর চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দুশমনের সামনে নিজেকে মুখোমুখি করলাম। যাতে করে দুশমনদের তীর আমার চেহারায় আঘাত করে এবং রাসূল সা. এর চেহারা নিরাপদ থাকে। দুশমনের শেষ তীর আমার চোখে এমনভাবে লেগেছে যে, চোখের গোলক বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। আমি চোখকে নিজ হাতে নিয়ে হৃষুরের দরবারে হাজির হলাম। রাসূল সা. এই দৃশ্য দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন। আমার জন্য এই দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! যেভাবে কাতাদাহ তোমার নবীর চেহারাকে হেফাজত করেছে সেভাবে তুমি তাঁর চেহারাকে হেফাজত কর। তাঁর এই চোখকে অপর চোখ থেকেও অধিক দৃষ্টিক্ষমতা সম্পন্ন করে দাও। তিনি চোখকে তার স্থানে স্থাপন করলেন। ওই সময়ই চোখ ঠিক আগের চেয়েও আরো ভালো হয়ে গেল। (তাবরানী, আবু নাসিম ও দারকুতনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

শিশুদের সাথে রাসূল সা. এর ব্যবহার

এ বিষয়টি প্রায়ই হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও কাসির ইবনে আব্বাসকে ডেকে তাদের বলতেন, বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে যে দৌড়ে সবার আগে আমার হাত ধরতে পারবে আমি তাকে এই জিনিস দেব। তিন ভাই দৌড়ে তাঁর কাছে যেতেন। তিনি সবাইকে সিনার সাথে মিলাতেন। খুব আদর করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে এই দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! তাকে তোমার কিতাবের জ্ঞান ও দীনের বুদ্ধি দান কর। (রাসূলের পঞ্চাশজন সাহাবা, হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস স্মরণিকা পৃ: ৪৬২)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু উপদেশ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, একদিন আমি হযরতের পেছনে সওয়ারিতে বসে ছিলাম। রাসূল সা. আমাকে বললেন, হে বৎস!

(১) তুমি আল্লাহর হুক হেফাজত করবে, আল্লাহ তোমার হুক হেফাজত করবে। তুমি সব সময় আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে।

(২) যখন তুমি কিছু চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে।

(৩) তুমি সাহায্য চাইলে আল্লাহর কাছেই চাইবে।

(৪) এ কথাটি ভালো করে বুঝে নাও গোটা দুনিয়ার মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করতে চাইলেও তিনি ছাড়া আর কেউ উপকার করতে পারবে না। তিনি তোমার ভাগ্যে যা লিখেছেন তাই হবে।

(৫) আর সবাই মিলে তোমার ক্ষতি করতে চাইলেও তিনি ছাড়া আর কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তোমার ভাগ্যে যা লিখেছেন তাই হবে।^{৬৮}

এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে পাঁচটি বিষয়ে নসিহত করেছেন।

(১) আল্লাহর হুকুম হেফাজত করো।

তুমি আল্লাহর হকের হেফাজত করবে, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, তুমি আল্লাহর আহকাম পালন করো, তোমার নামায, রোযা, যাকাত, দান-সদকা, চাল চলন, কথাবার্তা, সামাজিক চলাফেরা প্রতিটি কাজে তুমি আল্লাহর বিধান ও নবীর আদর্শ মেনে চলবে। তবে আল্লাহ তা'য়ালার দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিটি বিপদে, পেরেশানীতে তোমাকে সাহায্য ও হেফাজত করবেন। তুমি শরিয়তের পাবন্দ হলে আল্লাহ তা'য়ালাকে সব সময় তুমি নিজের সামনে পাবে। আল্লাহ যখন সব সময় তোমার পাশে থাকবে তুমি আর কারো কাছে মুখাপেক্ষি থাকবে না। আল্লাহর ক্ষমতা তোমার সাথে থাকলে তোমাকে কেউ কি ক্ষতি করতে পারবে? মাখলুক থেকে কোন আশাও নেই, তার থেকে কোন ভয়ও নেই।

(২) একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো।

দ্বিতীয় নসিহত যা তিনি করেছেন, যখন তোমার কোন প্রয়োজন হবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। আল্লাহ তা'য়ালার সম্পদের ভাণ্ডার এতো বেশি প্রশস্ত যে, মানুষের চিন্তা শক্তি ও বুদ্ধি থমকে যাবে। যদি আল্লাহ তা'য়ালার সবাইকে তাদের চাহিদা ও প্রত্যাশামাফিক সবকিছু দিয়ে দেন তবে তার সম্পদের ভাণ্ডার থেকে এই পরিমাণও কমবে না যতটুকু সমুদ্রে সুঁইয়ের আগা পরিমাণ পানি উত্তোলন করলে যা হয়। ওই সম্পদশালী ব্যক্তিও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে, তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছো

অপরদিকে আল্লাহ তার হৃদয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন সে অস্থির হয়ে তোমার কাছে সম্পদ নিয়ে চলে আসে। যদি তুমি তা গ্রহণ করে নাও তবে সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। তুমিও আল্লাহর দরবারে প্রিয়, আর তার সম্পদও আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। তুমি তাকওয়া অর্জন করেছো আর তার সম্পদ এক মুত্তাকির কাছে পৌঁছে গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি মুমিন ছাড়া আর কাউকে নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের খাবার থেকে মুত্তাকি ছাড়া আর কেউ যেন না খায়। অতএব তোমার বন্ধুও যেন পরিপূর্ণ হয় এবং তোমার মেহমানও যেন মুত্তাকি হয়।^{৬৯}

(৩) শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও

তৃতীয় নসিহতে রাসূল সা. বলেছেন, যখন তুমি কোনো বিপদে, মুসিবতে আক্রান্ত হবে। পেরেশানী, অসুস্থতা বা শত্রুর কবলে পড়বে, চতুর্দিক থেকে তুমি কষ্টের স্বীকার হবে এমন অবস্থায় তোমার সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তা'য়াল। তাই শুধু তার কাছে প্রার্থনা করবে, সাহায্য চাইবে।

(৪) মাখলুক তোমার কোন উপকারই করতে পারে না।

চতুর্থ নসিহত ছিল— যদি দুনিয়ার সমস্ত উম্মত মিলে তোমাকে কোনো উপকার করতে চায় তবে তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত উপকার থেকে এক পয়সা বেশি উপকার করতে পারবে না। তাই মাখলুক থেকে বেশি উপকারের আশা করবে না। এটা হচ্ছে অহেতুক চিন্তা ভাবনা। তোমার নিজের জন্য নিজের চেষ্টা করতে হবে। তোমার জন্য নির্ধারিত বিষয় তুমি পাবেই। সব সময় আল্লাহর স্মরণ তোমার মধ্যে জাগ্রত থাকা উচিত।

(৫) মাখলুক তোমাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

পঞ্চম নসিহতে রাসূল সা. এই করেছেন, দুনিয়ার সব মানুষ যদি এই বিষয়ে একমত হয় যে, তোমার ক্ষতি করবে তবে তোমার তাকদিরে নির্ধারিত পরিমাণ থেকে এতটুকু বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। কারো ক্ষমতা নেই যে, তোমার উপকার বা ক্ষতি করবে। এ কারণে একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করো এবং আল্লাহর দিকেই মুখাপেক্ষি হও।

ইমাম বুখারী র. এবং বুখারা আমিরের কাহিনী

ইমাম বুখারী র. সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি দেশ সফর করে নিশাপুর যাচ্ছিলেন। নিশাপুরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহালী র. শিক্ষার্থীদের বললেন, আমি ইমাম বুখারী র. কে স্বাগত জানাতে যাবো যার মনে চায় সে চলো। এই ঘোষণার পর নিশাপুর থেকে দু তিন মাইল দূর থেকে গিয়ে লোকেরা ইমাম বুখারী র. কে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হলেন। নিশাপুরে উপস্থিত হয়ে ইমাম বুখারী র. যখন হাদীসের দরস শুরু করলেন, কয়েক হাজার ছাত্র তাঁর দরসে উপস্থিত হতে শুরু করল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই কেউ একজন কুরআন মাখলুক কি না এই প্রশ্নে সৃষ্ট বিতর্ক উত্থাপন করে ইমাম বুখারীকে অভিযুক্ত করলেন। আবার দ্রুত তাঁর দরসে হাদীসের হালকা শেষ হয়ে গেল। শুধু ইমাম মুসলিম র. তার সাথে ছিলেন। অবশেষে ইমাম বুখারী র. নিরাশ হয়ে নিজ দেশ বুখারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। নিশাপুর থেকে ইমাম বুখারী র. বুখারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করছেন। এই সংবাদ যখন বুখারাবাসী জানতে পারল তারা অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তাঁকে স্বাগত জানালো। বুখারায় এসে ইমাম বুখারী র. দরসে হাদীসের খেদমত শুরু করলেন। হাজারো ছাত্র তাঁর দরসে উপস্থিত হতে শুরু করল। কিন্তু হিংসুকেরা এটা সহ্য করতে পারল না। তারা এই লক্ষ্যে একটি ফন্দি আঁটল যে কোনো উপায়ে আমিরে বুখারা খালিদ বিন আহমদ যুহালীকে এ ব্যাপারে উদ্ধুদ্ধ করা হবে যেন তিনি বুখারী র. কে এই নির্দেশ দান করেন যে, আমিরের সন্তানদেরকে তিনি বুখারী শরীফ এবং দরসে কাবির পড়াবেন। আমিরে বুখারার মাথায় এই বোধ আসার পর তিনি ইমাম বুখারী র. কে এই অনুরোধ করলেন, যেন তিনি শাহী দরবারে এসে আমির ও তাঁর সাহেবজাদাদেরকে বুখারী শরীফ ও তারিখে কাবির পড়াবেন। ইমাম বুখারী র. ওই দূতকেই এই সংবাদ দিয়ে পাঠালেন, আমি ইলমে দীনকে সুলতান, বাদশাহদের দরোজায় নিয়ে গিয়ে অপমানিত করতে পারি না। যার পড়ার ইচ্ছা রয়েছে সে আমার কাছে এসে পড়বে।

আমিরে বুখারা দ্বিতীয়বার এই বলে দূত পাঠালেন, যদি আপনার আসতে অসুবিধা হয় তবে সাহেবজাদাদের জন্য এমন একটি সময় নির্ধারণ করে দিন যে সময় অন্য কেউ তাদের সাথে থাকবে না। এই প্রস্তাবের জবাবে ইমাম বুখারী র. জানালেন, রাসূলের হাদীসসমূহ সমস্ত

উম্মতের জন্য সমান। এই হাদীস শোনা থেকে আমি কাউকে বঞ্চিত করতে পারবো না। যদি আমার উত্তর আপনার মনোপুত না হয় তবে আপনি আমার দরস বন্ধের হুকুম দিন যাতে আমি আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে উজর পেশ করতে পারি। এই কারণে আমি বুখারা ইমামের ওপর কঠিন রাগান্বিত হলেন। হিংসুকেরা আমার ইশারায় ইমামকে বদদীন, বেদাআতি হওয়ার অভিযোগ আরোপ করল। তারপর গভর্নর তাঁকে বুখারা থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। ইমাম বুখারী র. অনেক কষ্ট নিয়ে এই বিরুদ্ধবাদীদের জন্য বদদোয়া করলেন। হে আল্লাহ! যেভাবে এই আমীর আমাকে অপমানিত করেছে এমনভাবে তাকেও তার নিজের, পরিবারের, সন্তানদের অপমান, অসম্মান দেখিয়ে দিও।^{৭০}

এই দু'আর এক মাসও অতিবাহিত হয়নি খলিফাতুল মুসলিমিন ওই আমার কোনো কাজে যথেষ্ট রাগান্বিত হয়ে তাকে পদচ্যুত করেন। উপরন্তু তার মুখ কালি দিয়ে মেখে গাধার ওপর চড়িয়ে সারা বুখারা শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে তাকে অপমানিত করা হয়। এই আমার সহযোগীরা বিভিন্ন বিপদে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। আজ গোটা উম্মত এই দৃশ্য দেখছে যে, বুখারা, সমরকন্দ ইত্যাদি যেসব এলাকা উলামায়ে দীনের প্রাণকেন্দ্র ছিল সেখানে উলামায়ে দ্বীনের সাথে অকৃতজ্ঞ আচরণের ফলে আজকে সে সব এলাকা থেকে ইলমে দীন ও আলেমদেরকে এমনভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছে যে, শতাব্দী কাল ধরে সেখানে কালিমা চর্চা বা শেখানোর কোন ব্যবস্থা আজকে নেই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার গজব এবং তোমার প্রিয় বান্দাদের অসম্ভ্রুতি থেকে হেফাজত করো।

মাওলানা রুমী র. এর বাবা ও বাদশাহর ঘটনা

মাওলানা রুমী র. এর বাবা সে সময়ের একজন প্রখ্যাত বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সে সময়ের বাদশাহ তার খেদমতে উপস্থিত হতেন। বাদশাহ যখন দেখলেন মজলিসের অবস্থা বিস্ময়কর, প্রধানমন্ত্রীও সেখানে উপস্থিত, তাছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীবর্গও সেখানে উপস্থিত এবং রাজ্যের বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও সেখানে উপস্থিত। অপরদিকে তাকিয়ে দেখেন, বড়

^{৭০} নাসরুল বারী ১:৪৪, ফাতহুল বারী পাকিস্তানী সংস্করণ, পৃ:৪৯৩।

বড় ব্যবসায়ীরাও সেখানে উপস্থিত। আরেক দিকে তাকিয়ে দেখেন, আলেম ও বুয়ুর্গ ব্যক্তিরাজ সেখানে উপবিষ্ট আছেন। বাদশাহ এই অবস্থা দেখে বিস্মিত হলেন, আমার দরবারে তো এতো মানুষ আসে না। অথচ তাঁর দরবারে লোকজন এতটা ভক্তি, মুহাব্বত সহকারে বসে আছে যে প্রত্যেকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুহাব্বত টপকে পড়ছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব যেন প্রত্যেককে মহাবিষ্ট করে রেখেছে। কিছুক্ষণ বসার পর বাদশাহ মনে বিস্ময়ের পরিবর্তে অস্বস্তি শুরু হল। বাদশাহ মনে মনে এই চিন্তা করল তাঁকে বিত্ত বৈভবের ফাঁদে আটকে দিতে হবে। এই ভেবে তিনি ওই বুয়ুর্গের কাছে ধনভাণ্ডারের চাবি পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, সবকিছু আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, আমার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ধনভাণ্ডারের চাবিও আপনার খেদমতেই আছে। রুমী র. এর বাবা এই বলে চাবি ফেরত পাঠালেন। আজ বুধবার, আজকের দিন পর্যন্ত আমাকে সুযোগ দিন। আগামী পরশু জুমআর দিন। জুমআর নামায পড়ে আপনার শহর ত্যাগ করে আমি চলে যাব। সব ধন-সম্পদ আপনার জন্য কল্যাণকর হোক। এই সংবাদ মানুষের মাঝে হাওয়ার গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর মন্ত্রিবর্গ পদত্যাগ করতে শুরু করল। প্রথমে একজনের, তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে পদত্যাগ পত্র জমা পড়তে শুরু করল। যখন হযরত এখান থেকে চলে যাচ্ছেন আমরাও চলে যাব। বাদশাহ নিজে বুয়ুর্গের দরবারে হাজির হয়ে ক্ষমা চাইলেন। হুজুর আমার বেয়াদবী হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি এখান থেকে চলে যাবেন না। রুমী র. এর বাবা সকল কাজে রাসূলের সা. এর মুহাব্বতে সবকিছু বিসর্জন দিতেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালার প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে তাঁর মুহাব্বত ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার তাঁকে কামেল বুয়ুর্গ বানিয়েছেন। “যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম” এই বাণীর বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটছিলো।

হুসাইন রা. এর হত্যাকারী উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পরিণতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়নের মনি হযরত হুসাইন রা. ও তাঁর আহলে বাইতকে হত্যাকারীদের প্রধান নেতা উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পরিণতি ওই যুগের মানুষেরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে। ইবরাহিম

ইবনে আশতার তাকে ও তার সঙ্গীদের মাথা কেটে একটি মসজিদের চত্বরে মুলা ও গাজরের স্তূপের মতো জমা করে রেখেছিলেন।

তিরমিযী শরীফে হযরত আম্মারাহ বিন উমাইর রা. থেকে একটি রেওয়ায়েত আছে, তিনি বলেন, যখন উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও তার সাথীদের কল্লা কেটে মসজিদের চত্বরে স্তূপীকৃত করা হয়, সে দৃশ্য দেখার জন্য মানুষের বিরাট ভিড় জমে যায়। আমিও সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর দেখলাম, একটু পর পর মানুষের মধ্যে একটি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এই আওয়াজটি ছিল যে, ওই মাথাগুলোতে একটি সাপ ঘুরছিলো এবং ঘুরতে ঘুরতে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নাকে ঢুকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ তার নাকের মধ্যে অবস্থান করে বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। কিছুক্ষণ পর এসে আবার তার নাকে ঢুকে যেত। আমি নিজ চোখে এই দৃশ্য দু তিনবার দেখেছি।

(তিরমিযী শরীফ: ২/২১৮, আলবিদায়া ওয়াননেহায়া: খ:৮, পৃ:২৮১)

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলীর সাথে বেয়াদবী করেছে তার পরিণতি দুনিয়াতেই মানুষ দেখতে পেয়েছে। আখেরাতে তার সাথে কি হবে তা আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন।

হুসনের সাথে হযরত সা'দ রা. এর বিবাহ

হযরত সা'দ রা. এক নওজোয়ান, মান্যবর সাহাবী ছিলেন। সীরাতের কিতাব সমূহে তাঁর ঘটনা অনেক চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আনাস রা. এর বর্ণনায় ইমাম ইজযুদ্দিন র. উসদুল গাবা কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই বিস্তারিত বিবরণের সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। হযরত সা'দ আসআদ রা. অত্যন্ত কালো ও অসুন্দর আকৃতির ছিলেন। তিনি নিজের বিবাহের জন্য মদিনার প্রতিটি গোত্রে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তিনি বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বেশি কালো ও অসুন্দর হওয়ার কারণে কেউ তার কাছে নিজের মেয়েকে বিবাহ দিতে রাজি হননি। হযরত সা'দ রা. রাসূলের সা. কাছে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কালো রং ও অসুন্দর আকৃতি কি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ থেকে বাঁধা সৃষ্টি করবে? হযর সা. তাঁকে বললেন, যখন তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছ, তাকওয়া ও পরহেজগারীর রাস্তা অবলম্বন করেছ। এমনটি কখনো হবে না, বরং আল্লাহর

কাছে তোমার মর্যাদা অনেক বেশি উন্নত। হযরত সা'দ কালিমা পড়ে নিজের ঈমানের প্রমাণ পেশ করলেন। তারপর রাসূল সা. এর কাছে নিজের পেরেশানীর কথা পেশ করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! যারা আপনার মজলিসে উপস্থিত হয় এবং যারা হয় না উভয় প্রকারের লোকের কাছে আমি বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেছি। কিন্তু আমার অসুন্দর আকৃতির জন্য কেউ আমার কাছে তার মেয়ে বিয়ে দিতে সম্মতি প্রকাশ করেনি। হযূর সা. তাঁর জন্য মদিনার সর্বাধিক ভদ্র, সম্মানিত ও বুদ্ধিমতি, বিদুষী মেয়ে নির্বাচন করলেন।

হযূর সা. তাঁকে বললেন, তুমি উমাইর ইবনে ওয়াহাব সাকাফির কাছে যাও। তার সবচেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিতা ও বিদুষী মেয়ের সাথে আমি তোমার বিবাহ সম্পাদন করেছি। তুমি উমাইর ইবনে সাকাফীকে আমার পয়গাম শুনাবে যে আমি তার মেয়ের সাথে তোমার বিবাহ সম্পাদন করেছি।

যখন হযরত সা'দ আসওয়াদ রা. মেয়ের মা বাবাকে এই পয়গাম শুনালেন, তারা তা মানতে অস্বীকার করলো এবং প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল। মেয়ে যখন এই দৃশ্য দেখল সে মা বাবাকে বলল, না জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে ওহী নাযিল হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেছেন। ওই মেয়েরও ঈমানের পরিপূর্ণতার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সে বাহ্যিক রূপ দেখেনি, হৃদয়ের সৌন্দর্য দেখেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্ভ্রষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছে। এই মেয়ের মা বাবা যখন রাসূলের সা. দরবারে হাজির হলেন, হযূর তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার পাঠানো ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিয়েছ? তারা নিজেরা লজ্জিত হলো এবং তাওবা করল। তারা বলল, আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল সে কোনো মিথ্যা কথা বলল কি না। আমরা তো আপনার অনুগত, আমরা তাঁকে আমাদের মেয়ে সম্পাদন করছি। তাই মা ও বাবা নিজেদের আদরের সন্তানকে হযরত সা'দ আসআদের সোপর্দ করে দিল। মেয়ে খুশি হয়ে তার মা-বাবাকে বলেছিল, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো সিদ্ধান্ত দেন তখন কারো এতে কোনো পরিবর্তনের অধিকার থাকে না। তারপর মেয়ে এই আয়াত পাঠ করল-

“কোনো মুমিন নারী বা পুরুষের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর তাতে পরিবর্তনের কোনো অধিকার নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল সে সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত”।

তারপর হযরত সা'দ আসওয়াদ বিয়ের জন্য কেনাকাটা করতে বাজারে যান। হঠাৎ তখন যুদ্ধের আহ্বান আসে, তিনি বিবাহের আসবাব কেনার পরিবর্তে সেই অর্থে তরবারি, তীর, ঘোড়া ইত্যাদি কিনে যুদ্ধে শরিক হয়ে লড়াই করতে করতে শাহাদাত লাভ করেন। হযূর (সা.) তাঁর মুবারক মাথা নিজের কোলে রাখেন। তাঁর কেনা তরবারি, ঘোড়া ইত্যাদি তাঁর বিবির কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁর শশুর বাড়ির লোকদের কাছে এই সংবাদ দিয়ে পাঠান যে, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মেয়ের চেয়ে আরো অনেক সুন্দরী মেয়ের সাথে আখেরাতে তাঁর বিবাহ সম্পাদন করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বাহ্যিক রূপ দেখেন না, বরং তিনি ভেতরের সৌন্দর্য ও অন্তরের পবিত্রতা দেখেন। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত সা'দকে উঁচু স্থান দিয়েছেন।^{৭১}

বেনামাযীর অকল্যাণ

এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি কাশফের অধিকারী ছিলেন। একবার তার খাবারের দস্তরখানে কোনো এক মেঘবান খাবার রেখে গেছে। খাবার ছিল রুটি। এই রুটি দু'জন মহিলা তৈরি করেছেন। যখন বুয়ুর্গ ব্যক্তি খাবারের উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেন তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন। রুটিগুলোকে দু' ভাগে আলাদা করলেন। এক অংশের দিকে ইশারা করে বললেন, যিনি এই রুটি তৈরি করেছেন তিনি বেনামাযী।

মায়ের সাথে বেয়াদবীর শাস্তি

ইমাম বুখারী র. কিতাবুল মুফরাদে আলোচনা করেছেন, এক কবরস্থানের একটি কবর মাগরিবের পর ফেটে যেত। কবর থেকে একটি লোক বের হত যার মাথা ছিল গাধার মাথার মত। গাধার মত চিৎকার করে কিছুক্ষণ পর সে কবরে চলে যেত। লোকেরা তার ব্যাপারে জানতে চাইল তার সাথে এমন আচরণ কেন হচ্ছে। তার উত্তরে জানা গেল, এই লোক মদ পান করত। যখন তার মা তাকে শাসন করত সে বলত তুমি কেন গাধার মত চিৎকার করছ।

ফায়েদা: মায়ের সাথে আদব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। হাদীসে এসেছে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত। বাবা হচ্ছে জান্নাতের দরজা।

^{৭১} উসদুল গাবা: খ:২, পৃ:১৮৪।

বাহাদুর ইমাম বখশের ঘটনা

এক বুয়ুর্গ তাঁর পাশের এক কবরস্থানে গেলেন। তিনি সেখানে ফাতেহা পাঠ করলেন। তারপর সামনে অগ্রসর হলেন। একটু সামনে তিনি একটি জীর্ণ-শীর্ণ কবর দেখতে পেলেন। কবর যেন বলছে, হযরত! আমাদেরকেও কিছু হাদিয়া-তোহফা দিন। আমরা অনেক অভাবী। বুয়ুর্গ ব্যক্তিটি ওই কবরের সামনে এলেন। তিনি সেখানে কিছু পাঠ করলেন। হঠাৎ তিনি একটি লেখা দেখতে পেলেন। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন, রক্তস্ফুটে হিন্দ ইমাম বখশ। তিনি সেই প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন, রাজা মহারাজারা যাকে হাতি দিয়ে ডেকে পাঠাতেন। তাকে গালিচা দিয়ে বসতে দিতেন। আজকে এক আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

চেঙ্গিস খান এবং সেকান্দরের কবর কোথায়?

ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে, চেঙ্গিস খান যখন ইনতিকাল করেন, তিনি সাথীদেরকে এই ওসিয়ত করেন, আমি যখন মারা যাব আমাকে ওমুক গাছের নিচে দাফন দিবে। তিনি মারা যাওয়ার পর সেই গাছের নিচে তাকে দাফন করা হয়। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় দিন বৃষ্টি শুরু হয়। ছয় মাস পর্যন্ত এই বৃষ্টি অব্যাহত থাকে। সে স্থান জঙ্গলে রূপ নেয়। আর সেই গাছটি অন্য গাছের সাথে মিলে যায়। মানুষ বুঝতে পারে না চেঙ্গিস খানকে কোন গাছের নিচে দাফন করা হয়েছে। সেই জালিম কওম যারা একই সময়ে বিশ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, যারা তিন দিন পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করত না। পিপাসা লাগলে ঘোড়ার পিঠে খঞ্জর মেরে পাত্রে রক্ত ভরে তা পান করে পানির পিপাসা মেটাতো। আজ তাদের নেতার কবরের কোনো নিশানা নেই।

মাওলানা কারী তায়্যিব র. খুতুবাতে হাকিমুল ইসলামে লিখেছেন, মহান সেকান্দরের কবর ইরাকের বাবেলের একটি গণকবরে রয়েছে। যখন কোনো পর্যটক সেখানে যায় গাইড কিছু কবরের দিকে ইশারা করে বলে, এই কবরগুলোর কোনো একটিতে সেকান্দরের সমাধী রয়েছে।

ফায়েদা: যে মানুষটি দুনিয়া জয় করেছে, আজ তার সমাধী চিহ্নিত করাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এ কারণে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, সে তার ঈমান ও আমলের উন্নতির চিন্তা করবে। ফলে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে সে এতই প্রিয় হবে যে, মানুষ তার জন্য দু'আ করবে।

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী র. এর নূরানী দিকনির্দেশনা

(১) ইলমের চাহিদা হচ্ছে আমল। যদি তুমি ইলম অনুযায়ী আমল করতে তবে দুনিয়া থেকে দূরে সরে যেতে। কারণ, ইলমের মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই যা দুনিয়ার ভালোবাসাকে প্রমাণ করে।

(২) আলেম যদি দুনিয়াবিমুখ না হয় তবে সে সমকালীন মানুষের ওপর আযাব।

(৩) মুমিন নিজের পরিবারকে আল্লাহর ওপর হাওলা করে দেয়। মুনাফিক সম্পদের ওপর ভরসা করে।

(৪) নিজের মুসিবত, বিপদ আপদকে গোপন রাখো আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য অর্জন হবে।

(৫) উত্তম আমল হচ্ছে মানুষকে দান করা, মানুষ থেকে নেয়া নয়।

(৬) যালিম নিজের যুলুমের মাধ্যমে মযলুমের দুনিয়া ধ্বংস করে আর নিজের আখেরাত ধ্বংস করে।

(৭) যে রিযিকের প্রতি শুকরিয়া থাকবে না, যে অভাবের ওপর ধৈর্য থাকবে না তা ফেতনা।

(৮) যার কোনো মুসিবত বা কষ্ট হয়নি তাতে কোনো গৌরব নেই।

(৯) মিসকিন, অসহায়দের অসম্ভব রেখে আল্লাহকে সম্ভব রাখা সম্ভব না।

(১০) আমি এমন মাশায়েখদের সাহচর্যে ছিলাম তাদের কারো সাদা দাত দেখার সুযোগ আমার হয়নি।

(১১) দুনিয়াদার দুনিয়ার পেছনে ছুটে, আল্লাহওয়ালাদের পেছনে দুনিয়া ছুটে।

রাসূল সা. এর নির্দেশের ওপর আমল করার ফলাফল

যে মানুষ দীনের ব্যাপারে বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়ায় সে বিভ্রান্ত হয়। আর যে ব্যক্তি রাসূলের সা. নির্দেশের ওপর আমল করে আল্লাহ তা'য়ালার তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতে সমৃদ্ধ করে দেন। হযরত আলী রা. হাদীস বর্ণনা করেন, একবার রাতে রাসূলের সা. সাক্ষাত হয়। রাসূল সা. প্রশ্ন করেন, হে আলী! এতো রাতে বাইরে কি করছ? হযরত আলী জবাবে বললেন, হযরত ক্ষুধার জ্বালায় ঘর থেকে বের হয়েছি। ঘুম আসছে না।

কিছুদূর এগিয়ে দেখলেন, কিছু সাহাবী বসে আছেন। তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করলেন, তারাও একই কথা বললেন। সামনে একটি খেজুরের গাছ ছিল। শীতের মওসুম অথচ শীত মওসুমে খেজুর আসে না। রাসূল সা. আলী রা. কে বললেন, হে আলী! এই গাছকে বলো, আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন আমাদের খেজুর খাওয়াও।

হযরত আলী রা. গাছের কাছে গেলেন এবং বললেন, “হে গাছ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের খেজুর খাওয়াতে। হাদীসে এসেছে, তৎক্ষণাৎ গাছের পাতা থেকে খেজুর ঝরতে থাকলো। হযরত আলী রা. আঁচল ভরে রাসূল সা. এর খেদমতে পেশ করলেন।

কুরআনের ওপর আমলকারী এবং বিমুখ ব্যক্তির পরিণাম

হযরত উমর রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সা. ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ তা’য়ালা এই কিতাবের মাধ্যমে অনেক কওমকে উপরে তুলেছেন, আরেক কওমকে তার ওপর আমল না করার কারণে নিচে নামিয়েছেন।

ইতিহাস সাক্ষী যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান কুরআনের পবিত্র শিক্ষা ও নববী আদর্শের আলোকে জীবন পরিচালনা করেছে, আল্লাহ তা’য়ালা মুসলমানদের এমন উন্নতি ও বিজয় দান করেছেন যার উদাহরণ পেশ করতে পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি অক্ষম। আর আজ মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে।

‘হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, হে লোকেরা! সতর্ক হয়ে যাও। অতি শীঘ্রই এক বড় ফেতনা আসছে। হযরত আলী রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা.! ওই ফেতনা থেকে মুক্তির কী উপায় আছে? তিনি বললেন, তা থেকে মুক্তির মাধ্যম হচ্ছে কুরআন কারিম। এই কুরআনে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের আলোচনা আছে। তোমাদের পরে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিষয় ও অবস্থার বিবরণ তাতে রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক লেনদেনের সমাধান তাতে রয়েছে। কুরআন হচ্ছে সত্য ও মিথ্যা পার্থক্যকারী একটি কিতাব। তাতে কোনো কথাই হাসি বা ঠাট্টাস্থলে বলা হয়নি। যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কুরআনকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা’য়ালা তাকে ধ্বংস করে দেন। তার ঘাড় ভেঙ্গে রাখেন। যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুতে

হেদায়াত তালাশ করে তাকে গোমরাহীতে নিপতিত করেন। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর মজবুত রশি। আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণকারী কিতাব। হিকমত ও প্রজ্ঞা দানকারী কিতাব। এটিই হচ্ছে সরল পথ। এটি এমন এক কিতাব যার অনুসরণ প্রবৃত্তিকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারে না। তার ভাষা অন্য কোনো ভাষার সাথে তুলনীয় হতে পারে না। তার জ্ঞান থেকে জ্ঞানীরা কখনো তৃষ্ণা নিবারণ করে শেষ করতে পারে না। তার অধিক ব্যবহারে তা কখনো পুরনো হয় না। তার অলৌলিকতা কখনো শেষ হয় না। কুরআন এমন কালাম যখন জ্বিনরা তা শুনল তারা নির্দিধায় বলল, আমরা এক বিস্ময়কর কালাম শুনেছি। যা হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করে। তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ যে কোনো বক্তব্য মেনে নেয়া যায়। যে কুরআন অনুযায়ী আমল করে তাকে অনেক উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে। আর যে কুরআন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিল সে ন্যায়বিচার করল। যে কুরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান করে তাকে সরল পথের তাওফিক দেওয়া হয়।’

এই হাদীস গভীরভাবে ভাবলে এ কথা বুঝা যায়, হেদায়েতের সমস্ত সৌন্দর্য কুরআনে নিহিত রয়েছে। যেহেতু কুরআনে হেদায়েতের সমস্ত সৌন্দর্য আছে তাই যে ব্যক্তি নিজের জীবনের জন্য কুরআনকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করবে এবং কুরআনকে নিজের জীবনে ব্যবহারিক পস্থা হিসেবে মেনে নিবে, কোনো ফেতনা তার অনিষ্ট করতে পারবে না। এই হাদীসে কুরআনের বিশটি সৌন্দর্য উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত আলের উপস্থাপন করছি।

(১) কুরআনে কারিমে অতীত ও পূর্ববর্তি উম্মতের ভালোমন্দ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তাতে রয়েছে হযরত আদম আ. এর পুত্রদ্বয় কাবিল ও হাবিলের ঘটনা। হযরত ইদরিস আ. এর ঘটনার বিবরণ। হযরত নূহ আ. ও তাঁর উম্মতের কাহিনী। হযরত হুদ আ. ও তাঁর কওমের ঘটনা। হযরত সামুদ আ. ও তাঁর কওমের অবস্থা। হযরত ইউনুস আ. এর ঘটনা। হযরত আইয়ুব আ. এর ঘটনা। হযরত ইসমাইল আ., হযরত ইসহাক আ., হযরত ইয়াকুব আ., হযরত ইউসুফ আ., আযিযে মিসরের ঘটনা। হযরত মুসা আ. ও ফেরআউনের ঘটনা। হযরত দাউদ আ. ও হযরত সুলাইমান আ. এর ঘটনা। হযরত মুসা আ. এবং খিযিরের

ঘটনা। আসহাবে কাহাফ ও যুলকারনাইনের ঘটনা। হযরত মরিয়ম ও হযরত ঈসা আ. এর ঘটনা। কারুন, হামান, শাদাদ এবং জালিম রাজা বাদশাহদের ঘটনা।

মোটকথা প্রত্যেক জাতির ভালো-মন্দ সব ধরনের অসংখ্য লোকের কাহিনী কুরআন মাজিদে আলোচিত হয়েছে। যে আলোচনা পড়ে ও শুনে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে। কোথাও কাফের ও মুসলমানদের কাহিনী এবং নিজের কুদরতের আলোচনা করে উল্লেখ করেছেন, ‘নিঃসন্দেহে এই আলোচনায় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা’। -সূরা নূর, আয়াত: ৪৪।

আরেক স্থানে ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইদের আলোচনা করে উল্লেখ করেছেন, “নিশ্চয়ই তাদের ঘটনাবলীতে রয়েছে বিবেকবানদের জন্য শিক্ষা।”

আরেক স্থানে মুসা আ. ও ফেরআউনের আলোচনা করে বলেছেন, “নিশ্চয়ই এই আলোচনায় শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা ভয় পায়”।

(২) কুরআনে কারিমে তোমাদের পরবর্তী সব ঘটনা, কেয়ামতের নিদর্শনসমূহ ও তার অবস্থার আলোচনা করা হয়েছে। হিসাব, নিকাশ এবং জান্নাত, জাহান্নামের আলোচনা এসেছে। এইসব আলোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের আমলসমূহ সংশোধন করবে।

(৩) কুরআনে কারিমের মধ্যে তোমাদের পরস্পরের আচরণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পুরো কুরআনে কারিমে ৬,৬৬৬ টি আয়াত রয়েছে। তার মধ্যে ৫০০ আয়াত বিধি-বিধান ও ফায়সালা সম্পর্কিত। কিছু উলামায়ে কেরাম এই পাঁচশত আয়াতের আলাদা তাফসির লিখেছেন। যেমন বাদশাহ আলমগিরের উস্তাদ মোল্লা জিযুন র. এর “তাফসিরাতে আহমাদিয়া”। এই পাঁচশত আয়াত ছাড়া ৬১৬৬ টি আয়াতে পেছনের উম্মতের অবস্থা ও ঘটনা, কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নামের ওয়াদা এবং ভয়ের কথা। যা থেকে মানুষ শিক্ষা অর্জন করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর করবে।

(৪) কুরআনে কারিম হক ও বাতিলের মাঝে ফায়সালাকারী ও স্বতন্ত্র সৃষ্টিকারী কিতাব। সূরায়ে তারিকে আল্লাহ তা’য়ালা বললেন, কুরআনে কারীম হক ও বাতিল এবং সত্য, মিথ্যার মাঝে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী।

(৫) কুরআনে কারিমে কোনো ঠাট্টা, মশকরা বা নিরর্থক আলোচনা নেই। কুরআনের সব বক্তব্য হচ্ছে অকাট্য সত্য। সূরায়ে তারিকে আল্লাহ তা'য়ালা এই বক্তব্যকে প্রমাণ করেছেন। ‘এটা কোনো ঠাট্টা, উপহাস নয়’।

—সূরায়ে তারিক, আয়াত: ১৩।

(৬) যে ব্যক্তি অহংকার ও গর্বের কারণে কুরআন বর্জন করে, তার ওপর ঈমান আনে না এবং তার নির্দেশনার ভিত্তিতে আমল করে না। আল্লাহ তা'য়ালা এমন ব্যক্তিকে চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিনাশের মধ্যে নিপতিত করবেন। তার গর্দান ভেঙ্গে দেন, নিজের রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেন। সে শয়তানের সাথী বনে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানকে তার জন্যে নিযুক্ত করেন। সে কখনো শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। এমন লোকদের বিবেক বিকৃত হয়ে যায়। তাদের কাছে ভালো-মন্দের কোনো পার্থক্য থাকে না। এই বক্তব্যকে আল্লাহ তা'য়ালা সূরায়ে যুখরুফের এই আয়াতে আলোচনা করেছেন। “যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে তার ওপর আমরা এক শয়তান নিযুক্ত করে দিব। তারপর সে শয়তানের সঙ্গী হিসাবেই থাকবে।” অর্থাৎ শয়তানই তার শিক্ষক হিসাবে থাকবে, সে যা বলবে তাই সে করবে।

—সূরা যুখরুফ: আয়াত: ৩৬।

(৭) যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কিছু থেকে হেদায়াত তালাশ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে গোমরাহীতে নিপতিত করবেন, সে হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। তার একটি জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যার মানুষ বুয়ুর্গদের মাযারে গিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য কামনা করে। সেখানে গিয়ে কপাল ঠেকায়। আবার অনেকে কল্লিত মাযার বানিয়ে নিজেদের রুজি-রুটির ব্যবস্থা করেছে। এক শ্রেণীর লোক এইসব মাযারেও নিজেদেরকে ফাঁসিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে এইসব মাযারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে কিছু না দিলে রাস্তায় যে কোন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। গাড়ি খারাপ হয়ে যেতে পারে। এ কারণেই ইমাম বুখারী র. ‘শয়তান ও তার সৈন্যবাহিনীর বিবরণ অধ্যায়’ নামে একটি অধ্যায় নামকরণ করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি মানুষ ও শয়তানের আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা বুখারী শরিফে “সৃষ্টির সূচনা” শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। (প্রথম খণ্ড পৃ:৪৬২)

(৮) কুরআনে কারিম আল্লাহ তা'য়ালার শক্তিশালী রশি। আল্লাহ ও তার বান্দাদের মাঝে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরির মাধ্যম। কুরআনের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালার কুরআনে কারিমে বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর রশিকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরো। পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”

(৯) কুরআন আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করার মাধ্যম। তাতে রয়েছে অনেক ভালো উপদেশাবলী। আল্লাহ তা'য়ালার বলেন, “আপনি ভালো উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ করাতে থাকুন। কারণ তা মুমিনদেরকে উপকৃত করে। (সূরা যারিয়াত: আয়াত: ৫৫)

(১০) কুরআনে কারিম মানুষকে সরল ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে। সব ধরনের বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা থেকে রাখে মুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরাতুল মুস্তাকিমের একটি উদাহরণ পেশ করেছেন— তিনি একটি লম্বা রেখা টানলেন। তার ডান ও বামে অনেক রেখা টানলেন। তিনি বললেন, এ সব রেখা হচ্ছে গোমরাহী ও শয়তানের রাস্তা। যে এসব রাস্তায় পা রাখবে সে গোমরাহীতে নিপতিত হবে। আর যে এ সব রাস্তা থেকে বেঁচে থাকবে সে সোজা পথে চলবে। আর বরাবর লম্বা যে রেখাটি টানলেন সে সম্পর্কে বললেন, এটাই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম। এই সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর তোমরা অবিচল থাকো। কিছু বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে, কুরআন ও হাদীস মোতাবেক পরিচালিত পথই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম। এই পথেই হযরত সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশিদিন, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিন সবাই অবিচল ছিলেন। আর এই পথের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার, প্রসারের জন্যেই ইসলামী মাদরাসাসমূহ প্রতিষ্ঠা হয়। এই মাদরাসাসমূহে কুরআন, হাদীস ও ফেকাহের যে তালিম দেয়া হয় তাই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম অনুসৃত পথ।

(১১) যে ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষার ওপর অটল থাকবে, প্রবৃত্তি তাকে যতই কষ্ট দিক, গোমরাহীর যত পথই তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করুক, শয়তান এবং গোমরাহ লোক তাকে নিজেদের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, কুরআন তাকে পথচ্যুত ও বিভ্রান্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে। চারদিক থেকে সব রাস্তায় জট সৃষ্টি করবে। বাধ্যগতভাবে সোজা পথে চলতে বাধ্য করবে।

(১২) দুনিয়ার কোনো ভাষা কুরআনের ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আরবের বাসিন্দারা যদিও আরবি ভাষায় কথা বলে তবুও কুরআনের বচনভঙ্গি, কুরআনের পরিভাষা এবং কুরআনের সাহিত্য ও বাকরীতি তাদের ভাষার কোনো বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তারা তাদের কথাবার্তায় কুরআনের একটি আয়াতের সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো বাক্য তৈরি করতে অক্ষম। যখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল সে সময় আরবের বড় বড় কবি, বাগ্গি ও সাহিত্যিকদের প্রভাব ছিল। তারা অনেক চেষ্টা করেছিল কুরআনের ক্ষুদ্র একটি আয়াতের অনুরূপ কোনো বাক্য তৈরি করতে। কিন্তু সবাই এই চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বুঝতে পারে কুরআন কোনো মানুষের রচিত কালাম নয়। এ কারণেই কোনো ভাষাই কুরআনের সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

(১৩) কুরআনের জ্ঞান থেকে কখনো আলেমদের তৃপ্তি অর্জন হয় না। কুরআন নিয়ে যত ভাবনা করা হোক তার রহস্য ততই বাড়তে থাকে এবং তাদের পিপাসাও বাড়তে থাকে। তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আজ পনেরো'শ বছর ধরে উলামায়ে কেরাম কুরআনের রহস্য ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে গভীরভাবে নিয়োজিত। হাজার, লাখ ও কোটি সংখ্যায় কিতাব লেখা হয়েছে তবুও কুরআনের জ্ঞান ও তার রহস্যের হাজার ভাগের এক ভাগও উন্মোচিত করা যায়নি এবং কখনো যাবেও না।

আল্লামা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. এর ঘটনা। যখন তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে মৃত্যু শয্যায় শায়িত এবং পেটের পীড়া শুরু হয়ে গেল। তাকে খুব ঘন ঘন বাথরুমে যেতে হত। ফলে তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কিতাব অধ্যয়ন করতে পারছিলেন না। তাই তিনি নিজের বিশেষ প্রিয় ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়ুমকে বললেন, যখন আমি বাইতুল খালাতে প্রবেশ করব তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং জোরে জোরে পড়তে থাকবে যেন আমি ভিতরে বসে আওয়াজ শুনতে পারি। তিনি তেমনই আলেম ছিলেন যাকে সে যুগের 'জ্ঞানের পাহাড়' অভিধায় ডাকা হতো। তার রচনার সংখ্যা শত শত। তিনি নিজের যুগে যে পরিমাণ ফতোয়া লিখেছেন তা সে সময় ছাপা হয়েছিল। প্রতিটি খণ্ড কত পৃষ্ঠা সম্বলিত ছিল। তার ফতোয়া মোট ৩৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন অনুমান করুন তিনি কত বড় মাপের আলেম ছিলেন। কিন্তু তবুও কুরআনের জ্ঞান থেকে পরিতৃপ্তি ও পিপাসা নিবারণ করতে পারেননি।

(১৪) কুরআন বার বার পড়ার কারণে পুরনো হয় না। দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস অধিক ব্যবহারের কারণে পুরনো হয়। কিন্তু কুরআন পুরনো হওয়ার পরিবর্তে আরো সজিব হয়। প্রতি মুহূর্তে তাতে নতুন বৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হয়।

(১৫) কুরআনের রহস্য ও আশ্চর্য ক্ষমতা কখনো শেষ হয় না। কোনো মানুষই কুরআনের রহস্য ও হেকমতের সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়। সূরায় লোকমানে আল্লাহ তা'য়ালা এই বিষয়েকে এভাবে বলেছেন, “যদি পৃথিবীর সব গাছকে কলম বানিয়ে দেয়া হয়, সব সমুদ্রের পানিকে কালি বানিয়ে দেয়া হয়, তার সাথে আরো সাত সমুদ্র পরিমাণ কালি মিলানো হয় তবুও আল্লাহর প্রশংসা শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা অনেক পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। -সূরা লোকমান: আয়াত ২৭।

(১৬) বুখারী, মুসলিম, তিরমিযীতে একটি লম্বা হাদীসে মূল বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম পূর্ব যুগ থেকেই শয়তানরা আসমানে গিয়ে সেখানের কথাবার্তা নিয়ে গণকদের জানিয়ে দিত। তারপর গণকরা তাতে আরো বাড়িয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করত। এই গণকরা যেসব ভবিষ্যদ্বানী করত তার অনেক কথাই বাস্তবে প্রকাশ পেত। এ কারণে গণকদের পয়গম্বরের সমান মর্যাদা দেওয়া হত। যখন আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল সা. কে পয়গম্বর হিসাবে পাঠালেন, কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা শুরু হল তখন শয়তানদের জন্যে আসমানে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা শুরু হল। যখন শয়তানরা আসমানের কাছাকাছি পৌঁছত আসমানের হেফাজতে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড তথা আসমানী তীর মেরে নিচে ফেলে দিত। শয়তান ও জ্বিনেরা পরস্পরে পরামর্শ করল দুনিয়াতে সম্ভবত কোনো নতুন বিষয় প্রকাশ পাবে। যার কারণে আসমানে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে জ্বিনরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হল গোটা পৃথিবীতে আমরা খোঁজ লাগাব যেন আমরা জানতে পারি সে বিষয়টি কি যার জন্যে আমাদেরকে আসমানে যেতে কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি দেশ ও প্রদেশে জিনদের একটি করে টহল দল পাঠানো হলো যাতে তারা রহস্য উন্মোচন করতে পারে। এদিকে পবিত্র হিজাযে মক্কা মোকাররমা থেকে উত্তরে মদিনা পর্যন্ত ‘উকায’ নামে একটি স্থান রয়েছে। জাহিলী যুগে নির্দিষ্ট দিনে সেখানে মেলা বসত। চতুর্দিক থেকে আরব গোত্রের লোকেরা এই মেলায় উপস্থিত হত। সে সময় রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সাহাবীদের নিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে রওয়ানা করলেন। এই মেলায় পৌঁছার আগেই একটি খেজুর বাগানে রাসূল সা. বিশ্রাম নিলেন। সেখানে রাতে অবস্থান করে সকালে ফজর নামাযের সময় উচ্চ আওয়াজে কেরাআত পড়া শুরু করলেন। তখন জ্বিনদের একটি দল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা রাসূলের সা. কেরাআত শুনে থেমে গেল। তারা বলাবলি করল এটাই হচ্ছে সেই বিষয় যার কারণে আমাদেরকে আসমানে যেতে বাঁধা দেওয়া হয়। আর তখনই জ্বিনদের সে দল ঈমান গ্রহণ করে। তারা নিজেদের কওমের কাছে গিয়ে বলে, “নিঃসন্দেহে আমরা এক আশ্চর্য কিতাব শুনেছি, তা হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করে। তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রভুর সাথে শরিক সাব্যস্ত করব না।”

(বুখারি শরীফ: খ:১, পৃ:১০৬, হাদীস ৭৬৪, খ:২, পৃ:৭৩২, হাদীস ৭৪৩১)

(১৭) যে ব্যক্তি কুরআনের মত কথা বলবে তা মিথ্যা সাব্যস্ত করা যাবে না, বরং তা সত্যায়ন করতে হবে।

(১৮) যে ব্যক্তি কুরআনের ওপর আমল করবে তাকে অনেক সাওয়াব ও পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

(১৮) যে ব্যক্তি কুরআনের বিধান মোতাবেক মানুষের মাঝে ফায়সালা করবে সে কখনো বে ইনসাফি করবে না, বরং সত্য ও ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবে।

(১৯) যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে এবং তার বিধি বিধানের ওপর আমলের দাওয়াত দিবে সে সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর চলার তাওফিক পাবে। যাকে দাওয়াত দিবে সেও সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর চলতে সক্ষম হবে। (মিরকাত: পৃ:৩৫৬-৩৫৯)।

হযরত আয়েশা রা. দান করতেন এবং দু’আও করতেন

উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর কাছে কোনো সাহায্যপ্রার্থী এলে তিনি তাকে দু’আ করতেন এবং কিছু দানও করতেন। তাঁকে কেউ প্রশ্ন করল, হে উম্মুল মু’মিনীন আপনি কেউ কিছু চাইলে তাকে দানও করেন আবার দু’আও করেন। তিনি বললেন, আমি যদি দু’আ না করে শুধু দান করি তবে আমার প্রতি তার ইহসান বেশি হয়ে যাবে। কারণ

দু'আ দান থেকে কতইনা উত্তম। এ কারণে দু'আর প্রতিদান দু'আর মাধ্যমেই করি। যাতে করে আমার দান খালেস দান হয় কোনো ইহসানের প্রতিদান না হয়।

মহিলাদের দুর্বলতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আমি মেরাজে যাই আমাকে জান্নাত, জাহান্নাম দেখানো হয়। আমি দেখি জাহান্নামে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাদের অধিকাংশ মহিলা। তিনি ইরশাদ করেন, মহিলাদের মধ্যে দুটি ত্রুটি বেশি করে পাওয়া যায়। যার কারণে তারা অধিক সংখ্যায় জাহান্নামে যাবে।

(১) বেশি করে লা'নতের বাক্য মুখ থেকে বের হওয়া।

জাহান্নামে যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে, মহিলারা সাধারণ কোনো কথাও মুখ থেকে লা'নতের শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। যেমন, দুধপানকারী বাচ্চাকেও যদি সে মেযাজের বিপরীত কোন আচরণ করে তবে তাকেও বলে তুই মরিস না কেন? আর লা'নতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুখ থেকে এই শব্দ বের হলে তা নিষ্ফল হয় না, বরং নিশ্চিতভাবে তার প্রভাব দেখা দেয়। যাকে লা'নত দেয়া হয় সে যদি প্রকৃতই লা'নতের উপযুক্ত হয় তবে তার ওপর লা'নত পড়ে যায়। আর যদি সে উপযুক্ত না হয় তবে লা'নত প্রদানকারীর ওপর তা পড়ে। হাদীসে এসেছে, “হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলকে সা. বলতে শুনেছেন, কোনো মানুষ অপর মানুষের প্রতি কোনো অপবাদ বা অভিযোগ আরোপ করলে তা তার দিকেই ফিরে আসবে যদি না অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে এই দোষ থাকে।”^{৭২}

(২) নিজের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

অধিকাংশ নারীদের জাহান্নামে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, স্বামীর সামান্য কথাও নিজের ইচ্ছা বা চাহিদার বিরুদ্ধে গেলে অথবা স্বামী তার কোনো চাওয়া পূরণ করতে না পারলে পেছনের সব ভালো কাজে পানি ঢেলে দিবে। এই পুরুষ কখনো আমার হক আদায় করেনি। আমাকে সব

^{৭২} বুখারি শরীফ: খ:২, পৃ:৮৯৩, হাদীস: ৫৮১০ মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: খ:৫, পৃ: ১৮১।

সময় অপমান করেছে। আমি কখনো তার মধ্যে কোনো ভাল গুণ দেখিনি। আমিই একমাত্র তার কাছে বান্দি হয়ে আছি। এমন সব কথাবার্তা বলবে যা স্বামীর সব ইহসানকে ভুলিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে এ সব কোনো ভাবেই পছন্দ নয়। একটি হাদীস লক্ষ্য করুন, “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম জাহান্নামে অধিকাংশ নারী তাদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং তার ইহসান ভুলে যাওয়ার কারণে হয়েছে। যদি তোমরা তাদেরকে ইহসান কর, তারপর তাদের মর্জির বিরুদ্ধে কোনো বিষয় লক্ষ্য করে তবে সে তোমাকে বলে দিবে তোমার মধ্যে কখনো কোনো ভালো বিষয় লক্ষ্য করিনি।”^{৭৩}

মহিলাদের প্রতি রাসূলের সা. এর নসিহত

একবার ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নামায থেকে ফেরার পর মহিলাদেরকে নসিহত করার জন্যে তাশরিফ নিলেন। সে যুগে মুসলমানদের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল। এ কারণে ইসলামের প্রভাব, মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যে সব ধরনের মহিলাদেরকে ঈদের জামাতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ ছিল। এমনকি হায়েয বা নেফাসযুক্ত মহিলাদেরকেও ঈদের জামাতে নিয়ে যাওয়া হত। যাদের জন্য নামাযে শরিক হওয়া জায়েয নয়। তবে মহিলাদের জন্যে পৃথক নামাযের ব্যবস্থা করা হত। রাসূল সা. মহিলাদের জন্যে নির্ধারিত স্থানে তাশরিফ নিলেন। তিনি তাদেরকে যে নসিহত করলেন তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, “হে নারীরা! আমি তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামে দেখেছি। জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে, তোমরা অধিক পরিমাণে দান-সদকা এবং ইস্তিগফার করবে। কারণ, ইস্তিগফার এবং সাদকা তোমাদের ও জাহান্নামের মাঝে দেয়াল তৈরি করবে।” যখন রাসূল সা. এই আলোচনা পেশ করলেন, এক বুদ্ধিমতি ও চৌকষ মহিলা দাঁড়িয়ে রাসূল সা. কে প্রশ্ন করতে শুরু করল। হে আল্লাহর রাসূল সা. এমন কি বিষয় যার কারণে আমাদের অধিকাংশ নারীরা জাহান্নামী হবে? রাসূল সা. জবাবে বললেন, “দু’টি মন্দ স্বভাবের কারণে যা তোমাদের মধ্যে পাওয়া যায়।”

^{৭৩} বুখারি শরীফ: খ:১, পৃ:৯, হাদীস:২৯।

(১) তোমরা কথায় কথায় লা'নত করে থাক। যদি ছোট বাচ্চা থেকেও মজির বাইরে কোনো কথা প্রকাশ পায় তবুও তোমরা বলে থাক তুই মরিস না কেন? এমন সন্তানের আমার প্রয়োজন নেই।

(২) তোমরা স্বামীদের অকৃতজ্ঞ। যদি চাহিদা মাফিক কোনো বিষয় পূরণ করতে না পারে বা কোনো প্রত্যাশা পূরণ না করে তবে তোমরা বলে থাক এই স্বামী কখনো কোনো ভাল কাজ করেনি। এই দুই বিষয়ের একটিও আল্লাহর কাছে পছন্দ নয়। হে মুসলিম বোনেরা! তোমরা এই চেষ্টা কর যেন তোমাদের থেকে এই ক্রটি দূর হয়ে যায়। তারপর রাসূল সা. বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের মাঝে দু'টি ক্রটি রয়েছে। এক. তোমাদের বুদ্ধির অপরিপক্বতা। এই কারণে আল্লাহ তা'য়ালার কোরআনে কারিমে বলেছেন, দু' জন নারীর স্বাক্ষর একজন পুরুষের স্বাক্ষরের সমান। বুদ্ধির অপরিপূর্ণতার কারণেই এমন বন্ধন। দুই. দীনের বিষয়ে অপরিপূর্ণতা। প্রতি মাসে কিছু দিন এমন রয়েছে যে সময়ে তোমরা রোযা বা নামায আদায় করতে পার না। নামায, রোযা থেকে মাহরুম থাকা দীনের অপূর্ণতার পরিচায়ক।

তিনি আরো বলেন, জ্ঞান ও দীনের অপূর্ণতা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে এমন একটি যোগ্যতা রয়েছে, যা অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। সেটি হচ্ছে, স্বামী যতই বুদ্ধিমান ও চতুর হোক না কেন তোমরা এক বাক্যে তার বিবেক, বুদ্ধি উড়িয়ে দিতে পারো। রাসূলের সা. এই বক্তব্যের পর মহিলাদের মধ্যে কেউ নিজের গলার হার, কেউ হাতের বালা, কেউ পায়ের নুপুর, কেউবা কানের দুলা। মোটকথা যার কাছে যা ছিল সব দিতে শুরু করল। হযরত বেলাল রা. সেগুলো একটি থলেতে ভরতে থাকলেন। এই হাদীস দ্বারা দীনি কাজে চাঁদা সংগ্রহের বিষয়টি রাসূল সা. থেকে প্রমাণিত। হাদীস শরীফে এসেছে, “হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূল সা. ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার জামাতে উপস্থিত হলেন। তারপর মহিলাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, “হে মহিলাদের জামাত! তোমরা বেশি করে সাদকা কর। কারণ আমি তোমাদের বেশি সংখ্যককে জাহান্নামে দেখিছি।” তখন মহিলারা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! এর কারণ কি? তিনি বললেন, “তোমরা বেশি বেশি লা'নত করে থাক। আর স্বামীর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা নেই। দীন ও জ্ঞানের অপরিপক্বতা

সত্ত্বেও পুরুষদের বিবেক, বুদ্ধিকে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের মত দক্ষ আর কাউকে দেখিনি।” মহিলারা বললেন, আমাদের দীন ও জ্ঞানের অপরিপূর্ণতা কি? তিনি বললেন, এক মহিলার সাক্ষ্য প্রদান কি এক পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নয়? এটাই হচ্ছে তার জ্ঞানের অপরিপূর্ণতা। তিনি বললেন, মহিলাদের যখন মাসের নির্দিষ্ট সময়ে রক্তস্রাব হয় তারা নামায পড়তে পারে না, রোযা পালন করতে পারে না। মহিলারা বলল, হ্যাঁ, তারা সে সময়ে তা করতে পারে না। রাসূল সা. বললেন, এটাই হচ্ছে তাদের দীনের অপরিপূর্ণতা।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের শত্রু নয়

মানব সভ্যতার অস্তিত্ব ও মানব বংশের টিকে থাকা নির্ভর করে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সৌহার্দের ভিত্তিতে। এই সম্পর্ক ও সৌহার্দ যত বেশি গভীর ও উষ্ণ হবে তার পরিণতি ও ফলাফল ততই ভালো, কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তা’য়ালা মানুষের স্বভাবকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যখন কোনো কিছুর সাথে তার ভালোবাসা ও হৃদয়তা তৈরী হয় তাকে দেখতে এবং তার পাশাপাশি থাকতে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে যে বিষয়ের প্রতি তার স্বভাবজাত ঘৃণা থাকে সে বিষয়ে সে কষ্ট ও বিরক্তি বোধ করে। আল্লাহ তা’য়ালা যেহেতু এই পৃথিবীর পরিচালনা ও মানব বংশের ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে চান তাই নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ ও চাহিদা, এমনভাবে পুরুষের প্রতি নারীর সহজাত দুর্বলতা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। তাই মানব জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন নারী পুরুষ একে অপরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও প্রয়োজন অনুভব করে। আল্লাহ তা’য়ালা নিজে কুরআনে কারিমে এই প্রয়োজনকে অনেক সুন্দর ভাষা ও হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপন করেছে। আমরা শুধু তা চিন্তা করলে এবং তার দাবিসমূহ পূরণ করার চেষ্টা করলে আমাদের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন এতটাই সুখময় ও স্বস্তিদায়ক হবে যা আমাদের প্রত্যাশিত।

আল্লাহ তা’য়ালা নিজের বান্দাদেরকে বলেন, “তারা তোমাদের পোশাক, আর তোমরা তাদের পোশাক।” এই আয়াতে মহান প্রভু একের প্রতি অপরের প্রয়োজনকে পোশাকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে প্রত্যেক মওসুমে মানুষের কাপড়ের প্রয়োজন হয় এবং তা দ্বারা সাজ-সজ্জা

গ্রহণ করা হয়। এমনভাবে নারী ও পুরুষ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রয়োজন হয়। কেউ কারো অমুখাপেক্ষি নয়। এ কারণেই প্রয়োজন, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য মনে করে জীবন যাপন করা।

কুরআনে কারিমের উল্লিখিত আয়াতে এই বিষয়টিও সুস্পষ্ট, যেভাবে পোশাক মানুষের দেহ থেকে আলাদা থাকে না, সারা জীবনই তার পোশাকের প্রয়োজন হয়। এমনভাবে নারীকে পুরুষের সাথে, পুরুষকে নারীর সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় একে অপরের দোষ-ত্রুটির প্রতি ভ্রক্ষেপ করা যাবে না। কারণ, মুহাব্বতের দৃষ্টি দোষ-ত্রুটি ছাপিয়ে অনেক উর্ধ্ব থাকে। অথচ ঘৃণা বা শত্রুতার দৃষ্টি মন্দ বিষয় খুঁজে বেড়ায়। তাই স্বভাবগতভাবে আল্লাহ তা'য়ালা স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি মুহাব্বত ও সম্প্রীতির আবেগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যাতে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী ও শান্তিময় হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নারীর প্রতি পুরুষের অহেতুক হিদ্রাশেষণ, অসন্তোষ প্রকাশ করা সমীচীন নয়। যদি স্ত্রীর কোনো স্বভাব স্বামীর অপছন্দ হয় তবে আরেকটি স্বভাব বা গুণ তার ভাল লাগতে পারে। (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন, “নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তবে তা ভেঙ্গে যাবে। অতএব তার সাথে ভালো ব্যবহার কর, তবেই সুখী জীবন যাপন করতে পারবে।” (ইবনে হাক্কান)

এ কথা সুবিদিত যে, নারীর সাথে সম্ভাব রাখার জন্য জরুরি হচ্ছে, তার দুর্বলতাসমূহকে দৃষ্টির অগোচরে রাখা। তাকে বেশি গালমন্দ না করা। তার সাথে সুন্দর জীবন যাপনের সম্ভাব্য সব উপায় গ্রহণ করা। যদি এমন সদিচ্ছা নিয়ে তার সাথে জীবন যাপনের চেষ্টা করা হয় তবে আশা করা যায় দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে। কুরআনের এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেভাবে পোশাক মানুষের বাহ্যিক অসঙ্গতি বা ত্রুটিকে ঢেকে রাখে, নারী পুরুষও একে অপরের জন্য পোশাকের মত। তাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হচ্ছে, একে অপরের দোষ, ত্রুটি গোপন রাখবে। একদিকে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল পুরুষদেরকে তাগিদ করেছেন তারা যেন নারীদের সাথে

উত্তম ও সুন্দর আচরণ করে। তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে। পাশাপাশি নারীদের জন্যও কিছু দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন।

প্রতিবেশীর অনিষ্ট থেকে বাঁচার নব্বী প্রেসক্রিপশন

হাদীসে একটি ঘটনা এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলের সা. কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। সে আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। আমি তার মন রক্ষা করে চলার চেষ্টা করেছি। তার তোষামোদী করেছি, কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছে না। সে অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক দিন রাত আমাকে কষ্ট দেওয়ার ফন্দি ফিকির করে। হে আল্লাহর রাসূল সা. আমি কি করতে পারি, আমি তার ব্যাপারে অপারগ হয়ে পড়েছি। রাসূল সা. বললেন, আমি তাদবির বলছি, তুমি ঘরের সব আসবাব পত্র ঘর থেকে বের করে বাইরে রাস্তায় জমা কর। তারপর আসবাব পত্রের ওপর তুমি বসে থাক। যেই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, ভাই ঘর রেখে তুমি বাইরে রাস্তায় কেন বসে আছ? তুমি জবাবে বলবে, ভাই আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। আল্লাহর রাসূল সা. আমাকে ঘর ছেড়ে বাইরে আশ্রয় নিতে বলেছেন। এভাবেই মানুষ তাকে প্রশ্ন করে- ভাই ঘর ছেড়ে বাইরে কেন থাক? রাস্তায় কেন আসবাব পত্র রেখেছো? তিনি উত্তরে বলতেন, ভাই কি করবো; আমার প্রতিবেশী আমাকে অসহনীয় জ্বালাতন করে। তাই আল্লাহর রাসূল আমাকে বলেছেন, ঘর ছেড়ে দিয়ে বাইরে অবস্থান করতে। যে কোনো আগন্তুক আসে এবং এই ঘটনা শুনে সেই লা'নত করে। মদিনায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর লা'নত করা হচ্ছে, লা'নতের তাসবিহ পড়া হচ্ছে।

সেই প্রতিবেশী নির্যাতনকারী এক সময় অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। সে এসে হাতজোড় করে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি বাড়িতে চলো। আমার জীবন তো ধ্বংস হতে চলছে। আমি ওয়াদা করছি, সারা জীবন আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। বরং আমি তোমার খেদমত করব। তখন সে ব্যক্তি বলল তুমি ভালো করে ওয়াদা কর তুমি আমাকে কখনো কষ্ট দিবে না। সে বলল, আমি কসম করে বলছি আমি তোমাকে কখনো কষ্ট দিব না। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে বাড়িতে 'ফিরিয়ে নিয়ে এলো। সব আসবাব পত্র সে নিজেই ঘরে এসে রাখল। এখন তাকে কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে নিজে তার খেদমত শুরু করল।

এই তাদবির কাজে লাগল। রাসূল সা. এই তাদবির বিবেকের আলোকে দিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমে এই সমাধান দেননি। তাই নবীদের আকল বা বুদ্ধি বিবেচনাও এতোটা চৌকস ও প্রখর হয়ে থাকে যে, তাদের বুদ্ধি শক্তির সামনে দুনিয়ার সব বুদ্ধি নিরর্থক হয়ে যায়। কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়ার নামই হচ্ছে আকল। আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হলে হৃদয়ের পথ খুলে যায়। আকল হচ্ছে এটাই যে, শেষ পরিণতি সম্পর্কে তার একটি পরিষ্কার ধারণা থাকবে। আর এই ধারণা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ব্যতীত হয় না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক না থেকেও যারা আকলমন্দ হয় তা প্রকৃত আকল নয়, বরং চালাকি বা ধূর্ততা। চালাকি এক বিষয় এবং আকলমন্দি ভিন্ন বিষয়। চালাকিতে ধোকা পাওয়া যায়। ধোকার মাধ্যমেই নিজের ইচ্ছা পূরণ করা হয়। আকলের মধ্যে কাউকে ধোকা দেওয়া হয় না। কৌশলের মাধ্যমে সহজে চাহিদা পূরণ করা হয়। আশ্বিয়ায়ে কেরামের তুলনায় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আর কার বেশি হতে পারে। তাই তাদের তুলনায় আকল বা বুদ্ধি বিবেচনাও আর কার বেশি হতে পারে?

শুধু চোখই নয়, হৃদয়ও অন্ধ হয়ে থাকে

“তারা কি যমিনে ভ্রমণ করে না, যাতে তারা তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারত অথবা কান দিয়ে শুনতে পারত। মূলত দৃষ্টি শক্তি অন্ধ হয় না, বরং তাদের বুকে স্থাপিত হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়।” –সূরা হজ: আয়াত ৪৬, পারা:১৭।

ব্যাখ্যা: বর্ণিত আছে, ফেরাউনের প্রভুত্বের দাবি এবং আল্লাহ কতৃক তাকে শাস্তি প্রদানের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'য়াল প্রত্যেক যালিমকে সুযোগ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাকে পাকড়াও করেন কঠিনভাবে করেন। এ কথা বলে রাসূল সা. এই আয়াতটি পাঠ করেন। “এমনিভাবে আপনার প্রভু যখন কোন জালিম জনপদকে পাকড়াও করেন তার পাকড়াও এমন কঠিন হয়”।

–সূরা হুদ: আয়াত: ১০২।

তারপর তিনি বললেন, এক বস্তিবাসী যালিম যারা রসূলকে সা. মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছিল। তাদের প্রাসাদগুলো ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল। জনবসতিগুলো জনমানবহীন প্রান্তরে

রূপান্তরিত হয়েছিল। তাদের কূপসমূহ পানি শূন্য হয়ে পড়েছিল। পাথরে নির্মিত সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহ যা দূর থেকে চমকাতো তা ভিত্তিপ্রস্তর থেকে ছিন্ন হয়ে দূরে পড়ে রয়েছে। তাদের এতো বিশাল, মজবুত স্থাপনা তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। এই স্থাপনাসমূহের নির্মানশৈলী ও সৌকর্য নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে। প্রভুর শাস্তি এইসব কিছুকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, “তোমরা সুউচ্চ, সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করলেও মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে।” -সূরা নিসা: আয়াত ৭৮।

ইমাম আবিদদুনিয়া র. “কিতাবুত তাফাক্কুর ওয়া আলই‘তিবার” নামক গ্রন্থে আলোচনা করেন, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা আ. এর কাছে ওহী পাঠালেন, হে মুসা! লোহার জুতা পরিধান করে, লোহার লাঠি হাতে নিয়ে তুমি যমিনে ভ্রমণে বের হও এবং আমার নিদর্শনসমূহ দেখ। সে সব নিদর্শন শেষ হবে না অথচ তোমার লোহা নির্মিত জুতা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

এই কিতাবে কিছু বিজ্ঞ বচন রয়েছে, উপদেশের সাথে নিজের হৃদয়কে সজীব রাখ। চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে তাকে আলোকিত রাখ, যুহুদ ও দুনিয়া বিমুখতার মাধ্যমে তাকে মেরে ফেল, বিশ্বাসের সাথে তাকে শক্তিশালী কর, মৃত্যুর আলোচনার মাধ্যমে তাকে অপদস্থ কর, ফানা হওয়ার বিশ্বাসের মাধ্যমে তাকে ধৈর্য শেখাও, দুনিয়ার বিপদ-আপদ তার সামনে রেখে তার চোখ খুলে দাও, যুগের অভাব দেখিয়ে তাকে বিহ্বল বানিয়ে রাখ, অতীতের ঘটনার মাধ্যমে তাকে শিক্ষণীয় বানাও, পেছনের ঘটনা শুনিয়ে তাকে সতর্ক রাখ, তার শহরগুলোতে ও জীবনীগুলোতে চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস তৈরি কর। গোনাহগারদের সাথে কেমন আচরণ করা হয় তা দেখ, কিভাবে তাকে হেস্তনেস্ত করা হয়েছে। অতীতের ঘটনাসমূহ সামনে রেখে হৃদয়কে বুঝাও, তাদের সত্য ঘটনা শুনে শিক্ষা অর্জন কর। শুনে রাখ, চোখই অন্ধ হয় না, বরং সবচেয়ে বড় অন্ধত্ব হচ্ছে মনের অন্ধত্ব। চোখ ভালো থাকলেও মনের অন্ধত্বের কারণে না শিক্ষা অর্জন করা যায়, না ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝা যায়। আবু মুহাম্মদ ইবনে হাইয়ান আন্দালুসী র. (মৃত্যু ৫১৮ হি:) এই বিষয়কে কিছু কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, হে ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে যে সুখ পাও, তুমি কি নিজের বৃদ্ধ বয়স ও মন্দ পরিণতি থেকে উদাসীন।

উপদেশ প্রভাব সৃষ্টি না করলেও দেখে কি শিক্ষা নিতে পার না। শুনে রাখ, চোখ ও কান তার কাজ না করলেও এতোটা মন্দ নয় যতটা ঘটনা থেকে শিক্ষা না নিলে হয়। মনে রেখ পৃথিবী থাকবে না, আসমান, চন্দ্র, সূর্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। মনে না চাইলেও তোমরা একদিন দুনিয়া থেকে অনিচ্ছায় চলে যাবে। চাই তুমি আমির হও বা ফকির হও। গ্রামের হও বা শহরের হও। (তাকসিরে ইবনে কাসীর: খ:৩, পৃ:৪৩০-৪৩১)

নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশের নব্বী পদ্ধতি

হযরত আবু হুরায়রা একবার রাসূল সা. কে বললেন, হুযূর! যখন আমি আপনাকে দেখি আমার মন চাঙ্গা হয়ে যায়, আমার চোখ শীতল হয়। আপনি আমাকে সব বস্তুর মৌলিক বস্তুটি কি সে সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল সা. বলেছেন, আবু হুরায়রা সব বস্তু পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা মেনে চললে আমি জান্নাতে প্রবেশ হতে পারি। রাসূল সা. বললেন, (১) লোকদেরকে সালাম দাও (২) মানুষকে খাবার খাওয়াও (৩) আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রাখ (৪) রাতের যে মুহূর্তে মানুষেরা গভীর ঘুমে থাকে সে সময়ে তুমি তাহাজ্জুদের নামায পড়। তবেই তুমি নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে।

মানুষের দোষ খোঁজায় ব্যস্ত থেকো না

হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না। তাদের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করো না। যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার দোষ-ত্রুটি সমূহ উন্মোচন করে দিবেন। তাকে এতোটাই অপমানিত করবেন যে, নিজের পরিবারের লোকেরা তাকে মন্দ দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে।

এক নওজোয়ান সাহাবী রাসূলের সাথে বিস্ময়কর ভালোবাসা

রাসূলের সাথে ভালোবাসায় রাসূল সা. যে দু'আ করেছেন তেমনটি আর কিছুর ব্যাপারে করেননি। হযরত তালহা ইবনে বারা এসে রাসূলকে বললেন, আপনাকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি। আপনি আমাকে যা হুকুম করবেন আমি তাই পালন করবো। তিনি বললেন, তোমার মায়ের কল্যাণ নিয়ে আসো। মূলত এটা পরীক্ষা ছিল। তিনি সাথে সাথে তরবারি

নিয়ে হুকুম পালনে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূল সা. তাঁকে ফিরতে ডেকে পাঠালেন, তিনি বললেন, আমি সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্রেরিত হইনি। তোমার জন্য এটা পরীক্ষা ছিল। তোমার মাকে হত্যা করা নয়। মায়ের সাথে সাক্ষাত কর।

এই ঘটনার পর হযরত তালহা রা. অসুস্থ হয়ে পড়েন। হুযূর (সা.) তার খোঁজ নিতে এলেন। যখন রাসূল তাঁর কাছে পৌঁছলেন, হযরত তালহা রা. বেহুঁশ ছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি বললেন, সে তো বিদায়গামী। তার মৃত্যু হলে আমাকে খবর দিও। এই কথা বলে রাসূল সা. চলে গেলেন। তিনি বিদায় নিতেই তালহা সুস্থ হলেন। তিনি বললেন, রাসূল কি আমার খোঁজ নিতে আসেননি? জবাবে বলা হল তিনি এসেছিলেন। তিনি বললেন আমি মৃত্যু বরণ করলে নিজেরাই দাফন করবে। রাসূলকে সা. এই বিষয় জানাবে না আমার মহল্লায় ইহুদিরা বসবাস করে। যদি রাসূল সা. আমার জন্য রাতে তাশরিফ আনেন তবে কোনো ইহুদী দ্বারা তিনি কষ্ট পেতে পেরেন। আমার কারণে আমার হাবিবের এই কষ্ট আমার সহ্য হবে না।

তিনি ইন্তিকাল করলে আত্মিয়রা তাঁকে গোসল কাফন করে দাফন দিল। বর্তমান যুগে মৃতের আত্মিয়রা বোম্বে কলকাতা থেকে আত্মিয়দের আসার জন্য অপেক্ষা করে। এখানে রাসূল সা. এর আসার অপেক্ষাও করা হয়নি। মৃত্যুর পর দাফন করতে এতো সময় লাগত না। নিয়ম তো হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব মায়িতকে দাফন করা। যদি নেককার মানুষ হয় তবে দেরি করে তাকে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত কেন করবে। যদি বদকার মানুষ হয় তবে কেন তাকে নিজের কাঁধে ফেলে রাখবে। এমন যেন না হয় তার আযাব ঘর থেকেই শুরু হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ যার নির্দেশে হুসাইন রা. শাহাদত বরণ করেন। তাকে হত্যা করে তার মাথা রেখে দেওয়া হয়েছিল। এক অজগর সাপ তার নাক দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে দু'বার বের হয়। সুলাইমানের (উমর ইবনে আব্দুল আযিযের পূর্ববর্তী বাদশা) লাশকে যখন কবরে রাখা হয়, লাশ নড়াচড়া করে। তখন ছেলে বলে, আমার বাবা জীবিত হয়েছে। হযরত উমর র. বললেন, দ্রুত দাফন কর, কারণ আল্লাহর শাস্তি আরম্ভ হতে যাচ্ছে।

মোটকথা সকালে রাসূল সা. এর কাছে খবর পৌঁছল। তিনি সবকিছু অবগত হলেন। তিনি কবরে গেলেন এবং মোনাজাতে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তার সাথে এমন আচরণ কর যেন তুমি তাঁকে দেখে হাসছ এবং সে তোমাকে দেখে হাসছে। এটাই হচ্ছে মুহাব্বতের প্রতিদান। মাহবুব ছাড়া যে আর কোন কিছু বুঝে না। মুহাব্বত যদি সৃষ্টি হয় তবে সব আমল এসে যাবে। এই মুহাব্বত সৃষ্টির জন্য আমলের ওপর মেহনত করতে হবে।^{৭৪}

জান্নাতের নেয়ামতসমূহ এবং ছড়ানো মুক্তার আলোচনা

مُتَّكِنِينَ عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا — وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذَلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا — وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا — قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا — وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا — عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا — وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ — إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا — وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا — عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرُوٌّ اسْتَبْرَقَ — وَحُلُوفٌ أَسَاوِرٌ مِّنْ فِضَّةٍ — وَسَقَهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا — إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا —

অনুবাদ: “তারা সেখানে আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সূর্যের উত্তাপ দেখবে না, শীতের তীব্রতাও অনুভব করবে না। জান্নাতের ছায়া তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে, জান্নাতের ফলসমূহ উপর দিক থেকে নিচে তাদের দিকে ঝুলানো থাকবে। তাদের কাছে রূপার থালা ও শরাবের পানপাত্র ঘুরানো হবে।

—সূরা দাহর. আয়াত:১৩-২২।

ব্যাখ্যা: জান্নাতের বাসিন্দাদের নেয়ামত, আরাম আয়েশের, বিত্ত বৈভব ও সম্পদ এবং মর্যাদার আলোচনা হচ্ছে। জান্নাতের বাসিন্দারা পূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দের সাথে, মানসিক স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জান্নাতের কারুকার্য খচিত, সুসজ্জিত আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে সবকিছু উপভোগ করবে। তাছাড়া জান্নাতের আরেকটি বিশেষ নেয়ামত হচ্ছে, সেখানে তারা

^{৭৪} হযরত মাও. ইউসুফ রা. এর বিশেষ বয়ান, হায়াতুস সাহাবা: খ:২, পৃ:৪১৩।

সূর্যের প্রখর তীব্রতা বা শীতের কঠিন শীতলতা থেকে মুক্ত ও নিরাপদে থাকবে, বরং সব সময়ই বসন্তের আমেজ বিরাজমান থাকবে। জান্নাতের বৃক্ষরাজির শাখাগুলো ঝুঁকে ঝুঁকে তাদেরকে ছায়া দিবে। ফলগুলো তাদের খুব কাছে থাকবে। ইচ্ছা করলে গুয়ে গুয়ে খেতে পারবে। বসে বসে ফল ধরতে পারবে। দাঁড়িয়ে ছিড়তে পারবে। গাছে চড়ার কোন রকম কষ্ট করার প্রয়োজন পড়বে না। মাথার ওপরে ফলের থোকা ও কাঁদি ঝুলতে থাকবে। চাইতেই হাতের নাগালে এসে যাবে। মাথা উঁচু করলে ফল একটু ওপরে থাকবে। উপবিষ্ট থাকলে কিছুটা ঝুঁকে যাবে। শোয়া অবস্থায় আরো নিকটে এসে যাবে। তাতে কাঁটার বিড়ম্বনা থাকবে না।

হযরত মুজাহিদ র. বলেন, জান্নাতের জমিন রূপা, মাটি নিখাঁদ মিশকের হবে। বৃক্ষসমূহের শরীর হবে সোনা, রূপার। ডালগুলো হবে লুলু, যাবরযদ ও ইয়াকুতের। তার পাতা ও ফলগুলো সংগ্রহ করতে কোন সমস্যা বা কষ্ট করতে হবে না। বসে বসে চাইলেও সংগ্রহ করা যাবে। দাঁড়িয়ে এমনকি গুয়েও সংগ্রহ করা যাবে। একপাশে থাকবে ভদ্র, সুশোভিত, চিত্তাকর্ষক ও অনুগত সেবক। রকমারি খাবার, রূপোর থালায় পরিবেশন করে দাঁড়িয়ে থাকবে। অপরদিকে সূরাপাত্র হাতে সাকিরাইশারার অপেক্ষা করতে থাকবে। পানপাত্রগুলো কাঁচের মত পরিষ্কার থাকবে, ভিতরের সবকিছু বাইরে থেকে দেখা যাবে। জান্নাতের সব বস্তুরই দুনিয়ার বস্তুর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু সেসব বস্তু দুনিয়াতে পাওয়া যায় না। এই সূরা সাকির হাতে অনেক সুন্দর দেখা যাবে। পানকারীদের প্রয়োজন মত শরাবই তাদের হাতে থাকবে। কম বা বেশি থাকবে না। ওই দুর্লভ গ্লাসগুলোতে যে সূরা পরিবেশন করা হবে তা পবিত্র, সুস্বাদু, তৃপ্তিদায়ক ও নেশাবিহীন। জান্নাতের সালসাবিল নহর থেকে তা ধুয়ে পবিত্র করে পরিবেশন করা হবে। কখনো আবার তা কর্পুর মিশ্রিত থাকবে। অর্থাৎ কখনো শীতল পানির সাথে মৃদু গরম পানি মিশিয়ে তাকে কুসুমগরম করা হবে। শুধুমাত্র নেককার ও একান্ত প্রিয় ব্যক্তিরাই এই নহর থেকে শরাব পান করতে পারবে। ইকরামার বক্তব্য অনুসারে সালসাবিল হচ্ছে জান্নাতের একটি ঝর্ণা। কেননা তা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়ে চল নামে। এর পানি সুমিষ্ট, পাতলা ও সুগন্ধময়।

এইসব নেয়ামতের সাথে সুদর্শন কমবয়সী যুবকেরা তাদের খেদমতের জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত থাকবে। জান্নাতের এই বালকেরা যে বয়সের হবে তারা সব সময় সে বয়সেরই থাকবে। এমনটা হবে না বয়স বেড়ে চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। তারা অনেক উন্নত, দামী কাপড় পরিধান করে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে ঘুরতে থাকবে। তারা অত্যন্ত কর্মকুশলতার সাথে তাদের দায়িত্বসমূহ পালন করতে থাকবে। দেখে মনে হবে সফেদ শুভ্র মুক্তাগুলো যেন চারপাশে বিক্ষিপ্ত পড়ে রয়েছে। তাদের তুলনা শুধু এই দৃশ্যের সাথেই করা যায়, এই সুদর্শন চেহারা ও সুন্দর স্বভাবের বালকেরা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে এবং পরিপাটি হয়ে নিজের মনিবের নির্দেশ মানতে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াবে। তাদের দৃশ্য দেখে মনে হবে সাজানো গোছানো বিছানার ওপর সাদা শুভ্র মুক্তা এদিক ওদিক ঝুলে আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, প্রত্যেক জান্নাতির জন্য এক হাজার খাদেম থাকবে; যারা বিভিন্ন কাজে ও দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

তারপর বলেন, হে নবী! আপনি জান্নাতের যেখানেই তাকাবেন সেখানেই নেয়ামতরাজি ও বিরাট সাম্রাজ্য দেখতে পাবেন। আপনি দেখতে পাবেন আনন্দ ও বিনোদনের অফুরন্ত উপকরণ দিয়ে সবকিছু পরিপূর্ণ। সহিহ হাদীসে এসেছে, সব শেষে যাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে তাকে আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, যাও আমি তোমাকে জান্নাতে এমন নেয়ামত দিব যা দুনিয়ার নেয়ামতের সদৃশ, বরং তার চেয়ে দশগুণ বেশি পাবে। হযরত ইবনে উমরের বর্ণনায় আছে, যে সর্বনিম্ন জান্নাতের অধিকারী হবে তার সাম্রাজ্যও দু'হাজার মাইলের দূরত্ব সমান হবে। প্রত্যেক দূরের ও কাছের বস্তু একই সময়ে সমান দেখা দেয়। এ তো হচ্ছে সর্বনিম্ন জান্নাতের অবস্থা। তাতেই বুঝা যায় সর্বোচ্চ জান্নাতের অধিকারীর মর্যাদা কি হতে পারে? তার নেয়ামতের পরিমাণ কেমন হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের দু'আ ও আমল ছাড়াই তুমি তোমার রহমতের অফুরন্ত ভাণ্ডার দিয়েছো। আমরা তোমার কাছে এই অনুনয়, বিনয় করছি তুমি আমাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দিও। আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব কর। আমরা তো আমল দিয়ে তার উপযুক্ত হওয়ার যোগ্য নই। তবে তোমার প্রতি ঈমান আছে; তোমার রহমত তো আমলের ওপর নির্ভর নয়।

তাবরানীতে একটি হাদীসে আছে, এক হাবশী রাসূলের সা. দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসূল সা. তাকে বললেন, তুমি যা কিছু জানতে চাও আমাকে জিজ্ঞেস কর। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আকার আকৃতিতে, বর্ণ ও রঙে, নবুয়ত ও রিসালাতে আপনাকে আমাদের ওপর ফয়লত দেয়া হয়েছে। আপনি যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন আমিও যদি সে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনি, আপনি যে সব বিষয়ের ওপর আমল করেন আমিও যদি সে সব বিষয়ের ওপর আমল করি তবে আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে পারব? রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ, শপথ ওই প্রভুর যার হাতে আমার প্রাণ। কালো বর্ণের লোকদেরকে জান্নাতে সেই সাদা বর্ণ দেওয়া হবে যা এক হাজার বছরের দূরত্ব থেকে দেখা যাবে। তারপর রাসূল সা. বললেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াদা নির্ধারিত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহী ওয়া বিহামদিহী বলবে তার জন্য এক লাখ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কিভাবে ধ্বংস হব? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি এত নেকি নিয়ে আসবে যদি তা কোন পাহাড়ের ওপর রাখা হয় তবে পাহাড়ের জন্য তা অনেক ভারি হবে। কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহর নেয়ামতসমূহ যখন তার মোকাবেলায় রাখা হবে তখন এসব কিছু তুচ্ছ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহর বিশেষ রহমত সবকিছুর ওপর প্রাধান্য পাবে। ওই হাবশী বলল, হযরত আপনার চোখ জান্নাতে যা কিছু দেখবে আমার চোখও কি তা দেখবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তা দেখবে। তারপর সাহাবী কাঁদতে থাকলেন। এই অবস্থায় তার আত্মা ইহজগত ত্যাগ করল। হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমি দেখেছি রাসূল সা. নিজ হাতে তাঁকে দাফন দিয়েছেন।

জান্নাতবাসীদের পোশাকের আলোচনা হচ্ছে তা কেমন হবে। তাদের পোশাক হবে সবুজ রঙের এবং চিত্রাকর্ষক রেশমের। সুন্দর হচ্ছে উন্নত মানের নরম রেশম যা শরীরের সাথে লেগে থাকে। ইস্তিবরাক হচ্ছে অনেক দামী রেশম যা কারুকার্যখচিত থাকে। তার সাথে রূপোর বালা হাতে সজ্জিত থাকবে। এই পোশাক হবে নেককার ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য। তাদেরকে জান্নাতে স্বর্ণ ও মুক্তার বালা দিয়ে সজ্জিত করা হবে। আর তাদের পোশাক হবে রেশমের। -সূরা ফাতের: আয়াত:২৩।

তাদেরকে সোনা, হিরা জড়ানো চুড়ি পরিধান করান হবে। অনেক উন্নত মানের আসল রেশমি কাপড় পরানো হবে। এই বাহ্যিক সাজ-সজ্জার পাশাপাশি তাদেরকে পবিত্র শরাব পরিবেশন করা হবে। যা ভিতরের সব মন্দ স্বভাব দূর করে দিবে। হিংসা, ক্রোধ, খারাপ স্বভাব ইত্যাদি সবকিছু তা পরিষ্কার করে দিবে। আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, জান্নাতবাসিরা যখন জান্নাতের দরোজায় পৌঁছবে তারা দু'টি নদী দেখতে পাবে। তারা একটির পানি পান করবে, সাথে সাথে তাদের মনের সব কালিমা দূর হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টিতে তারা গোসল করবে, তাদের চেহারা অনেক সুন্দর, লাভণ্যময় হয়ে যাবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্য তাদের পরিপূর্ণভাবে অর্জন হবে। তারপর তাদের মনের আনন্দের জন্য তাদেরকে বারবার বলা হবে, এসবই হচ্ছে তোমাদের আমলের, তোমাদের চেষ্টার ফলাফল। তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তিসহকারে তোমাদের অতীতের কর্মের প্রতিদান স্বরূপ। (সূরা আরাফ: আয়াত: ৪৩)

ঘোষণা করা হবে তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারি বানানো হয়েছে তোমাদের নেক কাজ সমূহের প্রতিদান স্বরূপ। তোমাদের কর্ম ও চেষ্টা কৃতকার্য হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।^{৭৫}

জান্নাতে পর্দা দিলে সন্ধ্যা হবে

জান্নাতে তারা কোনো অশ্লীল কথাবার্তা শুনবে না। সেখানে হবে শুধুই সালাম। তাদের জন্য সেখানে সকাল সন্ধ্যা রিযিক থাকবে। জান্নাতে সকাল ও সন্ধ্যা হবে দুনিয়ার মত। তবে সেখানে রাত হবে না। সব সময়ই আলোর ব্যবস্থা থাকবে। পর্দা নামিয়ে দিলে এবং দরজা বন্ধ হলে রাত, এমনিভাবে পর্দা সরিয়ে দিলে ও দরজা খুলে দিলে সকালের সময় বুঝতে পারবে জান্নাতবাসীরা। এই দরজাগুলো খোলা ও বন্ধ হওয়া জান্নাতিদের ইশারা ও হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। এই দরজাগুলো এতটাই স্বচ্ছ হবে যে, বাইরের জিনিস ভিতর থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। যেহেতু দুনিয়াতে দিন রাতের অভ্যাস ছিল। তাই যখন যা চাইবে তাই পাবে। আরবরা সকাল

সন্ধ্যা খাবারের অভ্যস্ত ছিল এ কারণে জান্নাতি খাবারের সময় তাই বলা হয়েছে। যদিও জান্নাতিরা যখন চাইবে তখনই পাবে।

জান্নাতে কুমারী তরুণীদেরও বর্ষণ হবে

জান্নাতে মানুষদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নেয়ামত ও রহমত বরাদ্দ থাকবে তার আলোচনা চলছে। তারাই হচ্ছে ভাগ্যবান, কারণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে দাখিল হয়েছে। তাদের ওপর কুমারী হ্রদের বর্ষণ হবে। যারা সমবয়স্কা হবে। এক হাদীসের মধ্যে এসেছে আল্লাহর সন্তুষ্টিই হবে জান্নাতীদের পোশাক। মেঘ তাদেরকে বলবে, তোমরা বল তোমাদের ওপর কি বর্ষণ করব? তারা যা চাইবে তাই তাদের ওপর বর্ষণ করা হবে। এমনকি কুমারী তরুণীদেরকেও তাদের ওপর বর্ষণ করা হবে। (ইবনে আবি হাতেম)। তারা পবিত্র শরাবের পরিপূর্ণ গ্লাস পাবে। তাতে কোনো নেশা থাকবে না। তারা না কোনো অনর্থক কথা শুনবে, না বলবে। সেখানে কোনো অশ্লীল কথা বা পাপাচার নেই। -সূরা তুর: আয়াত: ২৩।

মিথ্যা বা অনর্থক কথাবার্তা হবে না। তা হচ্ছে দারুস সালাম বা শান্তির ঘর। এই লোকদের জন্য যা কিছু আয়োজন করা হচ্ছে সবকিছু তাদের নেক ও সৎকর্মের প্রতিদান স্বরূপ। আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইহসানের ভিত্তিতে এসব প্রতিদান।^{৭৬}

জান্নাতে থাকবে দুধ, পানি, মধু ও শরাবের সমুদ্র

জান্নাতে এমন পানির ঝর্ণা রয়েছে যা কখনও নষ্ট হবে না। হবে না পরিবর্তন ও দুর্গন্ধময়। থাকবে চকচকে মুক্তার মত স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার। কোনো রকমের ময়লা বা রং পরিবর্তন হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন, জান্নাতের নহরসমূহ মিশকের পাহাড় থেকে বের হয়। তাতে পানি ছাড়া দুধের নহরও থাকবে। তার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হবে না। অনেক সাদা, মিষ্টি ও যথেষ্ট পরিষ্কার হবে। একটি মারফু হাদীসে এসেছে এই দুধ কোনো প্রাণীর স্তন্য থেকে নয়, বরং তা হবে আল্লাহর কুদরতি দুধ। আরেক নহর হবে শরাব বা পানিয়ার। যা পান করে প্রফুল্ল হবে, তার মস্তিষ্ক প্রসন্ন হবে। এই শরাব না দুর্গন্ধময় হবে, না তিক্ত হবে, না দেখতে

^{৭৬} তাফসিরে ইবনে কাসীর: খ: ৫, পৃ:৪৯৯।

খারাপ দেখাবে। দেখতে দৃষ্টিনন্দন, পান করতে সুস্বাদু ও অত্যন্ত সুস্বাণযুক্ত হবে। তাতে বুদ্ধি লোপ পাবে না, মস্তিষ্কে কোনো রকম পরিবর্তন ও নেশা সৃষ্টি হবে না। হাদীসে এসেছে এই শরাবও কারো হাতের তৈরি থাকবে না, বরং আল্লাহর হুকুমে তৈরি হবে। যা অত্যন্ত সুস্বাদু ও সুদর্শন হবে। জান্নাতে মধুর নহর থাকবে। এই মধু অনেক পরিষ্কার, সুগন্ধময়, অনেক সুস্বাদু হবে। হাদীসে এসেছে এই মধুও মৌমাছি থেকে হবে না। মুসনাদে আহমদের এক মারফু হাদীসে এসেছে জান্নাতে দুধ, পানি, মধু এবং শরাবের সমুদ্র থাকবে। এই সবগুলোর নহর ও ঝর্ণা থাকবে। এই হাদীসটি তিরমিযীতে ইমাম তিরমিযী হাসান সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে মারদুয়ার হাদীসে এসেছে এই নহরগুলো জান্নাতে আদন থেকে উৎসারিত হয়। তারপর একটি হাউজে জমা হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন নহরের মাধ্যমে সমস্ত জান্নাতে বিতরণ করা হয়।

অপর একটি হাদীসে এসেছে, তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা কর। এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাত। এই জান্নাত থেকেই বিভিন্ন নহর প্রবাহিত হয় এবং তার ওপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ। হযরত লাকিত ইবনে আমের রা. রাসূলকে সা. প্রশ্ন করলেন, জান্নাতে কি থাকবে? তিনি বললেন পরিষ্কার মধুর নহর থাকবে। নেশাবিহীন শরাবের নহর এবং উৎকৃষ্ট দুধের নহর। এমনিভাবে পরিচ্ছন্ন পানির নহর থাকবে। আরো থাকবে বিভিন্ন রকমের ফলের সমাহার। আরো থাকবে অনিন্দ্য সুন্দরী পবিত্র নারী যা সৎকর্মশীলগণ লাভ করবেন। দুনিয়ার মতই সেখানে তারা আনন্দ লাভ করবে, কিন্তু সেখানে কোনো সন্তান জন্ম নিবে না। হযরত আনাস রা. বলেন, জান্নাতের নহরসমূহ দুনিয়ার নহরের মত হবে এমন ভাবনা অমূলক। জান্নাতের নহর ডোবা, নালার মত খোদাই জমিনে হবে না। আল্লাহর কসম! এই নহর সমতল যমিনে এক রকম হবে। নহরের তীরে তীরে মনি মুক্তার তাঁবু টানানো থাকবে। তার মাটি হবে নিছক মিশকের। সেখানে তাদের জন্য সব ধরনের ফল ও ফুল থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, তারা সেখানে নিরাপদে সব ধরনের ফল চেয়ে খাবে।

(সূরা দুখান: আয়াত:৫৫)

উভয় জান্নাতে সব ধরনের ফলের জোড়া থাকবে। এই সব নেয়ামতের সাথে সবচে' বড় নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট থাকবেন। তিনি

তাদের জন্য নিজের মাগফিরাত ওয়াজিব করেছেন। তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছেন। তাদের প্রতি সম্ভ্রষ্ট প্রকাশ করেছেন। এখন কোন বাধা নেই।^{৭৭}

জান্নাতে ছয়টি জিনিস থাকবে না

জান্নাতে সবকিছু থাকবে ছয়টি জিনিস ব্যতীত:

(১) মৃত্যু হবে না (২) ঘুম হবে না (৩) হিংসা হবে না (৪) অপবিত্রতা বা নাজাসাত থাকবে না (৫) বৃদ্ধ থাকবে না (৬) দাড়ি বিশিষ্ট কেউ থাকবে না, বরং সবাই দাড়িবিহীন যুবক থাকবে।^{৭৮}

উম্মে সালমা রা. এর বিস্ময়কর প্রশ্ন এবং রাসূল সা. এর উত্তর

প্রশ্ন ১. উম্মে সালমা রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে বললাম, হুরেগিন সম্পর্কে আমাকে বলুন।

উত্তর: রাসূল সা. বললেন, তারা হবে বাদামী রংয়ের এবং বড় চোখ বিশিষ্ট। মিশমিশে কালো ও লম্বা চুল বিশিষ্ট।

প্রশ্ন: ২. আমি বললাম, (সুরক্ষিত মুক্তা) সম্পর্কে বলুন।

উত্তর: রাসূল সা. বললেন, তাদের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য সেই মুক্তার মত হবে যা মাত্র তার শিশি থেকে বের হয়েছে, এখনও পর্যন্ত কেউ হাত দেয়নি।

প্রশ্ন: ৩. আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘খায়রাতুন হিসান’ শব্দের ব্যাখ্যা কি?

উত্তর: তিনি বললেন, উত্তম ব্যবহার ও সৌন্দর্য।

প্রশ্ন: ৪. আমি বললাম, বাইয়ুন মাকনুন এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: তিনি বললেন, তাদের শারীরিক পেলবতা হবে ডিমের কুসুমের মত মসৃণ ও কোমল।

প্রশ্ন: ৫. আমি উরুবান আতরাবা এর অর্থ জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর: তিনি বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার যত মুসলমান নারী রয়েছে তারা সবাই একবার বৃদ্ধ ছিল। আল্লাহ তা’য়ালা তাদেরকে নতুন

^{৭৭} তাফসিরে ইবনে কাসীর : খ: ৫, পৃ: ১০২-১০৩।

^{৭৮} মেশকাত: জান্নাতের বিবরণ অধ্যায়, আখেরাতের স্মরণ, মাওলানা ইফতিখারুল হাসান কান্দলভীর মালফুযাত, পৃ: ৩০।

ভাবে সৃষ্টি করবেন। তাদেরকে কুমারী এবং স্বামীদের পছন্দনীয় করে সৃষ্টি করবেন। তারা স্বামীদের প্রিয়তমা এবং সমবয়সী হবে।

প্রশ্ন: ৬. আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. দুনিয়ার নারীরা উত্তম না হুরেঈন?

উত্তর: তিনি বললেন, দুনিয়ার নারীরা হুরেঈন থেকে অনেক উত্তম।

প্রশ্ন: ৭. আমি জানতে চাইলাম তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কী?

উত্তর: তিনি বললেন, নামায, রোযা এবং আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত। আল্লাহ তাদের চেহারা নূর এবং শরীর রেশম দিয়ে সাজিয়েছেন। তারা বলতে থাকবে, “আমরা চিরদিন থাকব, আমরা কখনও মৃত্যুবরণ করব না। আমরা চির সবুজ এবং নেয়ামত আনয়নকারী। আমরা কখনও নেয়ামত শূন্য হব না। আমরা সব সময় অবস্থান করব। কখনও সফরে যাব না। আমরা নিজের স্বামীদের প্রতি সন্তুষ্ট। আমরা কখনও তাদের প্রতি বিরাগভাজন হই না। সৌভাগ্যবান তারা যারা আমাদের জন্য, আমরা তাদের জন্য।

প্রশ্ন: ৮. আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোনো নারীর দুই দুই, তিন তিন, চার চার স্বামী হয়, তারপর সে মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যুর পর সে যদি জান্নাতে প্রবেশ করে এবং তার সব স্বামীই জান্নাতে প্রবেশ করে তবে সে তাদের সাথে কিভাবে মিলিত হবে।

উত্তর: রাসূল সা. বললেন, তাকে সুযোগ দেয়া হবে সে যার সাথে ইচ্ছা তার সাথেই থাকতে পারবে। অতএব সে তাদের মধ্যে থেকে তাকেই পছন্দ করবে যে তার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তা'য়ালাকে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! সে আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করত, আমাকে তার সাথেই বিবাহ সম্পন্ন করে দাও।^{৭৯}

জান্নাতে হুরগণ লাভণ্যময়ী, লাস্যময়ী এবং রূপবতী হবে

একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, রাসূল সা. সকল মুসলমানকে নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তা'য়ালার তাঁকে বলবেন, আমি আপনার সুপারিশ কবুল করলাম। আপনাকে তাদের নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার

অনুমতি দিলাম। রাসূল সা. বলেন, তারপর আমি তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাব। আল্লাহর কসম! তোমরা যে সময়ের মধ্যে তোমাদের পরিবারের সাথে পরিচিত হও তার চেয়ে অনেক কম সময়ের মধ্যে জান্নাতবাসীরা তাদের পরিবার ও বিবিদের সাথে পরিচিত হবে। এক একজন জান্নাতির বাহাত্তর বিবি থাকবে। এরা সবাই আল্লাহর নিজ হাতে সৃষ্টি হবে। আর দু'জন হবে মহিলাদের মধ্য থেকে। তারা নিজেদের ইবাদতের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। জান্নাতি তাদের এক একজনের কাছে যাবে। সেই বিবি ইয়াকুতের তৈরী প্রাসাদে অবস্থান করবে। সোনার তার দিয়ে তৈরি খাটে উপবিষ্ট থাকবে। সত্তর জোড়া এমন পোশাক থাকবে যা পাতলা, পূর্ণ রেশমের উজ্জ্বল চমকদার হবে। এই বিবির এতটাই নাজুক উজ্জ্বল বর্ণের হবে তাদের কোমরে হাত রাখলে সিনার দিকে থেকে দেখা যাবে। কাপড়, গোশত বা হাড়ি কোনো কিছু বাধা সৃষ্টি করবে না। মোটকথা প্রত্যেকে প্রত্যেকের আয়নার মত হবে। জান্নাতি তার সাথে বিনোদন করবে। তাদের কেউ ক্লান্ত হবে না। কারো হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে না। যখনই কামনা করবে তখনই কুমারী হ্র পাবে, সে অসুস্থ বা কোন অসুবিধা দেখাবে না। কিন্তু সেখানে বিশেষ পানি থাকবে না যা ঘৃণা সৃষ্টি করবে। এভাবে সে একজনের নিকট থেকে বের হবে। তারপর আরেকজনের কাছে যাবে। যার কাছে যাবে তাকেই বলবে, রবের কসম! তোমার চেয়ে সুন্দর আমি জান্নাতে কিছু পাইনি। তোমার চেয়ে বেশি মুহাব্বত অন্য কারো সাথে নেই।^{৮০}

হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূল সা. এর কাছে প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতে কি জান্নাতিরা সহবাস করবে? রাসূল সা. বলেছেন, “হ্যাঁ, কসম ওই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! যখন সে পৃথক হবে তখনই পবিত্র ও কুমারী হয়ে যাবে।” রাসূল সা. বলেন, জান্নাতে পুরুষকে বেশি নারীর কাছে যাওয়ার শক্তি দেওয়া হবে। হযরত আনাস রা. রাসূলকে জিজ্ঞেস করেন, এত শক্তি কিভাবে হবে? রাসূল সা. বলেন, একশ মানুষের সমান শক্তি দেওয়া হবে। জান্নাতের নারীরা নিজেদের স্বামীর প্রিয়তমা হবে। তারা নিজেদের স্বামীর প্রতি এবং স্বামীরা তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকবে। জান্নাতের নারীরা অত্যন্ত সুশ্রী।

স্বামীর হৃদয় মুঠোয় ভরে রাখবে

জান্নাতের নারীরা নিজেদের স্বামীদের হৃদয় মুঠোয় ভরে রাখবে। তারা হবে সুমিষ্ট ভাষী। নিজেদের মিষ্টি কথায় স্বামীদের হৃদয় মাতিয়ে রাখবে। যখন কথা বলবে মনে হবে কথা নয় যেন ফুল ঝরছে। ইবনে আবি হাতেমের মধ্যে আছে, তাদেরকে “উরব” এ কারণে বলা হয়েছে, তাদের কথা বলার ভাষা হবে আরবি। “আতরাব” অর্থ হচ্ছে সমবয়সী বা বয়স হবে তেত্রিশ। এই অর্থও হতে পারে যে স্বামী এবং তার স্বভাব হবে অভিন্ন। উভয়ের পছন্দ, অপছন্দ হবে অভিন্ন। তাছাড়া এ অর্থও হতে পারে, পরস্পরে একে অপরের প্রতি কোনো ক্রোধ, হিংসা বা সন্দেহ থাকবে না। উভয়ের বয়স সমান হবে যেন পরস্পরে সংকোচহীনভাবে মিশতে পারে। তিরমিযির একটি হাদীসে এসেছে, এই জান্নাতি হরেরা একটি হৃদয়কাড়া বাগানে একত্রিত হয়ে অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে গান গাবে। এমন মনোহর সুর ও কণ্ঠের শ্রুতিমধুর আওয়াজ মানুষ পৃথিবীতে কখনও শোনেনি। মুসনাদে আবু ইয়ালার মধ্যে এসেছে, তাদের গানের কলি হবে, “আমরা পবিত্র, সুন্দর নারী, আমাদেরকে ভদ্র, সুশীল স্বামীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। হযরত আবু সুলাইমান দারানী র. থেকে বর্ণিত, আমি এক রাতে তাহাজ্জুদের নামায শেষে দুআ’ করছি। অনেক শীতের কারণে আমি হাত তুলতে পারছিলাম না। তাই আমি এক হাত তুলে দুআ’ করছিলাম। এমন অবস্থায় আমার চোখে ঘুম আসে। স্বপ্নে আমি এমন হর দেখতে পাই যার সৌন্দর্য ও উজ্জলতা আমি কখনও আগে দেখিনি। সে আমাকে বলল, আবু সুলাইমান! তুমি এক হাতে দু’আ করছ, তোমার এই খেয়াল নেই আল্লাহ তা’য়াল পাঁচশ বছর থেকে আমাকে তোমার জন্য বিশেষ নেয়ামতের মধ্যে প্রতিপালন করছেন।”^{৮১}

চলুন, জান্নাতে আদনে ভ্রমণ করি

যার পাঁচ হাজার দরোজা রয়েছে। প্রতিটি দরোজায় পাঁচ হাজার ফেরেশতা রয়েছে। ওইসব বুয়ুর্গদের আলোচনা করা হচ্ছে, যারা আখেরাতে জান্নাতের মালিক হবেন। তাদের কী গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে

^{৮১} তাফসিরে ইবনে কাসীর, খ: ৫, পৃ: ২৫৭।

এত সুন্দর পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা মুনাফিকদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। যারা ওয়াদা ভঙ্গ করা, গাদ্দারী করতে প্রসিদ্ধ। মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে প্রতিশ্রুতি করবে, প্রতিশ্রুতি নষ্ট করবে। ঝগড়া বিবাদে গালিগালাজ করবে। কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলবে। আমানতের খেয়ানত করবে। এই জান্নাতিদের বিশেষ গুণ হচ্ছে, বন্ধন, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, গরীব অভাবীদেরকে দান করা, ভালো বিষয়গুলো যত্ন নেওয়ার আল্লাহর বিধানের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান। প্রভূর ভয় তাদের মনে জাগরুক থাকে। আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে তারা নেক কাজ করে থাকে। আল্লাহর ভয়ে তারা নাফরমানি ছেড়ে দেয়। বদ আমল ছেড়ে দেয়। আখেরাতের হিসাবের ভয় রাখে। এ কারণে সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। নেকীর কাজে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। কখনও মধ্যমপন্থা ত্যাগ করে না। সর্ব অবস্থায়ই আল্লাহর নির্দেশের প্রতি খেয়াল রাখে। হারাম কাজ বা আল্লাহর নাফরমানীর দিকে মন যতই প্রলুদ্ধ করে কিন্তু সে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আখেরাতের কথা মনে করে প্রভূর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নাফরমানী থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। নামাযের পরিপূর্ণ হেফাজত করে। রুকু সেজদা করার সময় পরিপূর্ণভাবে শরয়ী বিধান মত বিনয়াবনত হয়। আল্লাহ তা'য়ালার যাদেরকে দেওয়ার হুকুম করেছেন তাদেরকে দান করে। ফকির, মুখাপেক্ষি, অভাবী এবং পরিচিত অপরিচিত কেউ তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না। গোপনে, প্রকাশ্যে, দিনে, রাতে সব সময় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। মন্দকে ভালোয়, অকল্যাণকে কল্যাণে, বৈরিতাকে মিত্রতায় পরিবর্তন করে দেয়। আরেকজন দুর্ব্যবহার করলে সে নরম ব্যবহার করে। আরেকজন উত্তেজিত হয়ে পড়লে সে মাথা নুইয়ে দেয়। আরেকজনের জুলুম চোখ বুজে সহ্য করে। কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে, “তুমি মন্দ আচরণকে উত্তম আচরণ দিয়ে প্রতিহত কর”। (সূরা হা-মিম সিজদা: আয়াত:৩৪)

তুমি উত্তমভাবে ব্যবহার কর তবে শত্রুও তোমার পরম বন্ধু হয়ে যাবে। ধৈর্যশীল সৌভাগ্যবানই এই মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে। এমন লোকের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণাম। এই উত্তম পরিণাম হচ্ছে জান্নাতের বাড়ি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, জান্নাতের একটি প্রাসাদের নাম হচ্ছে আদন। এই জান্নাতে থাকবে সুউচ্চ টাওয়ার এবং উন্নত বালাখানা। আরো থাকবে পাঁচ হাজার দরোজা। প্রত্যেক দরোজায় থাকবে পাঁচ হাজার ফেরেশতা। এই প্রাসাদগুলো সংরক্ষিত থাকবে নবীগণ, সিদ্দিক, শহীদদের জন্য। হযরত যাহহাক রা. বলেন, এটাই হবে জান্নাতের শহর। এখানে থাকবে আশ্বিয়ায়ে কেরাম এবং শহীদগণ। হেদায়েতের ইমামগণ থাকবে, তাদের পাশে আরো লোকজন থাকবে। তাদের চারপাশে আরো জান্নাত থাকবে। সেখানে তারা নিজেদের আপনজনকে দেখবে। তাদের পিতৃপুরুষ, নাতি পুতি তাদের স্ত্রীগণও যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে সবাই তাদের পাশে থাকবে। তারা সবাই আনন্দে বিভোর থাকবে। এই দৃশ্য তাদের চোখকে শীতল করবে। যদি কারো আমল এই মর্যাদায় পৌঁছার উপযুক্ত নাও হয় তবুও আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, “যেই ঈমানদারের সন্তান ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে আমি তাদেরকেও তাদের সাথে মিলিয়ে দিব।” —সূরা আততুর: আয়াত:২১।

তাদের কাছে ফেরেশতারা সালাম ও অভিনন্দন নিয়ে সব সময় আসতে থাকবে। এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার। তাতে তারা আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকবে। নবীগণ, সিদ্দিক ও শহীদগণদের প্রতিবেশী ফেরেশতাদের সালাম এবং জান্নাত হচ্ছে মাকাম।

মুসনাদের হাদীসে এসেছে, প্রথমে কে জান্নাতে যাবে তোমরা কি জানো? সাহাবীরা উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, প্রথম জান্নাতি হবে মিসকিন মুহাজির; যে দুনিয়ার আরাম আয়েশ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে। যে বিভিন্ন দুঃখ কষ্টে জর্জরিত ছিল। যার কামনা বাসনা মনের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। এমন অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা রহমতের ফেরেশতাকে হুকুম করবেন, যাও তাকে অভিনন্দিত কর। ফেরেশতারা বলবে, হে প্রভু! আমরা তোমার আসমানের বাসিন্দা। তোমার সর্বোত্তম সৃষ্টি। আপনি আমাদেরকে হুকুম করছেন, আমরা তাদেরকে সালাম জানাব এবং অভিনন্দিত করব। আল্লাহ তা'য়ালা জবাব দিবেন, তারা আমার বান্দা। তারা একমাত্র আমার সন্তুষ্টির জন্য আমার ইবাদত করেছে। আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি। দুনিয়ার

ভোগ বিলাস থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে। বিপদের মধ্যে ডুবে ছিল, কোনো আশা তাদের পূরণ হয়নি। তবুও তারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। এ কথা শোনামাত্র ফেরেশতারা সাথে সাথে দৌড়ে তাদের কাছে যাবে। চারদিকের দরোজা দিয়ে তারা প্রবেশ করবে। সালাম দিয়ে তারা মুবারকবাদ জানাবে।

তাবরানীতে এসেছে, সবার আগে তিন প্রকারের লোক জান্নাতে যাবে। গরিব মুহাজিরগণ যারা বিপদে নিমজ্জিত ছিল। তাদেরকে যখন যে হুকুম করা হয়েছে তারা পালন করেছে। বাদশাদের কাছে তাদের প্রয়োজন ছিল কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে প্রয়োজন পূরণ হয়নি। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতকে নিজের সামনে ডেকে নিবেন। জান্নাত নিজের সব সৌন্দর্য ও নেয়ামতসহ তাঁর সামনে হাজির হবে। ওই সময় আওয়াজ আসবে আমার যেই বান্দা আমার রাস্তায় জেহাদ করত, আমার পথে সে নির্যাতিত হত, আমার পথে সে ঘুরে বেড়াত সে কোথায়? তুমি আস এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ কর। ওই সময় ফেরেশতা আল্লাহর সামনে সেজদায় অবনত হবে। ফেরেশতা বলবে, হে রব! আমরা তো সকাল সন্ধ্যা তোমার ইবাদত, তাসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনায় নিয়োজিত ছিলাম। তারা কোথায় যারা আমার রাস্তায় জিহাদ করেছে। আমার রাস্তায় বিভিন্ন কষ্ট স্বীকার করেছে। এমন সময়ে ফেরেশতারা জলদি তাদের কাছে সব দরজা দিয়ে ছুটবে। তাদের অভিনন্দন ও সালাম জানাবে। তোমাদেরকে তোমাদের প্রভু ধৈর্যের উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন।

হযরত আবু উমামা বলেন, মুমিন জান্নাতে নিজের আসনে অত্যন্ত শান শওকতের সাথে বসে থাকবে। খাদেমরা চারদিকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা যে খাদেমের কাছে ফেরেশতা অনুমতি চাইবে সে অপর খাদেমকে জিজ্ঞেস করবে, এমনি ভাবে প্রত্যেক খাদেম আরেকজনকে এভাবে মুমিন ব্যক্তির কাছে অনুমতি চাওয়া হবে। মুমিন অনুমতি দিবে তাকে আসতে দাও। এভাবে এই সংবাদ সর্বশেষ খাদেমের মাধ্যমে ফেরেশতা জানতে পারবে এবং দরজা খোলা হবে। ফেরেশতা এসে সালাম দিবে এবং প্রস্থান করবে।^{৮২}

ইবাদতের কষ্ট দূর হয়ে যাবে

হযরত ওয়াহাব রা. বলেন, জান্নাতে একটি গাছ আছে যার নাম হচ্ছে তুবা। এক হাজার বছর এই গাছের ছায়ায় একটি সাওয়ারী ভ্রমণ করে শেষ করতে পারবে না। সেই গাছ ফুলের কলির মত তরুতাজা হবে। তার পাতাগুলো হবে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট। তার ছাল হবে আশ্বরের মত সুঘ্রাণ। তার মাটি হবে কাফুর। তার শিকড় থেকে শরাব, দুধ এবং মধুর নহর প্রবাহিত হবে। তার তলদেশ দিয়ে জান্নাতীদের মজলিস বসবে। তারা মজলিসে বসে থাকবে, তাদের পাশ দিয়ে ফেরেশতারা উট নিয়ে আসবে। শিকলগুলো হবে সোনার। তাদের চেহারাগুলো প্রদীপের আলোর মত চমকাতে থাকবে। চুলগুলো রেশমের মত কোমল ও মসৃণ হবে। তার ওপর সোনার প্রলেপ থাকবে। রেশমের ঝালর থাকবে। ওই উটগুলো তাদের সামনে হাজির করবে। তারা বলবে, এই সাওয়ারীগুলো আপনাদের জন্য পাঠানো হয়েছে। আপনাদেরকে আল্লাহর দরবারে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারা এই উটের ওপর সাওয়ারী হবে। উটগুলো পাখির গতির চেয়েও দ্রুত চলবে। জান্নাতীরা একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে চলবে। উটের কানের সাথে কান মিলবে না। তারা পূর্ণ আনুগত্যের সাথে চলতে থাকবে। রাস্তায় যে গাছ সামনে থাকবে তা নিজে নিজে সরে যাবে। কোনো সাথী তার সাথী থেকে পৃথক হতে হবে না। এভাবেই তারা পরম দয়াময়, দয়ালু প্রভুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা নিজের চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে দিবেন। তারা নিজেদের প্রভূকে দেখবে এবং বলবে, “হে প্রভূ! তুমি শান্তিময়, তোমার থেকেই শান্তি এবং তুমিই সম্মান ও প্রতিপত্তির মালিক”। তার উত্তরে আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, “আমিই শান্তি এবং আমার পক্ষ থেকেই শান্তি।” তোমার ওপর আমার রহমত ও মুহাব্বত অগ্রগামী হয়েছে। আমার ওই সব বান্দাদের অভিনন্দন যারা আমাকে না দেখে ভয় করে। আমার আনুগত্য করে। জান্নাতীরা আল্লাহকে বলবে, আমরা না তোমার ইবাদতের হক আদায় করেছি, না তোমার মর্যাদা রক্ষা করেছি। আমাদের অনুমতি দিন আমরা আপনাকে সিজদা করব। আল্লাহ বলবেন, এটা ইবাদতের স্থানও নয়, পরিশ্রমেরও নয়। এই স্থান হচ্ছে নেয়ামত ও আনন্দে ভরপুর এক স্থান। এখানে ইবাদতের কষ্টের কোনো সুযোগ নেই। এখন তো শুধু আনন্দের সময়। যা চাইবে তাই পাবে। তোমাদের মধ্যে যে যা কামনা

করবে আমি তাই দিব। সুতরাং সবাই তাদের চাহিদা মতো কিছু চাইবে। তবে সবচেয়ে কম যে চাইবে সে বলবে, হে প্রভু! দুনিয়াতে তুমি যা কিছু সৃষ্টি করেছ, তোমার বান্দা যার জন্য অনেক কামনা যাচনা করত; আমি চাই দুনিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি যা কিছু সৃষ্টি করেছো সব আমাকে দান কর। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, তুমি তোমার মর্যাদার হিসাবে কিছুই চাওনি। অতএব আমি তোমাকে দিব। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দারা যেসব বিষয় কল্পনায়ও আনতে পারেনি তাদেরকে সে সব বিষয় দাও। তাদেরকে তাই দেওয়া হবে এমনকি তারা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হবে।

তারা এখানে যেসব জিনিস পাবে সবকিছু দ্রুতগামী ঘোড়া হবে। প্রত্যেক চার পায়ের ওপর ইয়াকুতের আসন থাকবে। প্রত্যেক আসনে সোনার পাতনি থাকবে। তাতে জান্নাতের বিছানা হবে। সেই আসনে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন হুর থাকবে। তারা দুই জোড়া অলংকার পরিহিত থাকবে। যার মধ্যে জান্নাতের সব রং ও সুগন্ধ থাকবে। ওই তাঁবুগুলোর বাইরে তাদের চেহারা এতটাই চমকাতে থাকবে মনে হবে তারা বাইরে বসে আছে। তাদের পায়ের গোড়ালির ভেতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে। প্রত্যেকে একে অপরের ওপর এমন শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত থাকবে যেমন সূর্যের পাথরের ওপর। জান্নাতীর দৃষ্টিতেও এই দু'জন এমনই হবে। তারা তাদের কাছে গিয়ে আদর করবে। এই দুই হুর তাদের দেখে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের তো কখনও মনেও হয়নি আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মত স্বামী মিলিয়ে দিবেন। তারপর আল্লাহর নির্দেশে এভাবেই সারিবদ্ধভাবে সাওয়ারীর ওপর তারা ফিরে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছবে। কল্পনা করুন মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে কত নেয়ামত দান করেছেন। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির নিরেট মুক্তার তৈরী সুউচ্চ মহলে বসবাস করবে। তার দরজাগুলো হবে সোনার। তার কাঠগুলো হবে ইয়াকুতের। বিছানা হবে নরম ও মোটা রেশমের। মিস্বর হবে নূরের। যা সূর্যের আলোর চেয়েও প্রখর উজ্জ্বল, আলোকিত হবে। সর্বোচ্চ স্থানে তাদের মহল বা নিবাস হবে। ইয়াকুত নির্মিত হবে সেই নিবাসগুলো যাতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাদের চোখকে নিরাপদ রাখবে। যেসব মহল লাল ইয়াকুতের হবে তাতে সবুজ রেশমি বিছানা হবে। আর যে মহল হলুদ ইয়াকুতের হবে তাদের বিছানা লাল মখমলের হবে। যা যমরদ

এবং সোনার কারুকাজ খচিত হবে। আসনগুলোর পা থাকবে জাওহারের, তার ছাদ হবে মুক্তার, তার টাওয়ার হবে মারজানের। তাদের পৌছার আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়া তোহফা সেখানে পৌছে যাবে। সাদা ইয়াকুতি ঘোড়া গিলমানসহ দাঁড়িয়ে থাকবে। সেইসব বস্তু হবে রুপার এবং ঐ আসনের ওপর উন্নত ও নরম রেশমের বিছানা থাকবে।

তারা এইসব সাওয়ারীর ওপর আরোহন করে জান্নাতে চলে যাবে। তারা সেখানে দেখতে পাবে তাদের ঘরের পাশে নূরানী মিস্বরের ওপর ফেরেশতারা তাদের অভ্যর্থনার জন্য বসে আছে। তারা তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে। মুবারকবাদ জানাবে। কুশল বিনিময় করবে। তারপর তারা নিজেদের কামরায় প্রবেশ করবে। সেখানে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ তোহফা দেখতে পাবে। নিজেদের মহলের পাশে দু'টি সবুজ ও ফলে পরিপূর্ণ বাগান দেখতে পাবে। তার মধ্য দিয়ে দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। সব ধরনের ফল থাকবে। আর তাঁবুর ভেতরে পবিত্র সতী-স্বাধ্বী পর্দানশীন ছুরেরা থাকবে। তারা সেখানে পৌছে যখন আরাম বা বিশ্রাম নিবে সে সময় আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, আমার প্রিয় বান্দারা! তোমরা আমার ওয়াদা সত্য পেয়েছো? তোমরা কি আমার প্রতিদানে সন্তুষ্ট? তারা জবাবে বলবে, হে প্রভু! আমরা তোমার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট। আমরা তো তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করতে পারব না। আমরা দিলখোলা আনন্দে মাতোয়ারা। তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, যদি আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট নাই হতাম তবে আমি এই বিশাল মেহমান খানায় তোমাদের কিভাবে আপ্যায়ন করতাম। তোমাদের কিভাবে আমি দেখা দিতাম। আমার ফেরেশতারা কেন তোমাদের সাথে মোসাফাহা করত। তোমরা খুশিতে থাকো। আনন্দ উপভোগ কর। তোমাদের সহস্র অভিনন্দন। তোমরা তৃপ্তি ভরে খাও, পান কর, আমার নেয়ামতসমূহ কখনও শেষ হবে না। সে সময় তারা বলবে, আল্লাহর সত্ত্বাই প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি আমাদের পেরেশানী, চিন্তা, দুঃখ দূর করেছেন। আমাদেরকে এমন এক স্থানে আবাসন করেছেন যেখানে কোনো কষ্ট, যাতনা নেই। সবই তার অনুগ্রহ। তিনি মহান দয়ালু ও পরম কৃতজ্ঞতাজন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী বান্দাকে বলবে,

তুমি চাও। সে চাইতে থাকবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দিতে থাকবে। এমনিভাবে তার সব চাওয়া শেষ হয়ে যাবে। এখন তার সামনে আর কোনো ইচ্ছাই বাকি থাকবে না। আল্লাহ তা'য়ালা তখন তাকে নিজ থেকে স্মরণ করিয়ে দিবেন তুমি এটা চাও ওটা চাও। সে সেসব চাইবে এবং পাবে। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন, তুমি যা কিছু চেয়েছ আমি সবকিছু তোমাকে দিয়েছি। সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসে কুদসিতে আছে, হে আমার বান্দা! তোমাদের আগে পরের সব মানুষ ও জ্বিন এক ময়দানে দাঁড়াবে এবং আমার কাছে দু'আ করবে ও চাইবে। আমি প্রত্যেকের প্রতিটি চাওয়া পূরণ করব। কিন্তু আমার রাজত্ব থেকে এতটুকুও কমবে না যতটুকু কোনো সমুদ্রের পানিতে সূঁচ ভুবিয় পানি তুললে তার অগ্রভাগে যে পরিমাণ পানি থাকে।^{৮৩}

শিক্ষামূলক নসিহত

➤ হযরত আবু যর গিফারী রা. আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! হযরত মুসা আ: এর সহিফা কী ছিল? তিনি বললেন, এই সহিফাতে অনেক শিক্ষণীয় আলোচনা রয়েছে।

(১) আমার সে লোকের ওপর বিস্ময় তৈরি হয় যে মৃত্যুর ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস স্থাপন করে অথচ সে হাসিখুশি থাকে।

(২) আমার সে লোকের ওপর তাজ্জব লাগে যে জাহান্নামে বিশ্বাস করে তারপরও সে হাসতে পারে।

(৩) আমার সে লোকের ওপর তাজ্জব লাগে যে তাকদিরের ওপর বিশ্বাস রাখে তারপরও সে প্রয়োজন ছাড়াই নিজেকে ক্লান্ত রাখে।

(৪) আমার সে লোকের প্রতি আশ্চর্য লাগে যে দুনিয়া দেখেছে এবং এটাও দেখেছে, দুনিয়া হচ্ছে ক্ষনস্থায়ী, কখনও এক জায়গায় তা স্থির থাকে না। কিন্তু সে নিশ্চিত মনে দুনিয়ার সাথে মন বেঁধে রেখেছে।

(৫) আমার সেই ব্যক্তির ওপর তাজ্জব লাগে যে আগামী কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে তবুও সে আমল করে না।^{৮৪}

^{৮৩} তাফসিরে ইবনে কাসীর, খ: ৩, পৃ: ৪৩-৪৪।

^{৮৪} হায়াতুস সাহাবাহ : খ: ৩, পৃ: ৫৫৬।

➤ হযরত উমর রা. নিজের সাহেববাদা হযরত আব্দুল্লাহ রা. কে চিঠি লিখেন।

(১) আমি তোমার প্রতি আল্লাহকে ভয় করার ওসিয়ত করছি। কারণ, যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাকে সব ফেতনা ও বিপদ থেকে রক্ষা করেন। যে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে আল্লাহ তা'য়ালার তার কাজে সহযোগিতা করেন।

(২) যে আল্লাহকে করয দেয়, অর্থাৎ অপরের জন্য নিজের সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে আল্লাহ তা'য়ালার তাকে উত্তম প্রতিদান দেন।

(৩) যে আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ তার নেয়ামত বাড়িয়ে দেন।

(৪) তাকওয়া সব সময় তোমার লক্ষ্যবস্তু এবং তোমার কাজের স্তম্ভ ও ঢাল হওয়া ও তোমার দিলের পরিষ্কারকারী হওয়া উচিত।

(৫) যার নিয়ত নেই তার আমলের গ্রহণযোগ্যতা নেই।

(৬) যে সওয়াবের নিয়তে আমল করে নি সে কোনো সওয়াব পাবে না।

(৭) যার স্বভাবে নম্রতা নেই সে নিজের সম্পদ থেকেও কোনো লাভ অর্জন করতে পারবে না।

(৮) যতক্ষণ পর্যন্ত আগের কাপড় পুরনো না হবে নতুন কাপড় বানানো উচিত নয়। (হায়াতুস সাহাবা: খ:৩, পৃ:৫৬৪)

➤ হযরত উকবা ইবনে আবুসসাহবা রা. বলেন, ইবনে মুলজিম যখন আলী রা. কে খঞ্জর মারলেন হযরত হাসান রা. তার খেদমতে উপস্থিত হলেন। হযরত হাসান রা. কাঁদছিলেন। হযরত আলী রা. বললেন, হে আমার পুত্র! তুমি কাঁদছ কেন? তিনি আরজ করলেন, আমি কাঁদবো না কেন? আজ হচ্ছে আপনার আখেরাতের প্রথম দিন, দুনিয়ার শেষ দিন। হযরত আলী রা. বললেন, চার এবং চারটি জিনিসকে ভালোভাবে রপ্ত কর। এই আটটি জিনিসকে তুমি আঁকড়ে রাখ তবে তোমার কোন আমল তোমাকে ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত হাসান রা. বললেন, হে আব্বাজান! ওই বিষয়গুলো কী? তিনি বললেন,

(১) সবচে' বড় সম্পদ হচ্ছে আকল বা বুদ্ধি। সম্পদের চেয়ে বেশি উপকারী বস্তু হচ্ছে বুদ্ধি ও জ্ঞান।

(২) সবচে' বড় অভাব বা দারিদ্র হচ্ছে বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা।

(৩) সবচে' বেশি একাকিত্ব হচ্ছে নিজের পছন্দ।

(৪) সবচে' বেশি বড়ত্ব হচ্ছে উত্তম আখলাক।

হযরত হাসান রা. বললেন, আব্বাজান চার বিষয় তো হল এখন বাকি চার বিষয় বলেন। তিনি বললেন,

(৫) বেওকুফের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকবে, কারণ সে তোমাকে উপকার করতে করতে এক সময় ক্ষতি করবে।

(৬) মিথ্যাকের বন্ধুত্ব এড়িয়ে চলবে কারণ সে তোমার শত্রুকে তোমার কাছে এনে দিবে। তোমার বন্ধুকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।

(৭) কৃপণের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকবে কারণ যখন তুমি তার কঠিন প্রয়োজন অনুভব করবে সেই সময় সে তোমার থেকে দূরে থাকবে।

(৮) মন্দ স্বভাবের লোকের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকবে কারণ সে তোমাকে ক্ষুদ্র বিষয়ের বিনিময়ে তোমাকে বিক্রি করে দিবে।^{৮৫}

➤ হযরত সাইদ ইবনে মুসাইয়িব র. বলেন, হযরত উমর ইবনে খাতাব রা. মানুষের জন্য আঠারটি কথা বলেছেন, এ সব কথা হিকমত ও জ্ঞানের কথা।

(১) যে তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানী করবে তুমি তাকে তার চাইতে বড় শাস্তি দিতে পারো এভাবে যে তুমি তার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবে।

(২) তোমার ভাইয়ের যে কোন কথা তার ভাল অর্থে ব্যবহারের পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে। তবে যদি এমন হয় তার বক্তব্য কোনোক্রমেই ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না তাহলে ভিন্ন কথা।

(৩) মুসলমানের যবান থেকে যা কিছু বের হয় তুমি তার সুন্দর অর্থ খুঁজে বের করবে। কোনোভাবেই খারাপ ধারণা পোষণ করবে না।

(৪) যে ব্যক্তি নিজে এমন কাজ করে যা আরেকজনকে মন্দ ধারণা পোষণ করতে সুযোগ সৃষ্টি করে তবে সে খারাপ ধারণা পোষণকারীকে তিরস্কার করবে না।

(৫) যে নিজের গোপন কথা লুকিয়ে রাখবে সে তা অর্জন করতে পারবে।

(৬) সত্যবাদী ভাইদের সাথে থাকতে অভ্যাস কর। তাদের ছায়ায় জীবন যাপন কর। কারণ, ভালো ও অনুকূল অবস্থায় তারা তোমার জন্য শোভা এবং দুর্যোগ ও বিপদের মুহূর্তে নিরাপত্তার কারণ হবে।

(৭) সব সময় সত্য কথা বল। সত্য বলতে গিয়ে যদি প্রাণ দিতে হয় তবুও সত্য ত্যাগ করবে না।

(৮) অর্থহীন কাজে সময় অপচয় কর না।

(৯) যে বিষয় এখনও সামনে আসেনি সে ব্যাপারে প্রশ্ন কর না। কারণ যা সামনে আছে তা পূরণ করতেই ফুরসত মিলবে না।

(১০) নিজের প্রয়োজন নিয়ে তার কাছে যেও না যে তোমার সফলতা কামনা করে না।

(১১) মিথ্যা কসমকে খাটো করে দেখো না, তবে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন।

(১২) মন্দ লোকদের সাথে মেলামেশা কর না। তবে তুমিও তাদের সঙ্গে থেকে মন্দ হয়ে যাবে।

(১৩) নিজের শত্রু থেকে নিরাপদে দূরত্ব বজায় রেখো।

(১৪) নিজের বন্ধুর ব্যাপারেও সতর্ক থেকো। তবে সে যদি আমানতদার হয় তবে তার প্রয়োজন নেই। আমানতদার তো সেই হতে পারে যে আল্লাহকে ভয় করে।

(১৫) কবরস্থানে গিয়ে নিজের মনকে নরম কর।

(১৬) আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করলে বিনয় ও দুর্বলতা স্বীকার কর।

(১৭) আল্লাহর নাফরমানী হয়ে গেলে তাঁর কাছে ক্ষমা ও আশ্রয় চাও।

(১৮) নিজের সমস্ত কাজে ওই সব লোকদের পরামর্শ গ্রহণ কর যারা আল্লাহকে ভয় করে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “আল্লাহকে একমাত্র তার বান্দাদের মধ্য থেকে আলেমরাই ভয় করে। -সূরা ফাতের: আয়াত:২৮।

মুখতার অভিশাপ

এক ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। পিতা তার জীবদশায়ই সন্তানদেরকে সম্পদ-সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর দুই ভাইয়ের জমির

মাবাখানে একটি গাছ জন্ম নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে গাছটি হচ্ছে বাবলা গাছ। দুই ভাইয়ের মধ্যে এই সূত্রে ঝগড়া শুরু হয়। একজন বলে এটা আমার গাছ, অপরজন বলে এটা আমার গাছ। অবশেষে এই ঝগড়া আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ত্রিশ বছর পর্যন্ত এই মামলা চলতে থাকে। উভয়ের সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হয়। মামলায় চূড়ান্ত ফয়সালা এই হয়, গাছকে কেটে ফেল। অর্ধেক একজনের ঘরে বাকি অর্ধেক আরেকজনের ঘরে দিয়ে দাও। আল্লাহ তা'য়ালা মূর্থতা, অজ্ঞতা থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন।

বৃদ্ধবয়সে মানুষ যেসব ধাপ অতিক্রম করে

“আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাকে দুর্বল অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন। ওই দুর্বলতার পর তিনি তোমাকে শক্তি দান করেছেন। পুনরায় সেই শক্তির পর তিনি তোমাকে বৃদ্ধ ও দুর্বল বানিয়েছেন। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি সবার ব্যাপারে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং ক্ষমতাশীল।” –সূরা রোম : আয়াত : ৫৪।

ব্যাখ্যা: মানুষের উন্নতি ও অবনতির দিকে দৃষ্টি রাখুন; তার প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে মাটি থেকে। তারপর বীর্ষ থেকে, তারপর জমাটবাঁধা রক্ত থেকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে, তারপর তাকে হাড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ওই হাড়ের ওপর পুনরায় গোশত দেওয়া হয়েছে। তারপর আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয়েছে। তারপর মায়ের পেট থেকে দুর্বল ও হীন অবস্থায় মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। আস্তে আস্তে সে শক্তিশালী হয়। তারপর সে শৈশবের বসন্তে উপনীত হয়। এভাবে যৌবনের কাছাকাছি কৈশোরে উপনীত হয়। তারপর সে যুবকে উন্নীত হয়। সবশেষে বেড়ে ওঠার এই ধারা স্থগিত হয়ে যায়। এখন সে পূর্ণমাত্রার একজন শক্তিশালী পরিণত মানুষ। কিন্তু তারপর পুনরায় তার শক্তি লোপ পেতে থাকে। সে মধ্য বয়সে উপনীত হয়। তারপর সে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়। এভাবে তার জীবনের এই দীর্ঘ সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শক্তির পর দুর্বলতা এটা এক শিক্ষণীয় বিষয়। দেখা, শোনা, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, ধরা-ছোঁয়া সবকিছুর শক্তিই এক সময় কমে যায়। আস্তে আস্তে মানুষের চলৎশক্তি একেবারে রহিত হয়ে পড়ে। তার সব শক্তি পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। শরীরে বলিরেখা দেখা দেয়। চেহারার চামড়া

কুচকে যায়। দাঁত পড়ে যায়। চুল সাদা হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে শক্তির পর দুর্বলতা। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে বৃদ্ধ থেকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সৃষ্টি করা, ধ্বংস করা সবকিছুই তার ক্ষমতার অধীন। সমস্ত মাখলুক তাঁর গোলাম। তিনি সবকিছুর মালিক। তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তাঁর জ্ঞান বা ক্ষমতার মত কারো কোনো শক্তি নেই।

হালাল সম্পদের সদকা আদায় আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন

সহীহ হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি একটি খেজুর সদকা করবে তবে তা হালালভাবে অর্জিত হবে তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের ডান হাতে তা গ্রহণ করবে। তিনি এমনভাবে তা প্রতিপালন করে যেমন তোমরা নিজেদের ঘোড়া বা উটের বাচ্চা প্রতিপালন কর। এমনি ভাবে একটি খেজুর ওহুদ পাহাড় সমান বড় হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালাই হচ্ছেন খালিক, রায়য়াক। মানুষ নিজের মায়ের পেট থেকে নিরাভরণ, মূর্থ ও শক্তিহীন ভূমিষ্ট হয়। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সব জিনিস দান করেন। ধনসম্পদ, রাজত্ব, কামাই, ব্যবসা অসংখ্য নেয়ামত তিনি দান করেন। দু'জন সাহাবীর বয়ান হচ্ছে, আমরা রাসূল সা. এর খেদমতে হাজির হলাম। সে সময় রাসূল সা. কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরাও রাসূলকে সা. তার কাজে সহযোগিতা করলাম। রাসূল সা. বললেন, দেখো! মাথা হেলে গেলেও কেউ রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় না। মানুষ দুনিয়াতে বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত হয়ে আসে। তার শরীরে এক সুতো কাপড়ও থাকে না। আল্লাহ তা'য়ালাই তাকে রিযিক দান করেন। এ জীবনের পর তিনিই তোমাকে মৃত্যু দিবেন। কিয়ামতের দিন তিনিই পুনরায় তোমাকে জীবন দান করবেন। আল্লাহকে ব্যতিত তোমরা যাদের পূঁজা অর্চনা করেছে তাদের কেউ এসবের কোনো একটির ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ তা'য়ালা এককভাবে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তিনিই কিয়ামতের দিন সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাঁর পবিত্র সত্তা যে কোনো শরিক থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তার না কোনো সমকক্ষ আছে, না কোনো সন্তান বা মা-বাবা আছে। তিনি একক, মা-বাবা বা সন্তান থেকে পবিত্র। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

হযরত লোকমান আ: এর উপদেশ বাণী

হেকমতের কারণে মিসকিন লোক বাদশা হয়ে যায় : হযরত লোকমান হাকিমের একটি বক্তব্য আছে, আল্লাহ তা'য়ালাকে যখন কোন কিছু সোপর্দ করা হয় তিনি তার হেফাজত করেন। তিনি তাঁর ছেলেকে এ কথাও বলেছেন, হেকমতের মাধ্যমে মিসকিন লোক বাদশা হয়ে যায়। তিনি বলেন, যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হবে, প্রথমেই ইসলামী তরিকা অনুযায়ী সালাম করবে। তারপর মজলিসের এক কোনে বসে যাবে। অন্যরা চুপ থাকলে তুমিও চুপ থাকবে। যদি তারা আল্লাহর যিকির করে তবে তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণের চেষ্টা করবে। যদি তারা গল্প গুজবে মেতে ওঠে তবে ওই মজলিস ত্যাগ করবে।

বর্ণিত আছে, তিনি যখন নিজের সন্তানকে নসিহত করার জন্য বসতেন, সরিষার দানা ভর্তি একটি থলে নিয়ে বসতেন। প্রতিটি নসিহতের পর তিনি একটি দানা থলে থেকে বের করে নিতেন। এভাবে যখন সে থলে খালি হয়ে গেল তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! এই পরিমাণ নসিহত যদি কোন পাহাড়ের ওপর রাখতাম তবে তাও টুকরো টুকরো হয়ে যেত। সুতরাং তার সন্তানের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, হাবশীদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি জান্নাতীদের সর্দার হবে। এই তিন জন হচ্ছে, লোকমান হাকিম আ., নাজ্জাশি এবং মুয়াযযিন বেলাল রা।^{৮৬}

দীনদার গরীব ব্যক্তি জান্নাতের বাদশা হবে

হযর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতের বাদশা হবেন সেই সব ব্যক্তির যারা জীর্ণশীর্ণ ও অবিন্যস্ত চুলের অধিকারী। ধুলিধূসরিত চেহারার একজন মানুষ। সে আমিরের ঘরে যেতে চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। সে যদি কোন বড় ঘরে সম্পর্ক করতে চায় তবে সে ঘরের মেয়ে তার ভাগ্যে জোটে না। এই মিসকিনদের সাথে কখনও ইনসাফের আচরণ করা হয় না। তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও আশা আকাজক্ষা পূরণ হওয়ার আগে তা নিজে নিজেই শেষ হয়ে যায়। হৃদয়ের আশা হৃদয়েই গুমরে মরে। কেয়ামতের দিন তারা এ পরিমাণ নূর পাবে যদি তা বন্টন করা হয় তবে গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রা. বলেন, মহান আল্লাহর ইরশাদ হচ্ছে, আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি সে যে মুমিন, কম সম্পদ ও সম্বলের অধিকারী, নামাযী, ইবাদত ও আনুগত্যশীল, মানুষের মধ্যে তার তেমন কোন মর্যাদা বা সম্মান নেই, তার দিকে কেউ আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করত না, কিন্তু সে এ সবার ওপর ধৈর্য ধারণ করে। তারপর রাসূল সা. বললেন, তার মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে। তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি অনেক কম থাকে। তার জন্য কান্না করার লোকও অনেক কম থাকে। রাসূল সা. বলেন, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় বান্দা হচ্ছে গরীব, অসহায় ব্যক্তির; যারা দীনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে। যেখানে দীনের কোনো ক্ষতি হবার আশংকা থাকে সেখান থেকে তারা চলে যায়। তারাই কেয়ামতের দিন ঈসা আ. এর সঙ্গে একত্রিত হবে।^{৮৭}

দু'আ চাওয়ার আদাব

(১) দু'আ শুধু আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই চাইবে। তাঁকে ব্যতিত অন্য কারো কাছে কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য আহ্বান করবে না। কারণ দু'আ হচ্ছে ইবাদতের জাওহার। ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার। কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে, “তাকে ডাকাই হচ্ছে একমাত্র হক। এই লোকেরা তাকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে তারা তাদের আহ্বানের কোনো উত্তর দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকা তো হচ্ছে সেই ব্যক্তির সদৃশ যে উভয় হাত পানির দিকে বাড়িয়ে অপেক্ষা করে পানি তার মুখের কাছে আসুক। অথচ পানি কখনও তার কাছে আসতে পারে না। এমনভাবে কাফেরদের দু'আও নিরর্থক হয়ে যায়। কোনো প্রয়োজন পূরণ বা কর্ম সম্পাদনের সব ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তাঁকে ছাড়া অন্য কারো কাছে এই ক্ষমতা নেই। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষি। তিনি ছাড়া আর কেউ বান্দাদের ডাক শোনা বা তাদের দু'আর জবাব দেওয়ার নেই।

“হে মানুষ! তোমরা সবাই আল্লাহ তা'য়ালার মুখাপেক্ষি। আল্লাহ হচ্ছে অমুখাপেক্ষি। তিনি প্রশংসিত।” -সূরা ফাতির: আয়াত:১৫।

নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমার বান্দারা! আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি। অতএব তোমরা একে অপরের প্রতি জুলুম ও বাড়াবাড়ি করা হারাম মনে কর। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি গোমরাহ; তবে সে নয় যাকে আমি হেদায়াত দিব। তাই তোমরা আমার কাছে হেদায়াত কামনা কর। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দিব।

আমার বান্দারা প্রত্যেকে ক্ষুধার্ত তবে সে নয় যাকে আমি খাবার দেই। অতএব তোমরা আমার কাছে রিযিক চাও আমি তোমাদের রিযিক দিব। আমার বান্দারা তোমাদের প্রত্যেকে বস্ত্রহীন তবে যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করাই সে ব্যতীত। তাই তোমরা আমার কাছেই পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে পোশাক পরিধান করাব। আমার বান্দারা তোমরা রাতে গোনাহ কর এবং দিনেও কর, আমি তোমাদের সব গোনাহ ক্ষমা করে দিব।
(সহিহ মুসলিম)

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, “মানুষের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাওয়া উচিত। এমনকি জুতোর ফিতাও যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে আল্লাহর কাছেই চাইবে। যদি লবণের প্রয়োজন হয় তবে তাও তাঁর কাছে চাইবে।
(তিরমিযী)

মোটকথা, মানুষকে তার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র প্রয়োজনের জন্যও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। তিনি ছাড়া দু’আ শ্রবণকারী এবং আশা পূরণকারী আর কেউ নেই।

(৩) নাজায়েয ও অশোভনীয় বিষয়ে দু’আ প্রার্থনা করবে না।

আল্লাহর কাছে এমন কিছুই চাইবে যা হালাল ও পবিত্র। নাজায়েয উদ্দেশ্য এবং গোনাহের কাজে আল্লাহর কাছে হাত তোলা চরম পর্যায়ে বেরাদবী। চূড়ান্ত নির্লজ্জতা। হারাম ও নাজায়েয উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য আল্লাহর কাছে দু’আ করা এবং মান্নত মানা দীনের সাথে নিকৃষ্ট ধরনের উপহাসের শামিল। এমনিভাবে ওই সব বিষয়ের জন্যও দু’আ করবে না যা আল্লাহ তা’য়ালা সৃষ্টিগতভাবে সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন এবং যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেমন, কোনো খর্বাকৃতির মানুষ লম্বা হওয়ার জন্য অথবা কোনো অস্বাভাবিক লম্বা মানুষ কিছু বেটে হওয়ার জন্য বা কেউ সবসময় যুবক থাকার জন্য ইত্যাদি বিষয়ে দু’আ করবে। কুরআনে

ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা প্রতিটি ইবাদতে নিজেদের চেহারা তাঁর দিকে ফেরাও, তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাকো।”

—সূরা আরাফ: আয়াত:২৯।

নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য নাফরমানী পথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যাবে না, বরং ভালো কাজে ও পবিত্র উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করা যাবে।

(৪) ইখলাস ও বিশ্বাসের সাথে দু’আ করতে হবে।

পূর্ণ ইখলাস ও পবিত্র নিয়তের সাথে চাইতে হবে। এই বিশ্বাস নিয়ে দু’আ করতে হবে— যেই খোদার কাছে আপনি দু’আ চাইছেন তিনি আপনার অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন তিনি আপনার প্রতি অধিক দয়ালু। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি নিজের বান্দাদের ডাক শোনে, তাদের দু’আ কবুল করেন। কৃত্রিমতা, রিয়া শিরক থেকে দু’আকে মুক্ত রাখতে হবে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, “তোমরা আল্লাহকে ইখলাসের সাথে ডাকো”

—সূরা বাকারা :আয়াত :১৮২।

আরো ইরশাদ হচ্ছে, হে রাসূল! যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমি তাদের অনেক নিকটবর্তী। কোনো আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার দু’আ কবুল করি, তাই তারা আমার ওপর বিশ্বাস রাখে যেন তারা সঠিক পথে চলতে পারে”।

(৫) পূর্ণ মনযোগ ও হৃদয় দিয়ে দু’আ করা উচিত।

একনিষ্ঠ মনযোগ ও হৃদয়ের গভীর থেকে দু’আ করা উচিত। আল্লাহর কাছে ভালো আশা রাখা উচিত। নিজের গোনাহের বোঝার প্রতি নজর রাখার পরিবর্তে আল্লাহর সীমাহীন রহমত, ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। ওই ব্যক্তির দু’আ প্রকৃত দু’আ নয় যে গাফেল, গুরুত্বহীন ও উদাসীনভাবে নিছক মুখে কিছু শব্দ উচ্চারণ করে। আল্লাহর প্রতি তার কোনো আস্থা বা সুধারণা থাকে না। হাদীসের মধ্যে এসেছে, নিজের দু’আ কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে অন্তর থেকে দু’আ করতে হবে। আল্লাহ এমন ব্যক্তির দু’আ কবুল করেন না যে গাফেল ও উদাসীন অন্তর নিয়ে প্রার্থনা করে। (তিরমিযী)

(৬) বিনয় ও বিনম্র চিত্তে দু'আ করতে হবে।

খুব বিনয় ও বিনম্র চিত্তে দু'আ করা উচিত। আপনার হৃদয় আল্লাহর ভয়, সম্মান, বড়ত্বে কাঁপতে থাকবে। বাহ্যিকভাবেও আপনার শরীরে আল্লাহর প্রতি ভয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে, মাথা ও দৃষ্টি অবনত থাকবে। আওয়াজ খুব নিচু থাকবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো নিস্তেজ পড়ে থাকবে। চোখের পাতা বন্ধ থাকবে। মোটকথা গোটা দেহ থেকে মিসকিন ও অসহায়ত্বের ছাপ বুঝা যেতে হবে। নবী কারিম সা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে নামাযে তার দাঁড়িতে আগুল দিচ্ছে। রাসূল সা. বললেন, তার অন্তরে বিনয় থাকলে তার দেহে সেটার ছাপ পড়ত।

মোটকথা দু'আ করার সময় মানুষের মনে এই কল্পনা করা উচিত, আমি একজন অসহায় মিসকিন ও ফকির। আল্লাহ না করুক এই দরজা থেকে আমাকে খালি হাতে ফিরতে হলে আমার আর কোন ঠিকানা নেই। আমার কোনো সম্বল নেই। আমার যা কিছু প্রাপ্তি তা খোদার থেকেই পেয়েছি। আল্লাহ যদি আমাকে না দেয় তবে আমাকে দেওয়ার মত পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আল্লাহ তা'য়ালাই হচ্ছে সবকিছুর মালিক, তাঁর কাছে সব জিনিসের ভাণ্ডার। বান্দা হচ্ছে ফকির ও অক্ষম। কুরআনে এই হেদায়াত এসেছে, “তোমার প্রভূকে বিনীতভাবে ডাকো”। বান্দা হওয়ার শান হচ্ছে এটাই যে, সে তার প্রভূকে অত্যন্ত বিনয়, অভাবী হয়ে তার কাছে প্রার্থনা করবে। তার সমস্ত সত্তা, চিন্তা ভাবনা, আবেগ অনুভূতি প্রভূর সামনে সমর্পণ করবে। তার বাহির ও ভিতর থেকে অভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবে।

(৭) নীরবে, নিঃশব্দে দু'আ করতে হবে।

নীরবে ও নিঃশব্দে দু'আ করতে হবে। আল্লার কাছে খুব অনুনয় করে চাইতে হবে। কিন্তু এই চাওয়া যদি লোক দেখানো হয় তবে তা না করাই উচিত। বান্দার অক্ষমতা, বিনয় ও ফরিয়াদ একমাত্র আল্লাহর কাছেই হওয়া উচিত। তবে কখনও দু'আ উচ্চস্বরেও করা যেতে পারে। কিন্তু সেটা হয়ত একাকী দু'আ করার সময় বা জামাতের সাথে দু'আ করার মুহূর্তে। সাধারণভাবে নিঃশব্দে দু'আ করা চাই। এ বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে আপনার এই দু'আ ও কান্নাকাটি মানুষকে দেখানোর জন্য যেন না হয়। “তুমি গোপনে ও বিনয়াবনত হয়ে তোমার প্রভূর স্মরণ কর। সকাল সন্ধ্যা

হালকা শব্দে স্মরণ কর। তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। হযরত যাকারিয়া আ. এর শানে তার ইবাদতের আলোচনায় এসেছে, “স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন তিনি নিজের প্রভূকে চুপে চুপে ডেকেছে।”

(সূরা মরিয়ম: আয়াত:৩)

(৮) দু’আ করার আগে কোনো নেক কাজ করুন, অথবা নেক কাজের ওসিলা দিয়ে দু’আ করুন।

দু’আ করার আগে অবশ্যই কোন নেক কাজ করুন। যেমন: কিছু দান সদকা করুন। কোনো ক্ষুধার্তকে খাবার দিন বা নফল নামায পড়ুন অথবা রোযা রাখুন। আল্লাহ না করুক যদি কোনো বিপদে পতিত হোন তবে আপনি নিজের কোনো ভালো আমলের ওসিলা দিয়ে দু’আ করুন। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, তাঁর দিকেই পবিত্র কথা উথিত হয়। আর ভালো কাজ তাকে আরো ওপরে উঠিয়ে দেয়।

নবী করীম সা. একবার এমন তিনজন সাহাবীর আলোচনা করেন, যারা এক অন্ধকার রাতে এক গর্তে আটকে পড়েছিল। ওই লোকেরা নিজেদের নেক আমলের ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু’আ করে তাদের মুসিবত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

ঘটনাটি ছিল এরকম, তিনজন বন্ধু এক রাতে এক গুহায় আশ্রয় নেয়। আল্লাহর ইচ্ছায় পাহাড়ের এক পাথর খণ্ড গড়িয়ে ওই গুহার মুখে পড়ল এবং গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। বিশাল দৈত্যাকৃতির পাথর ছিল। তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সে পাথর সরিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে। তাই তাদের মধ্যে পরামর্শ হলো, প্রত্যেকে নিজেদের জীবনের ভালো কাজের ওসিলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে। আশ্চর্য হচ্ছে আল্লাহ তা’য়ালা তাদের এই ফরিয়াদ শুনেছেন ও তাদেরকে মুক্ত করেছেন।

তাদের একজন বলে, “আমি জঙ্গলে বকরি চরাতাম, এর মাধ্যমেই আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। আমি যখন জঙ্গল থেকে ফিরতাম, প্রথমেই আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে দুধ পান করাতাম। তারপর আমার বাচ্চাদের খাবার দিতাম। একদিন আমি দেরিতে বাড়ি ফিরি। বৃদ্ধ বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েন। বাচ্চারা জেগে ছিল এবং ক্ষুধার্ত ছিল। কিন্তু আমি এটা সহ্য করতে পারিনি, আমার বাবা মার আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করাবো। আবার এটাও

চাচ্ছিলাম না তাদেরকে জাগিয়ে কষ্ট দিব। তাই আমি সারারাত দুধের পেয়ালা হাতে তাদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাচ্চারা আমার পা জড়িয়ে কাঁদছিল। কিন্তু আমি সকাল হওয়া পর্যন্ত এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকি। হে আল্লাহ! আমি এই আমল একনিষ্ঠভাবে তোমার জন্যই করেছি। তুমি এই আমলের বরকতে গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দাও।” এই দু’আর বরকতে পাথরটি একটু সরলো যাতে আসমান দেখা যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি এই বলে প্রার্থনা করল, “আমি কয়েকজন শ্রমিক থেকে কাজ নিয়েছিলাম। সবাইকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দেই। কিন্তু এক ব্যক্তি সে তার মজুরি রেখে চলে যায়। কিছু দিন পর সে যখন তার মজুরি নিতে আসে আমি তাকে বললাম, এই গাভি, বকরি এবং চাকর সব তোমার জন্য, তুমি নিয়ে যাও। সে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, বাস্তবেই এসব তোমার জন্য। তুমি যে মজুরি ফেলে রেখে চলে গেছ, আমি তা ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছি, আল্লাহ তাতে বরকত দিয়েছেন। তুমি যেসব পশু ও সম্পদ দেখছ সব সেই অর্থের ফসল। তুমি নিশ্চিত মনে এইসব নিয়ে যাও। সে ব্যক্তি সবকিছু নিয়ে চলে গেল। হে খোদা! আমি এই কাজ একমাত্র তোমাকে রাজি খুশি করার জন্য করেছিলাম। হে খোদা! তুমি এই আমলের বরকতে গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দাও।” আল্লাহর মেহেরবানীতে পাথর আরো সরে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি মোনাজাতে বলল, আমার এক চাচাত বোন ছিল, তার সাথে আমার গভীর ভালোবাসা ছিল। সে আমার কাছে কিছু অর্থ চায়। আমি তাকে টাকা দেই। কিন্তু আমি যখন আমার মনের চাহিদা মেটানোর জন্য তার কাছে বসি সে আমাকে বলে, আল্লাহকে ভয় কর এবং এই কাজ থেকে বিরত থাকো। আমি সাথে সাথে তার কাছ থেকে উঠে গেলাম এবং সেই টাকা তাকে হাদিয়া দিলাম। হে আল্লাহ! তুমি ভালো করে জানো আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এই কাজ করেছি। হে আল্লাহ! তুমি এই আমলের বরকতে গুহার মুখ খুলে দাও” আল্লাহ তার ফরিয়াদ শুনলেন, গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে তিনজনকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

(৯) নেক কাজে প্রতিযোগিতা ও হারাম কাজে বিরত থাকতে হবে।

নেক উদ্দেশ্যে দু'আ করার পাশাপাশি নিজের জীবনকে আল্লাহর হেদায়াত মোতাবেক পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে। গোনাহ ও হারাম কাজ থেকে পরিপূর্ণ রূপে বিরত থাকতে হবে। প্রত্যেক কাজে আল্লাহর হেদায়াত ও নির্দেশের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে খোদাভীরুতার খেয়াল রাখতে হবে। হারাম উপার্জনের খাবার, পানীয়, পোশাক ব্যবহার করে এবং নির্দিধায় হারাম সম্পদে নিজের দেহকে প্রতিপালন করে দু'আ করলে সেই দু'আ কবুল হওয়ার আশা করা হচ্ছে নিতান্ত বোকামী ও ধৃষ্টতা। দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে মানুষের কথা ও কাজ পরিপূর্ণভাবে দীনের হেদায়াত মোতাবেক হতে হবে। নবী কারিম সা. বলেন, “আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সম্পদ কবুল করেন, আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদেরকে এ কথারই তাগিদ দিয়েছেন। তিনি রাসূলদের এই মর্মে নির্দেশ করেছেন: হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র রিযিক খাও এবং নেক আমল কর।”

—সূরা মুমিনুন: আয়াত : ৫১।

“হে ঈমানদারগণ! হালাল ও পবিত্র সম্পদ আমি তোমাদেরকে দান করেছি, তোমরা তা থেকে খাও।”

—সূরা বাকারা: আয়াত:১৭২।

তারপর রাসূল সা. এমন এক ব্যক্তির আলোচনা করলেন, যে দীর্ঘ সফর শেষে পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়। তার চেহারা ধুলিমলিন, সে দু' হাত তুলে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলে, হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাবার, পানীয়, পোশাক হারাম। তার দেহের বৃদ্ধি হারাম অর্থেই হয়েছে। এমন নাফরমান ও বেঈমান ব্যক্তির দু'আ কীভাবে কবুল করা হবে?

(সহিহ মুসলিম)

(৯) আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সব সময় দু'আ চাইতে থাকো

আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সব সময় মাফ চাইতে থাকো। নিজের অপরাগতা, অক্ষমতা ও উবুদিয়াতের প্রকাশও ইবাদত। আল্লাহ নিজেই দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বান্দা যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। দু'আ করে কখনও বিরক্ত হবে না, কখনও এই চিন্তা করবে না দু'আর মাধ্যমে তাকদির পরিবর্তন হবে কি হবে না। তাকদির পরিবর্তন হওয়া, দু'আ কবুল করা বা না করা আল্লাহর

কাজ। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বান্দার কাজ হচ্ছে যে কোনো পরিস্থিতিতে সে মুখাপেক্ষি হয়ে তার কাছে দু'আ করবে। মুহূর্তের জন্যও নিজেকে অমুখাপেক্ষি ভাববে না। নবী কারীম সা. বলেন, “সবচেয়ে বড় অক্ষম হচ্ছে সে, যে দু'আ করতে অপারগ।” (তাবরানী)

নবী করীম সা. বলেন, “খোদার কাছে দু'আ থেকে অধিক সম্মান ও মর্যাদার কোন বস্তু আর নেই”। (তিরমিযী)

(১০) দু'আ কবুল না হলেও দু'আ করতে হবে।

দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। যদি দু'আ কবুল হওয়ার কোনো আলামত দ্রুত দেখা না যায় তবে নিরাশ হয়ে দু'আ ছেড়ে দেওয়ার ভুল কখনও করবে না। দু'আ কবুল হওয়ার চিন্তার পরিবর্তে কেবল দু'আ করার চিন্তা করতে হবে।

হযরত উমর রা. বলেন, “আমার দু'আ কবুল হওয়ার কোন ফিকির নেই। আমার শুধু দু'আ করার ফিকির হয়। আমি যখন দু'আ চাওয়ার তাওফিক পাবো, তবে তার সাথে কবুল হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন হবে।” নবী কারিম সা. ইরশাদ করেন, “যখন কোনো মুসলমান খোদার কাছে কিছু চাইতে তার দিকে হাত বাড়ায়, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রয়োজন অবশ্যই পূরণ করেন। তার জন্য তার চাওয়া পূরণ করে দেন অথবা আখেরাতে তার জন্য জমা রাখেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা এক মুমিন বান্দাকে তার দরবারে ডাকবেন। তাকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে দু'আ করার হুকুম করেছি। আমি এই ওয়াদা করেছিলাম, আমি তোমার দু'আ কবুল করব। তুমি কি আমার কাছে দু'আ করেছিলে? সে বলবে, হে প্রভু আমি দু'আ করেছিলাম। খোদা আবার বলবেন, তুমি আমার কাছে যে দু'আ করেছিলে আমি তা কবুল করেছি। তুমি ওমুক দিন ওই দু'আ করেছিলে? তুমি দু'আ করেছিলে যে বিপদ ও মুসিবতে তুমি আক্রান্ত আমি যেন তোমাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করি। বান্দা বলবে, হে প্রভু সত্য কথা। তারপর খোদা বলবেন, ওই দু'আ কবুল করে দুনিয়াতেই আমি তোমার আশা পূরণ করেছি। অমুক দিন তুমি আরেকবার দু'আ করেছিলে দ্বিতীয় আরেকটি বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু তুমি সে বিপদ থেকে রক্ষা পাওনি। সে বলবে,

নিঃসন্দেহে হে পরওয়ারদেগার! খোদা বলবেন, আমি ওই দু'আর পরিবর্তে জান্নাতে তোমার জন্য বিভিন্ন নেয়ামত জমা করে রেখেছি। এমনভাবে আরো বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পর্কে প্রশ্ন করে এরকম বলবেন। তারপর রাসূল সা. বলেন, মুমিন বান্দার কোনো দু'আ হবে না যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা এই বয়ান দিবেন না যে আমি দুনিয়াতে তোমার এই দু'আ কবুল করেছি। এই দু'আ আখেরাতের জন্য জমা করে রেখেছি। সে মুহূর্তে মুমিন বান্দা ভাববে আমার কোনো দু'আ যদি দুনিয়াতে কবুল না হত। অতএব, সবসময় দু'আ করা চাই। (হাকিম)

(১১) দু'আর সময় ভিতর ও বাহির পবিত্র থাকা উচিত।

দু'আ চাওয়ার সময় বাহ্যিক আদব, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা পুরোপুরি খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি অন্তরকেও নাপাক আত্মা, খারাপ চিন্তা ভাবনা ও অর্থহীন বিশ্বাস থেকে পবিত্র রাখতে হবে। কুরআনে এসেছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারাই যারা অধিক ত্যাগবাকারী এবং অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকে। (সূরা বাকারা: আয়াত :২২২)

“নিজের প্রভূর বড়ত্ব ঘোষণা করুন এবং নিজেকে পবিত্র রাখুন”।

—সূরা মুদাসসির: আয়াত: ৩-৪।

(১২) প্রথমে নিজের জন্য তারপর অপরের জন্য দু'আ করতে হবে।

অপরের জন্যও দু'আ করা চাই, তবে সব সময় নিজের জন্য আগে দু'আ করতে হবে। কুরআনে পাকে হযরত ইবরাহিম আ. এবং হযরত নূহ আ. এর দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। “হে আমার রব! আমাকে এবং আমার আওলাদদেরকে নামায কায়েম করার তাওফিক দান কর। হে প্রভূ! তুমি আমার দু'আ কবুল কর। হে প্রভূ! তুমি আমাকে, আমার মাতা পিতাকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দাও। সে দিন যে দিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। —সূরা ইবরাহিম: আয়াত:৪০-৪১।

হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার মা-বাবাকে ক্ষমা কর এবং ওই সব মুমিনকে ক্ষমা কর যারা ঈমান নিয়ে আমার পরিবারের সদস্য হয়েছে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা কর।

(সূরা নুহ: আয়াত:২৮)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, নবী কারিম সা. যখন কোনো ব্যক্তির আলোচনা করতেন তখন তার জন্য দু'আ করতেন এবং নিজের জন্য আগে দু'আ করতেন। (তিরমিযী)

(১৩) ইমাম সম্মিলিত ও বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে দু'আ করবেন।

আপনি ইমাম হলে সব সময় সবার জন্য এবং বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে দু'আ করবেন। কুরআনে যে সব দু'আ এসেছে তার সবগুলোই ব্যাপক ও বহুবচন শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে।

(১৪) দু'আয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে।

দু'আতে সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে ভুল করে তার রহমত ও বরকত নিজের জন্য সীমাবদ্ধ করে দু'আ করা করা উচিত নয়। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, মসজিদে নববীতে এক বেদুইন আসল। তিনি নামায পড়লেন, তারপর দু'আ করলেন। তিনি দু'আতে বললেন, হে খোদা! তুমি আমার ও মুহাম্মদের প্রতি রহমত নাযিল কর। আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহমত কর না। নবী কারিম সা. বললেন, “তুমি খোদার বিস্তৃত রহমতকে ছোট করে দিয়েছ।” (বুখারি)

(১৫) দু'আয় কৃত্রিমভাবে ছন্দ বানানো থেকে বিরত থাকা চাই।

দু'আয় কৃত্রিম অন্তঃমিলের কোন প্রয়োজন নেই। সাধাসিধাভাবে দু'আ করা চাই। গান বা সুরের প্রভাব মুক্ত থাকা চাই। তবে কোনো চেষ্টা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে কোনো ছন্দোবদ্ধ বাক্য বের হলে অথবা অন্তঃমিল সৃষ্টি হয়ে গেলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। নবী করীম সা. থেকে এমন কিছু দু'আ বর্ণিত আছে যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছন্দ বা অন্তঃমিলের অস্তিত্ব আছে। যেমন রাসূল সা. এর একটি চমৎকার দু'আ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত আছে। “হে প্রভু! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সেই হৃদয় থেকে যাতে বিনয় নেই, সেই আত্মা থেকে যাতে ধৈর্য নেই, সেই ইলম থেকে যা উপকার করে না এবং সেই দু'আ থেকে যা কবুল করা হয় না।”

(১৬) দু'আর শুরুতে আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং রাসূলের সা. ওপর দরুদ ও সালাম থাকতে হবে।

আল্লাহর হামদ ও রাসূলের ওপর দরুদ ও সালামের মাধ্যমে দু'আ শুরু করতে হবে। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালা বা মানুষের কাছে কোন প্রয়োজন হয়, সে প্রথমে ওয়ু করবে, দু'রাকাত নামায পড়বে তারপর আল্লাহর ওপর হামদ এবং রাসূলের ওপর দরুদ ও সালাম পাঠাবে। নবী কারিম সা. এর সাক্ষ্য হচ্ছে, যে দু'আয় আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি হামদ, ছানা এবং নবী কারীম সা. এর ওপর দরুদ ও সালাম পাঠানো হয় তা কবুল করা হয়। হযরত ফুযালা রা. বলেন, নবী কারিম সা. মসজিদে তাশরিফ রাখলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ে দু'আ করলেন। তিনি দু'আতে বললেন, “হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো।” রাসূল সা. এই দু'আ শুনে বললেন, তুমি দু'আ চাইতে খুব তাড়াহুড়া করেছ। নামায পড়া শেষে তুমি হামদ, ছানা পড়ে দরুদ পড়বে। তারপর দু'আ করবে দু'আ কবুল হবে। (তিরমিযী)

(১৭) দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ সময় ও মুহূর্ত।

সব সময় সব মুহূর্তে আল্লাহর কাছে দু'আ কর। কারণ তিনি বান্দাদের দু'আ শুনে কখনও বিরক্তি বোধ করেন না। তবে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বুঝা যায়, কিছু বিশেষ সময় ও মুহূর্ত আছে যখন বিশেষভাবে দু'আ দ্রুত কবুল হয়। তাই সেই বিশেষ মুহূর্তে দু'আ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(১) রাতের শেষ ভাগে যখন সবাই ঘুমের আবেশে নিমজ্জিত, যে বান্দা সে সময় ঘুম থেকে জেগে নিজের প্রভূর দরবারে কান্না ফরিয়াদ করবে, নিজেকে অসহায়, মিসকিন মনে করে প্রভূর দরবারে কান্নাকাটি করবে আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ রহমত নাযিল করেন। নবী কারিম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতি রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। এমনকি যখন রাতের শেষ অংশ বাকি থাকে তিনি বলেন, কে আমাকে ডাকে আমি তার দু'আ কবুল করব। কে আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করব। কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব। (তিরমিযী)

(২) লাইলাতুল কদরে বেশি বেশি দু'আ করবে। কারণ এই রাত আল্লাহর কাছে এক হাজার রাতের চেয়েও উত্তম। বিশেষ করে এই দু'আ বেশি বেশি পড়বে। “আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুয়ঘুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু,

আল্লাহী”। হে আল্লাহ তুমি অনেক ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

(৩) যিলহজের নয় তারিখে যখন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহর মেহমানগণ সমবেত হয়।

(৪) জুমআর দিন বিশেষ মুহূর্তে। জুমআর খুতবা শুরু থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্তবা আছরের নামাযের পর থেকে মাগরিবের নামায পর্যন্ত।

(৫) আযানের সময় ও জেহাদের ময়দানে যখন মুজাহিদরা কাতারবন্দী হয়। নবী কারিম সা. বলেন, দু’টি জিনিস আল্লাহর দরবারে প্রত্যাখ্যাত হয় না। একটি হচ্ছে আযানের সময় দু’আ। দুই. জেহাদের ময়দানে কাতারবন্দী হওয়ার সময় দু’আ। (আবু দাউদ)

(৬) আযান এবং তাকবিরের মধ্যবর্তি সময়। নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তি সময়ের দু’আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা. এই বিরতিতে আমরা কি দু’আ করব? তিনি বললেন, “হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করি এই পৃথিবীতে ও আখেরাতে।”

(৭) রামাযান মাসে বিশেষ করে ইফতারের সময়।

(৮) ফরয নামাযসমূহের পর।

(৯) সিজদারত অবস্থায়, নবী কারিম সা. ইরশাদ করেন, সিজদারত অবস্থায় বান্দা প্রভূর অনেক নিকটবর্তী হয়। অতএব, তোমরা সে সময়ে দু’আ কর।

(১০) আপনি যখন কোনো কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হবেন।

(১১) যখন আল্লাহর যিকির ও ফিকিরের কোনো মজলিস অনুষ্ঠিত হয়।

(১২) যখন কুরআনের খতম করা হবে।

(১৮) দু’আ কবুলের বিশেষ স্থানসমূহ।

হযরত হাসান বসরি রা. যখন মক্কা থেকে বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন, তিনি মক্কাবাসীদের নামে একটি চিঠি লিখেন। এই চিঠিতে তিনি মক্কায় অবস্থান করার গুরুত্ব ও ফযিলত বয়ান করেন। তিনি এই বিষয়টিও পরিষ্কার করেন, মক্কার এগারটি বিশেষ স্থান হচ্ছে দু’আ কবুলের স্থান।

(১) মুলতায়ামের নিকট (২) মিয়াবে রহমতের নিকট (৩) কা'বার ভিতর (৪) যম্বযম কুপের নিকট (৫) সাফা ও মারওয়ার ওপর (৬) সাফা মারওয়ার পাশে যেখানে দৌড়াতে হয় (৭) মাকামে ইবরাহিমের পেছনে (৮) আরাফাতের ময়দানে (৯) মুযদালিফায় (১০) মিনাতে (১১) জামরাতের নিকটে। (হিসনে হাসিন)

(১৯) বর্ণিত দু'আ সমূহের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া চাই।

আপনার এই চেষ্টা করা উচিত যেন আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেন সেই শব্দ ও বাক্য দ্বারা যা কুরআন ও হাদীসে এসেছে। আল্লাহ তা'য়ালার নিজের বান্দা ও পয়গম্বরদেরকে দু'আ চাওয়ার যে ভঙ্গি ও শব্দাবলী শিখিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম শব্দাবলী ও ভঙ্গি কে কোথেকে পাবে? সর্বোপরি আল্লাহর শেখানো এবং রাসূলদের নির্বাচিত শব্দ ও বাক্যে যে প্রভাব, মধুরতা, ব্যাপকতা, বরকত ও করুণীয়ত রয়েছে তা ভিন্ন কোনো বাক্যে কিভাবে সম্ভব? এমনভাবে রাসূল সা. রাত দিনে যে দু'আ করতেন তাতেও যেই স্বাদ, তৃপ্তি, ব্যাপকতা ও উবুদিয়াতের যে প্রভাব সৃষ্টি হয় তার চেয়ে উত্তম দু'আ এবং প্রার্থনার কোনো নথির কল্পনা করাও অসম্ভব।

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশিত দু'আ সমূহের শব্দাবলী ও ভাবার্থে খেয়াল করলে চিন্তা ভাবনার এই খোরাক সৃষ্টি হয় যে, মুমিনের চাওয়া পাওয়া কি হওয়া উচিত। কোনো কাজগুলোতে তার শক্তিসমূহ ব্যয় করা উচিত এবং কোনো কাজগুলোকে নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা উচিত। নিঃসন্দেহে দু'আর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ভাষা বা বাক্যের শর্ত নেই। বান্দা তার প্রভুর কাছে যে কোনো ভাষায়, যে কোনো বাক্যে তার কামনা বা ইচ্ছার কথা জানাতে পারে। কিন্তু এটা খোদার বিশেষ রহমত যে তিনি এটাও বলে দিয়েছেন কিভাবে তাঁর কাছে চাইতে হবে। দু'আর শব্দ শিখিয়ে এই শিক্ষা দিয়েছেন একজন মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্য তার কি দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। কোনো আশা, আকঙ্ক্ষা দিয়ে নিজের মনকে সুসজ্জিত রাখা উচিত। উপরন্তু দুনিয়া ও আখিরাতে ভালো মন্দের এমন কোনো দিক বাকি নেই যার জন্য দু'আ শেখানো হয়নি। এ কারণে উত্তম হচ্ছে, আপনি কুরআন ও হাদীসের নির্দেশিত বাক্যাবলী ব্যবহার করে আল্লাহর কাছে দু'আ চাইবেন। তবে যখন আপনি কুরআন ও হাদীসের

নির্দিষ্ট দু'আগুলো মুখস্ত করতে না পারেন তখন ন্যূনতম এতটুকু করতে পারেন কুরআন ও হাদীসের নির্দেশিত দু'আগুলোর ভাবার্থ আপনি দু'আতে উল্লেখ করবেন। আমরা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশিত কিছু দু'আর নমুনা উল্লেখ করছি। এই বরকতময় দু'আগুলো ধীরে ধীরে মুখস্ত করুন।

(৬৭) আশুরার দিন সংঘটিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আশুরার দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ দিন। ইতিহাসের মহান ঘটনাবলী জড়িয়ে আছে এই দিনটিতে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন:

(১) আশুরার দিন হযরত আদম আ: এর দু'আ কবুল করা হয়।

(২) এই দিনে হযরত নূহ আ. এর কিশতি ভয়াবহ বন্যা থেকে মুক্ত হয়ে জুদির তীরে নোঙ্গর করে।

(৩) এই দিনে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইবরাহিম আ. কে “খলিলুল্লাহ” উপাধি দেন। তাঁর ওপর আগুনকে ফুলের বাগান বানিয়ে দেন।

(৪) এই দিন হযরত মূসা আ. এবং তাঁর কওম বনি ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরআউনের যুলুম ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত করেন।

পেরেশানী থেকে মুক্তির নববী নির্দেশনা

“আল্লাহ যা চাইবেন তাই হবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ পাক সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এই দু'আ পাঠ করবে তাকে সেদিন উত্তম রিযিক দান করা হবে। তাকে মন্দ থেকে হেফাজত করা হবে। যে সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করবে তাকে রাতে উত্তম রিযিক দান করা হবে এবং মন্দ থেকে হেফাজত করা হবে।^{৮৮}

বিসমিল্লাহর বৈশিষ্ট্য

(১) শাইখ দায়রবী র. বলেন, বিসমিল্লাহ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে একটি এই যে, যদি কেউ মুহারররের প্রথম তারিখে বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম একটি কাগজে একশ তেরো বার লিখে নিজের কাছে রাখে তবে তার পুরো জীবনে তার কোনো অশোভনীয় পরিবেশ আসবে না।

(২) কিছু সালেহীনদের থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম বারো হাজার বার পড়ে এবং এক হাজারের পর দু'রাকাত নামায পড়ে। নবী কারীম সা. এর ওপর দরুদ পড়ে এবং আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজনের দু'আ করে। দ্বিতীয়বার বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম পড়ে এবং এক হাজার বার পড়ার পর দু'রাকাত নামায এবং দরুদ শরিফ পড়ে নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে দু'আ করবে। এই নিয়মে পড়তে থাকবে এবং বার হাজার বার পূর্ণ করবে। যে ব্যক্তি এই আমল করবে তার যত বড় প্রয়োজনই হোক না কেন আল্লাহ তা'য়ালা তা পূরণ করে দিবেন।^{৮৯}

(৩) যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম ৭৮৬ বার সাত দিন ধারাবাহিকভাবে পড়বে যেই উদ্দেশ্যে পড়বে চাই তা উপকার পাওয়া বা বিপদ দূর করার উদ্দেশ্যে অথবা ব্যবসার জন্য হোক তা পূরণ হবে।^{৯০}

(৪) খাযিনাতুল আসরার লিননাযিলী গ্রন্থে লিখিত আছে যে ব্যক্তি রাতে শোবার সময় ২১ বার বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম পড়ে শোবে সে মানুষ, জিন, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং আগুন থেকে বেঁচে থাকবে।

(৫) বেহুঁশ মানুষের কানে ৪১ বার বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম পড়ে ফুঁ দিলে তাঁর হুঁশ ফিরে আসে।

(৬) কোনো ব্যথা বা জাদু ইত্যাদিতে আক্রান্ত হলে ধারাবাহিক সাত দিন ১০০ বার করে বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম পাঠ করলে ব্যথা নিরাময় এবং জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে।

(৭) রবিবার সকালে সূর্য উদয়ের মুহূর্তে ৩১৩ বার বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম এবং ১০০ বার দরুদ শরিফ পাঠ করলে গায়েবী রিযিকের দরজা খুলে যাবে।

(৮) বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম ২১ বার লিখে বাচ্চাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলে তারা সমস্ত বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৯) বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম ৬১ বার কোনো কাগজে লিখে যে মহিলার সন্তান বেঁচে থাকে না তাকে তাবিজ পরিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ তার সন্তান জীবিত থাকবে। এই বিষয়টি পরীক্ষিত।

^{৮৯} মুজাররবাতে দায়রবী, পৃ: ৪।

^{৯০} মুজাররবাতে দায়রবী: পৃ:৪।

(১০) যদি কোনো ব্যক্তি বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম ১০১ বার লিখে নিজের ক্ষেতে পুতে রাখে তবে সে জমি বিভিন্ন দুর্যোগ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে।

(১১) একজন নেক ব্যক্তি বলেছেন, যে কেউ বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম ৬২৫ বার লিখে নিজের কাছে রাখবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এমন মর্যাদা দিবেন কেউ তাকে কষ্ট দিতে পারবে না।

(কিতাবুদ দায়ি ও আদদাওয়া, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান পৃঃ)

(১২) ইমাম রাযী র. তাফসিরে কাবীর প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৬৮ বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম এর বরকত লিখতে বলেন, ফেরাউন প্রভু হওয়ার দাবির আগে একটি বাড়ি বানিয়েছে। তার বাইরের দরজায় বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম লিখেছিল। যখন সে খোদায়ী দাবী করে এবং হযরত মুসা আ. তার কাছে আল্লাহর বাণীর প্রচার করে সে করুল করেনি। হযরত মুসা আ. তার ব্যাপারে বদ দু'আ করেন। “হে প্রভু! তুমি এই শয়তানকে কেন সুযোগ দিয়ে রেখেছ? ওহী আসল হে মুসা! সে তো ধ্বংস হওয়ারই যোগ্য, কিন্তু তার দরজায় “বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম” লেখা রয়েছে। এ কারণে সে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ কারণেই ঘরের মধ্যে ফেরাউনের ওপর শাস্তি আসেনি, বরং তাকে ঘর থেকে বের করে সমুদ্রে সলিল সমাধী করেছে।

সুবহানাল্লাহ! যখন একজন কাফেরের ঘরে বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম এর কারণে আযাব থেকে বেঁচে গেল। যদি কোনো মুসলমান নিজের হৃদয় ও দেমাগ এবং যবানে লিখে রাখে তবে সে কেন আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে না।

(১৩) হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযিয দেহলভি র. তাফসিরে আযিযীতে লিখেন, মুফাসসিরীনগণ উল্লেখ করেছেন, যখন নূহ আ. এর তুফান এই দুনিয়াকে ভয়ানক শাস্তির খাবায় ঘিরে ফেলেছে এবং হযরত নূহ আ. তাঁর নির্মিত কিশতিতে আরোহণ করেন তখন তিনিও প্রচণ্ড ভয়ে ভীত, কম্পিত ছিলেন। তিনি ডুবে যাওয়া থেকে মুক্তি ও খোদায়ী শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বিসমিল্লাহী মাজরেহা ও মুরসাহা পড়েন। এই কালিমার বরকতে তিনি কিশতি ডুবা থেকে নিরাপদ ও মুক্ত ছিলেন।

মুফাসসিরীনগণ বলেন, এই অর্ধেক কালিমার মাধ্যমে এত ভয়ানক তুফান থেকে মুক্তিলাভ করেছেন, তাই যে ব্যক্তি সারা জীবন এই কালিমা “বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম” দ্বারা প্রতিটি কাজ শুরু করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে সে কেন নাজাত পাবে না?^{৯১}

(১৪) হযরত সুলাইমান আ. ইয়ামেনের সম্রাজ্ঞি বিলকিসকে প্রথমে চিঠি লিখেন তিনি “ইন্নাহু মিন সুলাইমানা ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম” লিখেন। এই বরকতে বিলকিস তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তাঁর পুরো সাম্রাজ্য হযরত সুলাইমানের আয়ত্বে চলে আসে।^{৯২}

(১৫) হযরত ঈসা আ. একবার কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখলেন, একজন ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি ক’কদম সামনে এগুলেন। ওয়ু করে পবিত্র হয়ে তিনি ফিরে আসলেন। ফিরার পথে দেখলেন সেই কবরে শুধু নূর দেখা যাচ্ছে। সেখানে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে। তিনি অত্যন্ত পেরেশান হলেন এবং আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, আমাকে এর রহস্য বলুন। ইরশাদ হল হে রুহুল্লাহ! এই ব্যক্তি বড় গোনাহগার ও মন্দ লোক ছিল। এ কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সে তার বিবিকে অন্তঃসত্তা রেখে এসেছে। তার ছেলে জন্ম হয়েছে। আজকে তাকে মকতবে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাকে বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম পড়ানো হয়েছে। আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম ওই ব্যক্তিকে আমি শাস্তি দিব যার সন্তান আমার নাম উচ্চারণ করছে।^{৯৩}

(১৬) হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রা. এর নিকট কোন ব্যক্তি বিষ মেশানো পেয়ালা নিয়ে এলো এবং তাঁকে বলল আপনি এই বিষ পান করে যদি সুস্থ ও জীবিত থাকেন তবে আমরা বুঝে নিব আপনার ধর্ম ইসলাম সত্য ধর্ম। তিনি বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম পড়ে ওই বিষ পান করলেন এবং আল্লাহর রহমতে বিষের কোন ক্রিয়া হয়নি।

^{৯১} তাফসিরে আযযীযী: পৃ:১৬, তাফসিরে কাবির রাযী: খ:১, পৃ: ১৬৯।

^{৯২} তাফসিরে কাবির : খ:১, পৃ:১৬৯।

^{৯৩} তাফসিরে কাবির রাযী: খ:১, পৃ: ১৭২।

(১৭) রোম সম্রাট কঠিন মাথাব্যথার পীড়ায় ভুগছিলেন। বিভিন্ন চিকিৎসার পর তিনি হতাশ হয়ে হযরত ফারুকে আযমের কাছে চিঠি লিখলেন, আমি মাথাব্যথায় খুবই পীড়িত আমাকে কোন চিকিৎসা দিন। তিনি তার কাছে একটি টুপি পাঠিয়ে দিলেন। বাদশা যখন সে টুপি পরিধান করতেন মাথাব্যথা ভালো হয়ে যেত আবার যখন খুলে ফেলতেন ব্যথা শুরু হত। সম্রাট যারপরনাই বিস্মিত হল। তিনি টুপি খোলালেন। দেখলেন তার মধ্যে একটি টুকরো ছিল যাতে বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম লেখা ছিল।

(১৮) আলেমরা এটাও বলেছেন দিন রাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়। পাঁচ ঘণ্টার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত। বাকি উনিশ ঘণ্টার জন্য এই উনিশ হরফ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উনিশ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত, ওঠা বসা, চলাফেরা এবং প্রতিটি কাজের মুহূর্তে এই উনিশ হরফের মাধ্যমে বরকত ও ইবাদত অর্জন হয়। বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম এই উনিশ হরফের বরকতে উনিশ ঘণ্টা ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হয়।^{৯৪}

(১০) বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম এর বরকতের মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূল সা. বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি বাইতুল খালায় প্রবেশ করবে সে বিসমিল্লাহ পড়বে। ফলে তার লজ্জাস্থান এবং শয়তানের মধ্যে পর্দা পড়বে। যখন কোনো ব্যক্তি “বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম” বলে বাইতুল খালাতে প্রবেশ করবে জিন বা শয়তানের দৃষ্টি তার লজ্জাস্থানের দিকে পড়বে না। এর প্রভাব যেহেতু এমন যে, শয়তান এবং মানুষের মধ্যে পর্দা পড়ে যায়; তাই আশা করা যায় একজন মুসলমান ও আখেরাতের শান্তির মাঝেও নিশ্চয়ই তা প্রাচীরের কাজ করবে।

(১১) হযরত বাশার হাফি রা. বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম লেখা একটি টুকরো পেলেন। তিনি তা উঠিয়ে নিলেন। তাঁর কাছে দু’ দিরহাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি তা দিয়ে সুগন্ধি কিনে ওই টুকরোতে মাখিয়ে নিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন তিনি আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করেছেন। আল্লাহ তাকে বলছেন, হে বাশার তুমি আমার নামকে সুগন্ধিময় বানিয়েছ। আমি তোমার নামকে দুনিয়া আখেরাতে সুগন্ধিময় বানাব।

(কিতাবুদদায়ী ওয়াদদাওয়া, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, তাফসিরে কাবির: পৃ:১৮১)

এক ইয়াতিম শিশুর হৃদয়বিদারক ঘটনা

সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যার কবরে স্বয়ং রাসূল সা. নেমেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকো।

একজন ইয়াতিম শিশু ছিলেন। তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। চাচা তাকে লালন-পালন করছিলেন। তিনি যখন যুবক হলেন চাচা উট, বকরি, চাকর দিয়ে তার অবস্থা উন্নত করে দেন। আব্দুল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে শুনলেন এবং তার মনে তাওহীদের প্রতি আগ্রহ জন্ম নিল। কিন্তু চাচাকে এমন ভয় করতেন তিনি ইসলাম প্রকাশ করতে পারেননি। যখন নবী কারীম সা. মক্কা বিজয় থেকে ফিরে এলেন আব্দুল্লাহ চাচাকে বললেন, “প্রিয় চাচা! আমি বছরের পর বছর অপেক্ষা করছি কখন আপনার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি দোলা সৃষ্টি হয়। আপনি কখন মুসলমান হন। কিন্তু আপনার অবস্থা আগের মতই রয়ে গেছে। আমি নিজের বয়সের ওপর ভরসা করতে পারছি না, আপনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের অনুমতি দান করুন।” চাচা উত্তর দিলেন, দেখো তুমি যদি মুহাম্মদের দীন কবুল করতে চাও তবে আমি তোমার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিব। তোমার গায়ের চাদর ও পরনের লুঙ্গি পর্যন্ত থাকবে না। আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন, চাচাজান! আমি অবশ্যই মুসলমান হব। আমি মুহাম্মদের আনুগত্য স্বীকার করব। শিরক ও মূর্তি পূজা থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। এখন আপনার যা মন চায় করুন। আমার কাছে যে সম্পদ রয়েছে আপনি সবকিছু ছিনিয়ে নিন। আমি জানি এই সব সম্পদ একদিন এখানে ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। এই ক্ষণস্থায়ী সম্পদের জন্য আমি সত্য ধর্মকে ত্যাগ করতে পারব না।”

আব্দুল্লাহ এই কথা বলে কাপড় খুলে মায়ের কাছে গেলেন। মা এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন। আব্দুল্লাহ বললেন, আমি মুমিন এবং একত্ববাদী হয়েছি। আমি নবী কারীম সা. এর খেদমতে যেতে চাই। আমার লজ্জা ঢাকার জন্য কাপড়ের প্রয়োজন, মেহেরবানী করে তা দিন। মা তাকে একটি কম্বল দিলেন। আব্দুল্লাহ কম্বলকে দু’ টুকরো করলেন। এক টুকরো তিনি লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করলেন। আরেক টুকরো চাদর হিসাবে ব্যবহার করলেন। তারপর মদিনার দিকে রওয়ানা করলেন। সকালে তিনি মসজিদে

নববীতে পৌঁছলেন। মসজিদের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাসূলের সা. অপেক্ষা করতে থাকলেন। নবী কারিম সা. যখন মসজিদে পৌঁছলেন তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন তুমি কে? তিনি বললেন, আমার নাম আব্দুল উয্য়া, আমি একজন ফকির ও মুসাফির, হেদায়াত ও সৌন্দর্যের পাগল হয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। নবী কারীম সা. বললেন, তোমার নাম আব্দুল্লাহ। ‘যুলবিজদাইন’ হচ্ছে তোমার উপাধী। তুমি আমার কাছেই থাকবে এবং মসজিদে অবস্থান করবে। আব্দুল্লাহ আসহাবে সুফফাতে শামিল হলেন। নবী কারিম সা. থেকে কুরআন শিখতেন। সারা দিন তিনি আশ্চর্যরকম আনন্দ ও উদ্যম নিয়ে মসজিদে সময় অতিবাহিত করতেন।

একবার হযরত উমর ফারুক রা. বললেন, লোকেরা নামায পড়ছে আর এই বদু এমন উঁচু আওয়াজে যিকির করছে অন্যদের তেলাওয়াতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। নবী কারিম সা. বললেন, উমর! তাঁকে কিছু বলবে না, সে তো আল্লাহ ও রাসূলের সা. জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে।

আব্দুল্লাহর সামনে তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। তিনি রাসূলের সা. খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দু’আ করুন, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে চাই। রাসূল সা. বললেন, যাও কোনো গাছের বাকল নিয়ে আসো। আব্দুল্লাহ বাকল নিয়ে আসলে রাসূল সা. সেই বাকল তার বাহুতে বেঁধে দিলেন এবং মুখে বললেন, “হে প্রভু! আমি কাফেরদের কাছে তাঁর খুন হারাম করছি”। আব্দুল্লাহ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো শাহাদাতের তামান্না করছি। নবী কারীম সা. বললেন, যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হবে এবং জ্বর বা অসুখে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে তাতেও তুমি শহীদ হবে।”

তাবুক পৌঁছে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং ইত্তিকাল করলেন। বেলাল ইবনে হারেস মুযনী রা. বলেন, আমি আব্দুল্লাহর দাফনের ব্যবস্থা দেখেছি। রাতের সময় ছিল, হযরত বেলালের হাতে ছিল প্রদীপ। হযরত আবু বকর ও উমর রা. এর হাতে তার লাশ কবরে রাখা হয়েছে। নবী কারিম সা. ও তার কবরে নামলেন। হযরত আবু বকর উমর রা. কে বলছিলেন, আমার ভাইকে আমার কাছে দিন। রাসূল সা. নিজ হাতে তাঁর কবরে মাটি রেখেছেন। তারপর তিনি দু’আ করেছেন, হে আল্লাহ আমি

তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কতইনা ভালো হত যদি সে কবরে আমাকে দাফন করা হত।^{৯৫}

কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার বন্ধন চরকার কাঠির ন্যায় হবে

মুসনাদে আহমদে এসেছে, কেয়ামতের দিন আত্মীয়তাকে সামনে রাখা হবে। তার বন্ধন চরকার কাঠির ন্যায় হবে। সে অনেক পরীক্ষার করে বলবে, তাকে কেটে দেওয়া হবে যে তার সাথে সম্পর্ক ছিল করত। আর তাকে মেলানো হবে যে তাকে মেলাতো। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হচ্ছে, আত্মীয়দের সাথে কথাবার্তা, কাম কাজে সুন্দর ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। তাদের আর্থিক প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা করা। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারী শরিফে এসেছে, যখন আল্লাহ তা'য়ালা মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, তখন আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে ছিল এবং রহমানের সাথে মিশে ছিল। তাকে প্রশ্ন করা হল তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি সম্পর্ক ভাঙ্গার থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট থাকবে না যে তোমার সাথে যে সম্পর্ক জুড়বে আমি তাকে আমার রহমতের সাথে মিলাব এবং তোমার সাথে সম্পর্ক ছিল করব আমি তাকে আমার রহমত থেকে বঞ্চিত করব। সে বলল, অবশ্যই আমি তাতে সন্তুষ্ট থাকব।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি প্রশস্ত রিযিক এবং দীর্ঘ জীবন পেতে চায় সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, আত্মীয়তা আরশের সাথে ঝুলান আছে। সে বলে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নিজের রহমতের সাথে মিলাবেন। আর যে সম্পর্ক ছিল করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নিজের রহমত থেকে ছিন্ন করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সা. আমি আমার কিছু আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি,

^{৯৫} মাদারিজুননবুওয়াত, খ:২, পৃ:৯০-৯১, সীরাতে ইবনে হিশাম: খ:২, পৃ: ৫২৭-৫২৮।

তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। আমি তাদের সাথে ইহসান করতে চাই তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখি। তারা আমার সাথে মুর্থসুলভ আচরণ করে। রাসূল সা. বললেন, তুমি যদি প্রকৃতই এমন হয়ে থাকো, আমি বলছি তুমি তাদের মুখে গরম ছাই দিচ্ছে অর্থাৎ তাদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করছো। আর তুমি যতদিন পর্যন্ত এই ব্যবহার বজায় রাখবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী ফেরেশতা থাকবে।

জিবরিল আ. হযর সা. কে দু'আ শিখিয়েছেন

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী কারীম সা. বলেন, যখন কোনো বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করে হযরত জিবরিল আ. তাশরিফ আনেন এবং বলেন, এই দু'আ পড়। অনুবাদ- আমি ভরসা করছি সেই সত্তার ওপর যিনি চিরঞ্জিব কখনও মৃত্যু বরণ করেন না। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তাঁর সাম্রাজ্যে তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করুন।^{৯৬}

ঘরের চাকর এবং প্রতিবেশীদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকুন

গোটা দুনিয়া জানে মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত। বাবা হচ্ছেন সেই বেহেশতের দরজা। এমনভাবে এ কথাও সত্য, বউয়ের হাতে জান্নাত ও জাহান্নামের চাবি। তবে বউয়ের ইচ্ছাধীন সে কোনো চাবি ব্যবহার করবে। সামাজিক অবস্থার খোঁজ খবর নিলে জানা যায় অধিকাংশ বউ জাহান্নামের চাবি ব্যবহার করে। এ কারণেই অধিকাংশ ঘর থেকে শান্তি ও নিরপত্তা বিদায় নিয়েছে। বরকত শূন্য হয়েছে। স্বচ্ছলতা বিদূরিত হয়েছে। ঘর তো নয় এক টুকরো জাহান্নাম। আপনি সব সময় অস্থিরতায় সময় পার করেন। পুরো পরিবারে তার প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিবেশী এবং মহাল্লায় আপনার চর্চা চলতে থাকে। আপনাকে দেখে লোকেরা নাক সিঁটকায়। বিরক্তির পরও আপনার সাথে সাক্ষাতে বাধ্য হয়ে মুচকি হাসি দেয়। কিন্তু এসবের কিছুই আপনি জানেন না। কারণ আপনি মনে করেন ঘরের বিষয় একান্তই ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু আপনার চাকর

চায়ের বিনিময়ে আপনার ঘরের সব কথা মুখরোচক বানিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে সরবরাহ করে। প্রতিবেশী আপনার বিষয়টিকে মহল্লাবাসীদেরকে প্রচার করার দায়িত্ব পালন করে। সাধারণ কথা, হালকা তিক্ততা, সামান্য ভুল বোঝাবুঝি আপনার বংশের মান মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে যথেষ্ট। যার প্রভাব আপনার বংশেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং আগত বংশধরদেরকেও তার মাশুল দিতে হয়। পাশাপাশি সন্তানদের হবু আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। আপনি ভালো সম্পর্কের চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু শত চেষ্টা করেও আপনি সফল হতে পারেন না। কারণ হচ্ছে, আপনার অতীতের পারিবারিক সমস্যা যার স্বাদ প্রতিবেশীরা আস্বাদন করেছিল তারা এখন অনুসন্ধানকারীদের গুভাকাজক্ষী হয়। তারা তাদেরকে বলে, ছেলের মায়ের মেযাজ অনেক গরম। নিজের শাশুরির সাথে তার কখনও বনিবনা হয়নি। এখন ভাবুন কোনো বোকা বাবা মা এমন সংবাদ পাওয়ার পর নিজের মেয়েকে আপনার পুত্রবধু বানানোর জন্য রাযি হবে? এভাবেই আপনার কৃতকর্মের ফলাফল আপনার প্রিয় সন্তানের পথে কাঁটা হতে পারে। আপনার কড়া মেযাজ, আপনার শশুর শাশুড়ীর সাথে আপনার ব্যবহারের মধ্যে আপনার মেয়ের মেযাজের যোগসূত্র খুঁজে পাবে। পরিণতিতে আপনার মেয়ে অনিন্দ্য সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতি সবদিক থেকে একজন গুণবতি ভালো বধু হতে পারে, ভালো পরিবার তাকে নিজেদের পুত্রবধু করার জন্য প্রত্যাশা করে। কিন্তু আপনার মেযাজের ব্যাপারে সমাজে যে খবর প্রচার হয়েছে, আপনার মেয়েকে যে ভালো বর, পরিবার ও ঘর পেতে পারত তা থেকে বঞ্চিত করবে।

আপনাকে আপনার শশুর পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজের প্রিয় ও সমাদৃত হওয়ার জন্য খুব বেশি কিছু করার প্রয়োজন নেই, বরং তার জন্য আপনাকে যা করতে হবে, ইসলাম ও প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথ ও নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি আপনার কাছের বিদ্রোহীদেরকে আপনার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

মেয়েদেরকে নিজের মায়ের কাছ থেকে শশুর বাড়িতে যাওয়ার আগে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। কারণ এখন আপনি আপনার প্রকৃত ঘরে যাচ্ছেন যেখানে আপনাকে আজীবন থাকতে হবে এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের নিয়ম জানতে হবে। শাশুড়ি ও শশুরই হচ্ছে আপনার প্রকৃত মা

বাবা। দেবর ও ননদেরা হচ্ছে আপনার আপন ভাই বোন। যেভাবে মায়ের বাড়িতে সবাই মিলে আপনাকে সম্ভষ্ট রাখার জন্য চেষ্টা করত, আপনার চাহিদাগুলোকে বিশেষভাবে মর্যাদা দেওয়া হত। ঠিক সেভাবে সে কাজটি এখন আপনাকে শশুর বাড়িতে করতে হবে। এখন আপনাকে সবার খুশি ও আনন্দ দিতে হবে। তাদের ইচ্ছা ও চাহিদার প্রতি বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে। এ সব আপনার বাম হাতের খেলা। প্রথমে আপনাকে সব সম্পর্ক জুড়ে রাখতে হবে। দ্বিতীয় নিজের দায়িত্বসমূহ ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। হৃদয়কে প্রশস্ত রেখে সব সময় কোরবানীর মানসিকতা নিয়ে চলতে হবে। নিজের ভিতরের বিদ্রোহী সত্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সব সময় মুখে মিষ্টি কথা রাখতে হবে। সবার চাহিদা ও প্রত্যাশা থেকে এক কদম আগে থাকতে হবে। এভাবে চলে দেখুন শশুরবাড়ির প্রত্যেক সদস্য আপনাকে অন্তর থেকে ভালোবাসা, মর্যাদা ও সম্মান দিবে। যেখানে দু'জন মানুষের মাঝে সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তি নির্মিত হয় সেখানে সমস্ত সমস্যা মিটে যায়। আপনার সুনামের কারণে আপনার সন্তানেরা দুনিয়ার সব ময়দানে সফলতার স্বাক্ষর রাখবে। আপনার বৃদ্ধাবস্থা নিরাপদ ও শান্তিময় হবে। আপনার জীবন সফল হবে, ঘর হবে জান্নাতের নমুনা। মা বাবার এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত মেয়েরা সব সময় পরের ঘরের হয়। তাই তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। মেয়ে যখন বিয়ের পর শশুরবাড়িতে যায় কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় শশুর বাড়ির নিয়ম কানুন, স্বামীর পছন্দ বা অপছন্দের ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান থাকে না। এমন ক্ষেত্রে মেয়ের কাছ থেকে অনেক ভুল হয়ে যায়। পরিবারে তখন ঝগড়া ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। এ কারণে বাবা মার কর্তব্য হচ্ছে, তারা নিজের মেয়েদের ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন। আগে থেকেই শশুর পরিবারের সাথে চলাফেরার নিয়ম ও আচার আচরণ শেখাবে। তবে অনেক সমস্যা এমনিতেই কেটে যাবে। এই শিক্ষাও দিতে হবে শশুর শাশুড়ি হচ্ছে মা-বাবার মত। অধিকাংশ পরিবারে দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সৃষ্টি হয় এসব থেকেই। বলা হয় দু'হাতেই তালি বাজে। আমরা সেই সব শশুর-শাশুড়িদেরকেও বলব, আপনারা পুত্রবধূদের নিজের মেয়ে মনে করবেন। তাদেরকে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাদেরকে সেরকম ভালোবাসা ও স্নেহ দিতে হবে যেমনটি নিজের

সন্তানদের জন্য পছন্দ করা হয়। অধিকাংশ পরিবারে ঝগড়ার সূচনা হয় কানকথা শোনার কারণে। শাশুড়ি ও বউয়ের মধ্যে এই সমস্যাটি বেশি দেখা দেয়। কারণ উভয়েই কাঁচা কানের অধিকারী। এ কারণে উভয়কেই যে কাজটি করতে হবে তারা পরস্পরে এই প্রতিজ্ঞা করবে যে, কোনো বিষয়ে মন্দ ধারণা করার আগে বিষয়টিকে ভালোভাবে জানবে। অপরের কথা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করার আগে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করবে। তবেই জীবন সহজ হয়ে যাবে।

নারীর সুকীর্তি হচ্ছে তার রূহের পরিচ্ছন্নতা

প্রতিটি মানুষ সব সময় সুস্থ থাকতে চায়। এভাবে মেয়েরাও সুস্থ থাকতে চায়। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে আরো একটি জযবা থাকে। তারা সৌন্দর্য ও রূপচর্চা করতে পছন্দ করে। উভয় জযবা আমাদের শরীরের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ সুস্থ ও সুন্দর থাকার জযবা। কিন্তু কখনও আপনি ভেবেছেন, আপনি আত্মারময়লা, আত্মারসুস্থতা, আত্মার সৌন্দর্যের জন্য আপনি কি করছেন?

সাধারণত দেখা যায় মানুষ ভাল খাবার খায়। ব্যায়াম করে, সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করে। এ সব জিনিস আপনার দেহকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে। এই রূপচর্চার মাধ্যমে দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ভাল খাবার এবং মেকআপ ব্যবহারের মাধ্যমে চেহারার ওপর লাভণ্য চলে আসে। চেহারার দাগ দূর হয়ে যায়। প্রত্যেকেই আপনার প্রশংসা করে থাকবে। মেয়েরা আপনার প্রশংসা শুনে আনন্দিত হয়। মেয়েদের যদি সাতরাজ্য মিলে যায় তবুও তারা সে আনন্দ পায় না যতটুকু তারা অন্যরা তাদের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের প্রশংসা করলে পায়।

বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের সাথে আত্মার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আপনার সুন্দর ও সুঠাম দেহের মধ্যে একটি আত্মা থাকে। এই আত্মার পবিত্রতা ও সৌন্দর্য অনেক বেশি গুরুত্ববহ। আত্মাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে যত্নবান ব্যক্তি বাহ্যিকভাবেও সুন্দর হয়ে থাকে। আভ্যন্তরীণভাবে তার সুন্দর ব্যবহার অন্যদেরকে পুলকিত ও নিশ্চিত রাখে। সে তার ব্যবহার ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে অপরের কাছে শুধু প্রিয়ই হন না, বরং মানুষ তাকে সম্মান ও বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে। সাধারণত এমন

লোকদের মধ্যে এটাও দেখা যায় যে, সে বড় থেকে বড় বিপদ সত্ত্বেও নিজের জীবন সাধারণভাবেই অতিবাহিত করতে পারে। তারা কাউকে এটা বুঝতেও দিত না যে, তারা বড় কোন কষ্টে আছে। তাদের কোন বড় অসুস্থতা, সম্পদের অভাব এবং পেরেশানীর মুখোমুখি হলে তারা নিজেদের কাজ এমনভাবেই করতে থাকে যেভাবে তারা সুস্থ জীবনে করত।

আত্মার পবিত্রতা অর্জনকারী নিজের কাজ নিজে করে। সব সময় তাদেরকে উদ্যমি, উৎফুল্ল দেখতে পাবে। কোন রূপচর্চা ছাড়াই তাদের চেহারা অনেক সুন্দর দেখা যায়। কপালে নূর চমকাতে থাকে। এমন কেন হয় আপনি কি কখনও ভেবেছেন? নিঃসন্দেহে এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে তারা আত্মার পরিচ্ছন্নতায় বিশ্বাস করে। এমন লোক নিজের দেহের সৌন্দর্যের চেয়ে নিজের আত্মার লালন পালনে অধিক মনযোগ দেয়। আত্মাকে সুসজ্জিত করে। আত্মার সৌন্দর্য ও খাবার হচ্ছে ইবাদত। নেক ও সৎ মানুষ নিজের আত্মাকে কিভাবে খাবার দেয় এটাও ভাবনার বিষয়। যেমন একজন মা তার সন্তানের পড়ালেখা নিয়ে সব সময় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাচ্চা একটু অসুস্থ হয়ে পড়লে সে সারারাত তার পাশে বসে তার সেবা দেয়। আল্লাহর দরবারে তার সুস্বাস্থ্যের জন্য কান্নাকাটি করে। বাচ্চা যখন সুস্থ হয়ে যায় তার আত্মার খোরাক পায়।

এমনিভাবে আত্মার পবিত্রতা আমরা সেসব লোকদের থেকেও দেখতে পাই যারা নিজের চিন্তার চেয়ে অপরের চিন্তা, দুঃখ, কষ্টকে বেশি প্রাধান্য দেয়। তারা সম্ভাব্য সব চেষ্টা করে। অপরের সাহায্য করতে পারাই আত্মার পবিত্রতার আলামত। তারাই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যারা নিজের আত্মার লালন পালন করতে পারে। যারা নিজেদের আত্মাকে পরের নিন্দা, গীবত, চোগলখোরী, হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখতে পারে। এমন লোক যারা অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে। অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। নিজের আনন্দের কথা ভুলে গিয়ে অপরকে সুখ দেয়।

আত্মা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন। ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা এসব দুর্যোগ এবং আযাব মানুষের ওপর আসে। এই আযাব তখন আসে যখন মানুষের দৈহিক প্রবৃত্তি আত্মার প্রয়োজনের ওপর প্রাধান্য পায়। ধ্বংস, প্রলয় তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা এই সব কথা মানতে

অপ্রস্তুত থাকি। আমরা দিবা স্বপ্নে বিভোর থাকি। যেসব গুনাহের কারণে আমাদের ওপর শাস্তি এসেছে সেই গোনাহ থেকে আমরা তাওবা করি না।

আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েরা। মহিলারা তো হচ্ছে রানী। তারা চাইলে তাদের ঘর গোনাহ থেকে পবিত্র রাখতে পারে। এখনও সময় আছে নিজের হিসাব নিকাশ করার। রোগের চিকিৎসা করার। আমাদের শরীরের যেমন সুস্থতা প্রয়োজন তেমনিভাবে আত্মারও সুস্থতা প্রয়োজন। আমাদের ওপর কোনো বিপদ আসার আগেই আমাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। অন্যদের সাথে নিজেদের তুলনা করা উচিত নয়। অন্যরা কুরআনের মত গাইডবুক পড়েনি। তারা ইসলামের স্বাদের সাথে পরিচিত নয়। তারা পিপাসার্ত; কিন্তু সমুদ্র তাদের থেকে যোজন দূরে। কিন্তু আমরা তো সমুদ্রের অদূরে থেকেও পিপাসার্ত।

আত্মার পিপাসা মেটানো কোন বড় কাজ নয়। মানুষকে নিজের আত্মার সৌন্দর্য ও সুস্থতার জন্য নিছক নিজের আত্মার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন। আজ যদি আমাদের হৃদয় যখমী হয় তবে তার কারণও হচ্ছে আমরা ঘরের মধ্যে অকল্যাণ পুষে রাখছি। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি।

মুহাব্বতকে শিকেয় তুলে রাখছি। বিত্ত বৈভবের পুজারী বনে গেছি। নগ্নতাকে নিজেদের জীবনের মূল্যবান সম্পদ বানিয়ে নিয়েছি। মানুষের দেহে যখন এসব মন্দ স্বভাবের সমাবেশ ঘটবে তার আত্মা কখনও সুন্দর ও পবিত্র হতে পারে না। অবয়বের দিক থেকে সে সুগঠিত, সুঠাম দেহের অধিকারী একজন মানুষের আকৃতি হলেও তাকে প্রকৃত ভাবে সে পর্যায়ে ভাবা যায় না। কারণ যে মানুষের অন্তরে অপরের জন্য কোন দয়া, মায়া অনুভূত হয় না, আরেকজনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না, তাকে না বাহ্যিকভাবে একজন সুন্দর মানুষ বলা যেতে পারে, না অন্তরের দিক থেকে একজন ভালো মানুষ মনে করা যেতে পারে। আত্মার সকল সৌন্দর্য ইবাদত, তাকওয়া এবং পরহেযগারীর ওপর নির্ভরশীল। একজন মানুষের জন্য আল্লাহর ইবাদত করার যে দায়িত্ব রয়েছে, একজন মানুষের জন্য আরেকজন মানুষের প্রতি মায়া মুহাব্বত, সমবেদনা ও সম্মান, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার দায়িত্বও রয়েছে। এই সব সৌন্দর্য মানুষের মধ্যে না থাকলে সে দুনিয়াতেও অপমানিত এবং আখেরাতেও অপদস্থ হবে। তাই মানুষের উচিত তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি আত্মার সুস্থতা ও পবিত্রতা রাখার চেষ্টা করবে।

ক্রোধকে হজম করুন, পছন্দ মত ছর বেছে নিন

হযূর সা. বলেন, যে ব্যক্তি রাগ করার ক্ষমতা রাখে তারপরও সে সংবরণ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তর শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি প্রচার প্রসিদ্ধির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিনয়ের কাপড় পরিধান করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামতের দিন সম্মান ও মর্যাদার কাপড় পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি কারো মাথা নিরাপদে রাখবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামতের দিন বাদশাহীর মুকুট পরাবেন। হযূর সা. বলেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সকল মানুষের সামনে ডেকে এখতিয়ার দিবেন তুমি যে ছরকে পছন্দ করবে সেটি গ্রহণ কর।

বন্ধু নিজের বন্ধুকে কষ্ট দেয় না

একবার রাসূল সা. সাহাবীদেরকে নিয়ে পথ হাঁটছিলেন। একটি ছোট শিশু রাস্তায় খেলাধুলা করছিল। তার মা যখন দেখছিল একটি দল রাস্তা দিয়ে আসছে সে বাচ্চাকে ভয় দেখাচ্ছিল বাচ্চারা তাদের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে পারে। আমার বাচ্চা, আমার বাচ্চা বলে দৌড়ে এসে নিজের বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। এই দৃশ্য দেখে সাহাবারা বললেন, হযূর এই মা তো তার সন্তানকে কখনও আঙুনে ফেলতে পারবে না। তিনি বললেন, “আল্লাহ তা'য়ালাও নিজের প্রিয় বান্দাদেরকে আঙুনে ফেলবেন না।”^{৯৭}

আল্লাহ বান্দার ধ্বংস চাইলে, তার লজ্জা ওঠিয়ে দিবেন

হযরত সালমান ফারসী রা. বলেন, যখন আল্লাহ তা'য়ালা কোনো বান্দার সাথে খারাপ ও ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেন তার থেকে শরম, লজ্জা দূর করে দেন। পরিণামে মানুষ তার সাথে শত্রুতা পোষণ শুরু করে। সে মানুষের সাথে শত্রুতা শুরু করে। এমন অবস্থায় তার থেকে দয়া, মায়া ও আন্তরিকতার গুণ দূর করে দেওয়া হয়। এর ফলে সে মন্দ স্বভাব ও চরিত্র এবং কঠোর স্বভাবের মানুষে পরিণত হয়। এমন অবস্থায় তার থেকে আমানত, সততা তুলে নেওয়া হয়। সে মানুষের সাথে খেয়ানত করতে শুরু

করে। মানুষও তার সাথে খেয়ানত করতে থাকে। এভাবে তার কাঁধ থেকে ইসলামের জোয়াল উঠিয়ে নেওয়া হয়। আল্লাহ তা'য়ালা এবং মানুষ সবাই তাকে লানত করতে থাকে সেও অন্যদের প্রতি লানত করতে থাকে।^{৯৮}

গোপন গোনাহের কারণে মুমিনদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়

হযরত সালেম বিন আবিলজা'দ রা. বলেন, হযরত আবু দারদা রা. বলেন, মানুষকে এ মর্মে বেঁচে থাকা উচিত যে, মুমিনরা তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে, অথচ সে জানতেও পারবে না। তারপর তিনি বললেন, তুমি কি জানো এমন অবস্থা কেন হয়? আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, বান্দা যখন গোপনে আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানী করে আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন। অথচ সে জানতেও পারে না।^{৯৯}

মাছির কারণে একজন জান্নাতে, অন্যজন জাহান্নামে

তারিক বিন শিহাব রা. মারফু বর্ণনায় রেওয়ায়েত করেন, শুধু একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হয়, আরেক ব্যক্তি জাহান্নামে যায়। লোকেরা তাজ্জবের সাথে প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কিভাবে হয়! তিনি বললেন, এক জাতির একটি মূর্তি ছিল। তাদের নিয়ম ছিল কোনো ব্যক্তি তার নামে পাঠা বলি দেওয়া ব্যতীত তার কাছ দিয়ে যেতে পারবে না। ঘটনাক্রমে দুই ব্যক্তি তার কাছ দিয়ে গেল। তারা নিয়ম মারফিক তাদের একজনকে বলল, তুমি মান্নত চড়াও। সে বলল, আমার কাছে তো কিছু নেই। কিছু না কিছু অবশ্যই দিতে হবে। ন্যূনতম একটি মাছি হলেও দিতে হবে। কথা অনুযায়ী সে একটি মাছি বলি দিল, পরিণামে সে জাহান্নামে গেল। তারা তাকে ছেড়ে দিল। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলল, তুমিও কিছু বলি দিয়ে যাও। সে বলল, আমি আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা ছাড়া কারো নামে মান্নত দিতে পারব না। এ কথা শুনে তারা তার গর্দান কেটে ফেলল। সে জান্নাতে প্রবেশ করল।^{১০০}

^{৯৮} হায়াতুস সাহাবা : খ:৩, পৃ:৫৭৪-৫৭৫।

^{৯৯} হায়াতুস সাহাবা : খ: ৩, পৃ: ৩৭২।

^{১০০} আহমদ, তরজমানুস সুন্নাহ : খ: ২, পৃ: ৩৪৪।

আশুরার দিন সংঘটিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

আশুরার দিন অনেক গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ দিন। ইতিহাসের মহান ঘটনাসমূহ এই দিনের সাথে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন,

(১) আশুরার দিন হযরত আদম আ. এর তাওবা কবুল করা হয়।

(২) এই দিনে হযরত নুহ আ. এর কিশতি ভয়ানক বন্যা থেকে নিরাপদ হয়ে জুদির তীরে নোঙ্গর করে।

(৩) এই দিনে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইবরাহিম আ. কে “খলিলুল্লাহ” উপাধী দিয়ে তাঁর জন্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে ফুলের বাগানে পরিণত করেছেন।

(৪) এই দিনে হযরত মুসা আ. এবং তাঁর জাতি বনি ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরআউনের জুলুম, নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

(৫) এই দিনে হযরত সুলাইমান আ. বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেন।

(৬) এই দিনে হযরত আইয়ুব আ. কঠিন রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

(৭) এই দিনে হযরত ইউনুস আ. মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন।

(৮) এই দিনে হযরত ইউসুফ আ. দীর্ঘ বিরতির পর হযরত ইয়াকুব আ. এর সাথে সাক্ষাত করেন।

(৯) এই দিনে হযরত ঈসা আ. জন্মলাভ করেন।

(১০) এই দিনেই ইহুদিদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি আসমানে উত্থিত হন।

এসব হাদীস নয় ২/১২০ পৃ:

কিছু উলামায়ে কেরাম উপরোল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছাড়াও আশুরার দিনের সাথে সম্পর্কিত আরো কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

(১) এই দিনে আল্লাহ তা'য়ালা আসমান, জমিন, কলম এবং হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন।

(২) এই দিনে কেয়ামত সংঘটিত হবে।

(৩) এই দিনে হযরত মুসা আ. এর ওপর তাওরাত নাযিল হয়।

(৪) এই দিনে হযরত ইসমাঈল আ. এর জন্ম হয়।

(৫) এই দিনে হযরত ইউসুফ আ. কে কয়েদখানা থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং মিসরের রাজত্ব মিলে।

(৬) এই দিনেই পৃথিবীতে প্রথমবারের মত রহমতের বৃষ্টি হয়।

(৭) এই দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাদিজা রা. কে বিয়ে করেন।

(৮) এই দিনে অগ্নিপুজারী আবু লুলুর হাতে রাসূলের মুসল্লাতে হযরত উমর ফারুক রা. শাহাদত লাভ করেন।

(৯) এই দিনে কুফার পাপিষ্ঠ ও চক্রান্তকারীরা রাসূল সা. এর দৌহিত্র ও ফাতেমা রা. এর কলিজার টুকরো হযরত হুসাইন রা. কে শহীদ করেন।

(১০) এই দিনে কোরাইশরা কাবা ঘরের গিলাফ চড়াতেন।

(১১) এই দিনে হযরত ইউনুস আ. এর কওমের তাওবা কবুল করা হয়। তাদের ওপর থেকে আযাব হটিয়ে নেয়া হয়।

(১২) এই দিনে হযরত মাও. এনামুল হাসান র. এর ইত্তিকাল হয়।

রাসূল সা. তামিমে দারী রা. কে জামাতা বানানোর ইচ্ছা

হযরত তামিম দারী রা. যখন সিরিয়া থেকে মদিনায় আসেন তাঁর সাথে কিছু প্রদীপ, তেল নিয়ে এসেছিলেন। মদিনায় পৌঁছে তিনি প্রদীপগুলোতে তেল ঢেলে মসজিদে নববীতে ঝুলিয়েছেন। সন্ধ্যা হতেই তিনি সেসব প্রদীপে আগুন জ্বালানেন। এর পূর্বে কখনও মসজিদে নববীতে আলোর ব্যবস্থা ছিল না। রাসূল সা. মসজিদে তাশরিফ রেখে মসজিদকে আলোয় আলোকিত দেখলেন। তিনি জানতে চাইলেন এই আলোর ব্যবস্থা কে করেছেন?

সাহাবারা রা. হযরত তামিমে দারী রা. এর নাম বললেন। রাসূল সা. অসামান্য খুশী হলেন। তাঁকে দু'আ দিলেন। তাঁর সম্পর্কে বললেন, “আমার যদি কোনো মেয়ে থাকত তবে আমি তাকে তামিম দারীর সাথে বিয়ে দিতাম।” ঘটনাক্রমে সে সময় সেখানে নাওফাল বিন হারেস উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের বিধবা মেয়ে উম্মুল মুগিরার প্রস্তাব করলেন। তিনি সেই মজলিসেই উম্মুল মুগিরাকে হযরত তামিম দারীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

হযরত তামিম দারী রা. সিরিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ‘লাখম’ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত এবং খৃস্টান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূল সা. সিরিয়ার ‘ইন’ নামক গ্রামের কিছু অংশ তাঁকে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য লিখিতভাবে দিয়েছিলেন।

কিছু প্রিয়তম নবীর ভালোবাসা তাঁকে স্বদেশের মায়া ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই তিনি নবী সা. এর ওফাতের পর তিন খলিফার যুগ পর্যন্ত মদিনায় বসবাস করেন। হযরত উসমান রা. এর শাহাদতের পর ফিতনা ও দুর্যোগ শুরু হলে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদিনা ছেড়ে নিজের দেশ সিরিয়ায় পাড়ি জমান।

হযরত উমর রা. জামাতের সাথে তারাবী নামায পড়ার প্রচলন শুরু করেন। সেই জামাতে তিনি পুরুষদের ইমাম নির্বাচন করেন হযরত উবাই ইবনে কাবকে এবং মহিলাদের জামাতের ইমাম সাব্যস্ত করেন হযরত তামিম দারী রা. কে। একবার রুহ ইবনে যানবা রা. তামিমে দারী রা. এর কাছে গিয়ে দেখলেন, ঘোড়ার জন্য খাবার পরিষ্কার করছেন এবং বাড়ির লোকেরা তার চারপাশে বসে আছে। তিনি বললেন, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যিনি এই কাজটি করতে পারেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, “যখন কোনো মুসলমান তার ঘোড়ার জন্য খাবার পরিষ্কার করে এবং তাকে খাওয়ায়, প্রতিটি দানার পরিবর্তে তার একটি নেকি অর্জন হয়।” এ কারণে আমি নিজের হাতে কাজ করি যেন সাওয়াব থেকে বঞ্চিত না হই। তিনি একটি মূল্যবান জামা কিনেছিলেন। যখন তিনি শবে কদর পেতেন সেই জামা পরিধান করতেন। হযরত উমর রা. এর খেলাফতকালে একবার হুররা নামক স্থানে আগুন লেগে যায়। হযরত উমর রা. হযরত তামিম দারী রা. এর কাছে এসে এই ঘটনাটি আলোচনা করেন। হযরত তামিম দারী রা. সেখানে পৌঁছে সরাসরি আগুনের ভেতরে ঢুকে আগুন নিভিয়ে সুস্থ নিরাপদে বের হয়ে আসেন। হযরত উমর রা. তাঁকে মদিনার শ্রেষ্ঠতম অধিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করব।

হযর সা. দু’হাত তুলে উম্মতের জন্য এই দু’আ করেছেন। “হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!” তিনি এই বলে কাঁদতে থাকলেন। আল্লাহ তা’য়ালা তখন ইরশাদ করলেন, “হে জিবরিল! তোমার প্রভু তো সবকিছুই ভাল করে জানেন। তবুও তুমি মুহাম্মদের সা. কাছে যাও। তাঁকে প্রশ্ন করবে তিনি কাঁদছেন কেন? হযরত জিবরিল আ. তাঁর কাছে উপস্থিত

হলেন। হযর সা. কে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল সা. বললেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের অবস্থা কি হবে? হযরত জিবরিল আ. ফিরে এসে আল্লাহকে জানালেন। আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, “মুহাম্মদের কাছে যাও, তাঁকে বল আমি তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট রাখব। তোমার দুঃখ বা কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই।”^{১০১}

বিশটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

(১) কেয়ামত তখন হবে যখন যমিনে আল্লাহর নাম নেওয়ার মত কেউ থাকবে না।

(২) মানুষ যখন মিথ্যা বলে ফেরেশতারা তার দুর্গন্ধে একশ মাইল দূরে সরে যায়।

(৩) নেক আমল ও আল্লাহর স্মরণের জন্য নিয়ত জরুরী।

(৪) প্রয়োজনের একটি সীমা থাকে, কিন্তু লোভের কোনো সীমা থাকে না।

(৫) বাহাদুরী এটাই যে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও অপরের নিকট নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হতে দিবে না।

(৬) সফলতা অর্জনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সফলতার জন্য মনের মধ্যে দুর্নিবার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে।

(৭) অথর্ব, প্রাণহীন লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করো না তাহলে নিজেই অথর্ব হয়ে যাবে।

(৮) আল্লাহওয়ালাগণ কথায় কথায় কষ্ট প্রকাশ করেন না।

(৯) যার কোনো লক্ষ্য নেই তার কোনো গন্তব্য নেই।

(১০) কঠোরতা মানুষকে শক্তিশালী বানায় যদি মানুষের মধ্যে ধৈর্য গ্রহণের শক্তি থাকে।

(১১) ব্যক্তিত্বের প্রভাব সে সময় কমতে থাকে যখন মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করে।

(১২) চেষ্টা করা হচ্ছে তোমার কাজ, ফলাফল বের করা হচ্ছে আল্লাহর কাজ।

(১৩) মানুষের মনে নীরবে বড়ত্ব সৃষ্টি হয়, তাকে বরবাদ করে, তার কোন অস্তিত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না।

(১৪) তুমি যে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে তোমার মেধা, চিন্তাশক্তি তার জন্যেই কাজ করবে।

(১৫) দুনিয়াতে অপমানিত হওয়ার হাজার পন্থা রয়েছে, এসবের মধ্যে ঋণের অপমান হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন।

(১৬) তোমার ঋণ তোমার সুস্থতা কামনা করবে এবং তুমি যাকে ঋণ দিয়েছ সে তোমার জন্য মৃত্যু কামনা করবে।

(১৭) অসুস্থ ব্যক্তি তো ঘুমুতে পারে কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঘুম আসে না।

(১৮) যে ব্যক্তি কম বলে বেশি শোনে সেই হচ্ছে বুদ্ধিমান।

(১৯) যে ব্যক্তি এলেম রাখে কিন্তু আমল করে না সে ওই রোগীর মত যে ওষুধ রেখে তা ব্যবহার করে না।

(২০) নিজের প্রয়োজনকে সীমিত করাই হচ্ছে সবচে' বড় সম্পদ।

সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বিষধর প্রাণী থেকে বাঁচার দু'আ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সা.এর খেদমতে হাজির হলেন। অভিযোগ করলেন, আমাকে বিচ্ছু কেটেছে। রাসূল সা. বলেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়তে তবে তোমাকে ক্ষতি করতে পারত না। “আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকু”। আল্লাহর পূর্ণ কালিমার মাধ্যমে আমি সৃষ্টির অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

পেশাব বন্ধ হয়ে যাওয়া ও পাথরের নববী চিকিৎসা

হযরত আবু দারদা রা. এর কাছে এক ব্যক্তি আসলেন। তার বাবার পেশাব বন্ধ হয়ে গেছে। পেশাবের পথে পাথর হয়েছে। তিনি রাসূল সা. থেকে শেখা নিচের দু'আ শিখিয়েছেন।

رَبُّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقْدَسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاعْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَّحِمَتِكَ عَلَىٰ لَهَذَا الْوَجْعِ.

অর্থ: আমাদের প্রভু যিনি আসমানে রয়েছেন। তোমার নাম পবিত্র। যমিন ও আসমানে তোমার হুকুম। যেমন তোমার রহমত আসমানে ব্যপ্ত।

তুমি তোমার রহমত যমিনে ঢেলে দাও। আমাদের গোনাহ ও ভুল ক্ষমা করে দাও। তুমি তোমার শেফা ও রহমত এই রোগীর ওপর নাযিল কর।

ইমাম নাসায়ী র. বলেছেন, ওই ব্যক্তি ইরাক থেকে এক ব্যক্তির পেশাবের সমস্যা নিয়ে আসে। লোকেরা হযরত আবু দারদা রা. এর দিকে ইশারা করলেন। হযরত আবু দারদা বললেন, আমি রাসূল সা. থেকে শুনেছি যার এই সমস্যা রয়েছে সে এই দু'আ পড়বে।

প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্তির নববী আমল

মুসনাদে বাযযারে রয়েছে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসি এবং সূর্যয়ে মুমিনের প্রথম তিন আয়াত পড়বে সে পুরো দিন সব ধরনের বিপদ ও কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

এক পিঁপড়ার দু'আয় সুলাইমান আ. এর পানি মিলেছে

ইবনে আবি হাতেমে আছে, এক বার হযরত সুলাইমান আ. ইস্তিসকার নামাযের জন্য বের হলেন। তিনি দেখলেন একটি পিঁপড়া উল্টো হয়ে শুয়ে আছে। তার পা আসমানের দিকে উঠিয়ে দু'আ করছিল। হে আল্লাহ! আমরাও তোমার সৃষ্টি। পানি বর্ষণের প্রয়োজন আমাদেরও রয়েছে। যদি পানি বর্ষণ না হয় তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। পিঁপড়ার এই দু'আ শুনে তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা করলেন, তোমরা ফিরে চলো, অন্য কারো দু'আর মাধ্যমে তোমরা পানি পেয়েছ।^{১০২}

ব্যথা দূর করার নববী আমল

হযরত উসমান ইবনে আবী আলআস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. থেকে তারা শরীরে ব্যথা অনুভবের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। রাসূল সা. বললেন, শরীরের যে অংশে ব্যথা অনুভব করবে সেখানে হাত রাখবে এবং এই দু'আ তিনবার পড়বে। “আউযু বিইজ্জাতিল্লাহিত তাম্মাতি ওয়া কুদরতিহী মিন শাররী মা আজিদু ওয়া উহাযির”।

আট আয়াতের সাওয়াব এক হাজার আয়াতের সমান

রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, “তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে প্রতিদিন কুরআনের এক হাজার আয়াত পাঠ করতে সক্ষম?” সাহাবারা বললেন, প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করতে পারে কে? রাসূল সা. বললেন, “তোমাদের কেউ ‘আলহাকুমত তাকাসুর’ পড়তে পারে না। অর্থাৎ প্রতিদিন ‘আলহাকুমত তাকাসুর’ পড়া এক হাজার আয়াত পড়ার সমান।

বিনয়ের কিছু মহান দৃষ্টান্ত

(১) উমর ইবনে আব্দুল আযিয র. রাতে লিখছিলেন। সে সময় তাঁর কাছে এক মেহমান আসলেন। চেরাগ প্রায় নিভে যাওয়ার উপক্রম ছিল। মেহমান চেরাগ ঠিক করার জন্য যাচ্ছিলেন। উমর ইবনে আব্দুল আযিয র. বললেন, ‘মেহমান থেকে খেদমত নেওয়া ভদ্রতা ও আভিজাত্যের বিপরীত’। মেহমান বললেন, আমি চাকরকে উঠিয়ে দিচ্ছি। উমর ইবনে আব্দুল আযিয র. বললেন, সে এখনই ঘুমিয়েছে। তাকে ঘুম থেকে জাগানো উচিত হবে না। সুতরাং তিনি নিজে উঠে তেলের পাত্র থেকে চেরাগে তেল ঢেলে আলো জ্বালালেন। মেহমান তাঁকে বললেন, আপনি নিজেই এই কাজ করলেন? তিনি বললেন, আমি পূর্বেও উমর ছিলাম এবং এখনও তাই আছি। আমার মধ্যে কোনই পরিবর্তন আসেনি। মানুষের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে আল্লাহর কাছে বিনয়ী।

(২) হযরত আবু হুরায়রা লাকড়ির বোঝা উঠিয়ে মদিনার বাজারে গেলেন। তিনি এই দিনে মদিনার মারওয়ান নামক স্থানে অবস্থান করতেন। তিনি বলছিলেন, আমার (আবু হুরায়রা) আসছে। তাঁর জন্য পথ পরিষ্কার করে দাও। কারণ সে লাকড়ির বোঝা নিয়ে আসছে।

(৩) সাইয়েদুনা উমর ইবনে খাত্তাব রা. একদিন বা হাতে গোশত উঠিয়ে নিয়েছিলেন। আর ডান হাতে লাঠি ছিল। তিনি সে সময় খলিফা ও আমিরুল মুমিনীন ছিলেন।

(৪) সাইয়িদুনা হযরত আলী রা. গোশত কিনলেন এবং তা চাদর দিয়ে বেঁধে ছিলেন। সাথিরা বলল, আমরা উঠিয়ে নেই। তিনি বললেন, “যেই বাচ্চারা খাবে তাদের বাবা উঠালেই উত্তম।”

(৫) সাইয়িদুনা হযরত আনাস রা. বলেন, মদিনা মোনাওয়ারার দাসিরাও চাইলে রাসূল সা.কে লোকদের থেকে আলাদা ডেকে নিতে পারত।

(৬) আবু সালমা র. বলেন, আমি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. কে বললাম, “লোকেরা পোশাক, খাবার, সাওয়ারি এবং পানিয়ার মধ্যে কি কি বিষয় নতুন সংযোজন করেছে?”

আবু সাঈদ উত্তরে বললেন, “ভাতিজা! তোমার খাবার, পানাহার ও পরিধান সবকিছুই আল্লাহর জন্য হতে হবে। এর মধ্যে যদি অহংকার, রিয়া সৃষ্টি হয় তবে তা গোনাহ ও অপচর হবে। তুমি ঘরের কাজ সমূহের মধ্যে ওই সব কাজ কর যা রাসূল সা. করতেন। রাসূল সা. উটের খাবার দিতেন। তাকে বাঁধতেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন। বকরির দুধ দোহন করতেন। জুতো সেলাই করতেন। কাপড়ের তালি দিতেন। চাকরের সাথে খাবার দিতেন। চাকর ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি আটা পিষতেন। বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনতেন। এসবে তিনি কোন অপমানবোধ করতেন না। কেনা জিনিস তিনি নিজ হাতেই নিয়ে আসতেন। ধনি-গরিব, বড়-ছোট সবার সাথে মোসাফাহা করতেন। আর ছোট, বড়, কালো, সাদা, গোলাম এবং আযাদ সবাইকে প্রথমে সালাম দিতেন।”^{১০০}

(৭) আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী রা. এর খেলাফতকালের একটি ঘটনা। তিনি গোলামকে সাথে নিয়ে বাজারে গেলেন। গোলামকে বললেন, আমার কাপড় সেলাই করতে হবে এবং তোমারও কাপড় সেলাই করতে হবে। তুমি কাপড়ের দোকানে আমার এবং তোমার জন্য কাপড় পছন্দ কর। গোলাম দু’ধরনের কাপড় একটি দামী ও অপরটি কমদামী পছন্দ করলেন। আমিরুল মুমিনিন যখন সে কাপড় দর্জিকে দিতে চাইলেন দর্জিকে বললেন, কমদামী কাপড়টি আমার জন্য। দামী কাপড়টি গোলামের জন্য কাটবে। গোলাম বললেন, আপনি মনিব, আমিরুল মুমিনীন। আপনার খুব ভালো কাপড় ও পোশাকের প্রয়োজন। তিনি বললেন, ‘আমি বৃদ্ধ, তুমি যুবক; তোমার ভালো পোশাক পরিধান করা বেশি প্রয়োজন।’^{১০৪}

^{১০০} মিনহাজুল মুসলিম: পৃ: ২৭৭-২৭৮।

^{১০৪} নেদায়ে শাহী, সেপ্টেম্বর ২০০৫।

প্রথম কাতারে নামায আদায়কারী দিগুণ সাওয়াব পাবে।

জুমআ'র নামায জামে মসজিদে পড়বে। যেখানেই জায়গা মিলবে সেখানেই বসে যেতে হবে। লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ তাতে মানুষের কষ্ট হয়। তাছাড়া মানসিক কষ্ট তো আছেই। এবং তাদের মনোযোগ ও নিমগ্নতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী কারীম সা. বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রথম কাতার ছেড়ে দ্বিতীয় কাতারে এই জন্য দাঁড়িয়েছে যে, তার অপর মুসলমান ভাই যেন কষ্ট না পায়। আল্লাহ তা'য়ালার তাকে প্রথম কাতারে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের দ্বিগুণ সাওয়াব দান করবেন।”^{১০৫}

রমযানে তেলাওয়াতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে

রমযান মাসের সাথে কুরআনে কারীমের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। রমযান মাসেই কুরআন নাযিল হয়। অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহও এই রমযানেই নাযিল হয়। রমযানের প্রথম বা তৃতীয় দিবসেই হযরত ইবরাহিম আ.কে সহিফা প্রদান করা হয়। হযরত দাউদ আ. কে রমযানের ১২ বা ১৮ তারিখে যাবুর প্রদান করা হয়েছে। রমযানের ২৬ তারিখে হযরত মুসা আ. কে তাওরাত প্রদান করা হয়েছে। রমযানুল মোবারকের ১২ বা ১৩ তারিখে হযরত ইসা আ. কে ইঞ্জিল দেওয়া হয়েছে। অতএব রমযান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতে হবে। হযরত জিবরিল আ. প্রতি বছর প্রতি রমযানে নবী কারীম সা. কে পুরো কুরআন শোনাতেন এবং শোনাতেন। সর্বশেষ বছর তিনি দু'বার কুরআন শুনিয়েছেন ও শুনেছেন।^{১০৬}

হযরত দাউদ আ. এর মৃত্যুর আশ্চর্যজনক ঘটনা

মুসনাদে আহমাদে এসেছে, রাসূল সা. বলেন, “ হযরত দাউদ আ. অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি ঘর থেকে বাইরে বেরুতেন দরজা বন্ধ করে যেতেন। তারপর কারো ভেতরে প্রবেশের অনুমতি থাকত না। একবার তিনি এভাবেই বাইরে গেলেন।

^{১০৫} তিবরানি, আদাবে যিন্দেগী: পৃ:১০১।

^{১০৬} আদাবে যিন্দেগী: পৃ:১১৭।

কিছুক্ষণ পর এক বিবি দেখতে পেলেন ঘরের মধ্যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। তিনি পেরেশান হয়ে পড়লেন। অন্যদেরকেও দেখাতে থাকলেন। সবাই বলতে থাকল এই লোক কোথেকে এসেছে? দরজা বন্ধ তিনি কীভাবে ভেতরে প্রবেশ করলেন? আল্লাহর কসম! হযরত দাউদ আ. এর সামনে আমাদের কঠিন লজ্জায় পড়তে হবে। এমন মুহূর্তে হযরত দাউদ আ. উপস্থিত হলেন। তিনি এসেও তাকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? তিনি বললেন, তিনি সেই সত্তা যাকে দরজা বা কোনো প্রতিবন্ধকতা ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিতে সক্ষম নয়। হযরত দাউদ আ. বুঝতে পারলেন এবং স্বাগত জানালেন। আপনি হচ্ছেন মালাকুল মাউত। ওই সময়েই মালাকুল মাউত তাঁর রুহ কবজা করে নেয়।^{১০৭}

আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম বান্দা

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, “কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সেই হবে যার কটু কথা, খারাপ ভাষা ও অভদ্র ব্যবহারে মানুষ তার সাথে চলাফেরা বন্ধ করে দেয়।”
—বুখারি ও মুসলিম।

মুমিন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের আয়না

নিজের বন্ধুদের ইসলাহ ও তারবিয়াতের ব্যাপারে কখনও গাফলতি করা উচিত নয়। নিজের বন্ধুদের মাঝে কখনও সেই রোগকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় যা ইসলাহ ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে। অহংকার, আত্মগর্বে বিভোর থাকা উচিত নয়। বন্ধুদেরকে সব সময় উৎসাহিত করবে তারা যেন তাদের ভুলসমূহ উপলব্ধি করে এবং স্বীকার করে। তারা সব সময় এই বাস্তবতাকে মেনে নেয় যে নিজের দুর্বলতাকে মেনে না নেওয়া, নিজের দোষমুক্তির ব্যাপারে অবিচল থাকার মাধ্যমে আত্মার অনেক মন্দ খোরাক তৈরি হয়।

লোক দেখানো বিনয়, কথায় নিজেকে ছোট করে দেখানো, চলনে বলনে নিজের বিনম্র ভাব প্রকাশ করা এটা নেহায়েত সহজ কাজ। কিন্তু নিজের মনের বিরুদ্ধে কোন অপ্রীতিকর বাক্য শোনা, নিজের ভুল ত্রুটির

নীরব সমালোচনা শোনা এবং মানা, নিজের মনের বিরুদ্ধে বন্ধুদের সমালোচনা সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু প্রকৃত বন্ধু সেই যে সজাগ ভাবনা নিয়ে আরেকজনের জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখে। নবী কারীম সা. বলেছেন, তিনটি বিষয় ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেয় (১) এমন আকাঙ্ক্ষা যা মানুষকে তার দাস বানিয়ে ফেলে (২) এমন লোভ যার অনুগত হয়ে মানুষ নিজেকে পরিচালিত করে (৩) আত্মগর্ব এবং এটি হচ্ছে সবচে' বেশি মারাত্মক ব্যাধি।”

(বায়হাকী, মেশকাত)

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা এমন এক অস্ত্র যা চারিত্রিক সব ধরনের খারাপ গুণসমূহকে বাইরে নিক্ষেপ করে। বন্ধুদের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা শুনে দ্রুত কুঁচকান এবং নিজেকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এই সুন্দর একটি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করাও ধ্বংসের শামিল। বন্ধুদের আঁচলে যদি ঘৃণার কোন বিষয় নজরে পড়ে তবে অস্থিরতা উপলব্ধি করতে হবে এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করার কৌশলগত ব্যবস্থা নিতে হবে। আর নিজেও প্রসন্ন চিত্তে ও বিনয়ের সাথে বন্ধুদেরকে সব সময় এই সুযোগ দিতে হবে তারা যেন আপনার দোষ-ত্রুটিগুলো আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারে। তারা যখন তাদের এই তিক্ত দায়িত্ব পালন করবে নিজেকে প্রচারের পরিবর্তে অত্যন্ত বড় মনে, সুপ্রসন্ন চিত্তে তাদের সমালোচনাকে স্বাগত জানাবে। তাদের ইখলাস ও অনুগ্রহের শোকারিয়া আদায় করবে। নবী কারীম সা. আদর্শ বন্ধুর একটি আদর্শ নমুনা এভাবে উপস্থাপন করেছেন, “তোমাদের প্রত্যেকে তার ভাইয়ের আয়না। অতএব সে যদি তার ভাইয়ের মধ্যে কোনো খারাপি দেখে সে যেন তা দূর করে দেয়।”

(তিরমিযি)

এই উদাহরণে এমন পাঁচটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলোকে সামনে রেখে আপনি আপনার বন্ধুত্বকে আদর্শ বন্ধু বানাতে পারেন।

(১) আয়না আপনার দাগ ওই সময়ই প্রকাশ করতে পারে যখন আপনি দাগ দেখার উদ্দেশ্যে তার সামনে দাঁড়াবেন। তা না হলে সেও পরিপূর্ণ নীরবতা পালন করবে। এমনভাবে আপনি আপনার বন্ধুর দোষ তখনই প্রকাশ করতে পারবেন যখন সে নিজেকে সমালোচনার জন্য আপনার সামনে উপস্থাপন করবে। আপনাকে উদারভাবে সমালোচনার সুযোগ দিবেন। আপনিও উপলব্ধি করতে পারবেন তার মস্তিস্ক সমালোচনা

শোনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তার অন্তর ইসলাহ শোনার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। যদি আপনি এমন অবস্থা দেখতে না পান তবে আপনার কথা হেকমতের সাথে অন্য কোনো সুযোগের অপেক্ষায় তুলে রাখতে হবে। নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। তার অনুপস্থিতিতে এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত আপনার মুখে এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ না হয়ে পড়ে যা তার দোষের দিকে ইঙ্গিত করে। কারণ তখন তা গীবত হবে, গীবতের মাধ্যমে হৃদয় একত্রিত নয়, ভাঙে।

(২) আয়না চেহারার সেসব দাগ, ত্রুটি বাস্তবিকভাবে প্রকাশ করে যা প্রকৃতই চেহারায় থাকে। সে না কম বলে না বেশি করে দেখায়। তদুপরি সে চেহারার সেসব দোষগুলোকেই প্রকাশ করে দেখায় যা তার সামনে আসে। সে অপ্রকাশ্য দোষগুলো খুঁজে বেড়ায় না। খুঁটে খুঁটে সে তার কাল্পনিক চিত্রও প্রকাশ করে না।

এমনিভাবে আপনিও বন্ধুর দোষ-ত্রুটি পুরোপুরি বলবেন। নিরর্থক ভদ্রতা ও তোষামদি করে দোষ গোপন করবেন না ঠিক তেমনভাবে নিজের বাকপটুতায় তাতে কিছু বাড়াবেনও না। আর শুধু সেই দোষগুলোই আলোচনা করবেন যা সাধারণ জীবন হিসেবে সামনে এসেছে। অনুসন্ধান এবং গোয়েন্দাবৃত্তিতে জড়াবেন না। গোপন দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা কোনো আখলাক নয়, বরং তা ধ্বংসাত্মক ও মন্দ স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ। নবী কারীম সা. একবার মিসরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উঁচু আওয়াজে সমবেতদের উদ্দেশে বললেন, “মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি খোঁজে বেড়িয়ে না। যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের দোষ খুঁজতে পেছনে লাগে, আল্লাহ তা’য়ালা তার গোপন দোষ প্রকাশ করতে উদ্যোগ নেন। আর আল্লাহ তা’য়ালা যার দোষ বের করতে উদ্যোগ নেন তার লজ্জিত হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। সে ঘরের ভেতরে বসে থাকলেও।” (তিরমিযি)

(৩) আয়না সব স্বার্থ থেকে দূরে থেকে নিরপেক্ষভাবে তার দায়িত্ব পালন করে থাকে। যে ব্যক্তি তার সামনে নিজের চেহারা প্রকাশ করে সেও যে কোন স্বার্থ ছাড়াই তার আসল চেহারা সামনে দেখতে পায়। তার কারো সাথে না কোনো হিংসা আছে না কোনো বিদ্বেষ। এবং তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো ব্যাপারও থাকে না। আপনিও ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রতিশোধ স্পৃহা এবং হিংসাসহ যাবতীয় অমূলক ভাবনা থেকে পবিত্র হয়ে নিরপেক্ষ

হিসাব করুন। এবং তা এ জন্যই করবেন যে, আপনার বন্ধু যেন শুধরে যেতে পারে। যেভাবে আয়না দেখে মানুষ নিজেকে পরিশীলিত করে।

(৪) আয়নায় নিজের চেহারা দেখে কেউ বিব্রত বোধ করে না এবং গোস্বায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে আয়না ভেঙে ফেলার মত বেকুবী করে না, বরং নিজের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার ব্যাপারে আরো যত্নবান হন। মনে মনে আয়নার ক্ষমতা ও কারিশমার কথা ভাবতে ভাবতে মুখে শুকরিয়া আদায় করে বলতে থাকে, নিশ্চয়ই আয়না আমার সাজসজ্জায় যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। তারপর অত্যন্ত যত্নের সাথে তাকে হেফাজত করে রাখা হয়।

এমনিভাবে আপনার বন্ধু তার ভাষায় আয়নার সামনে আপনার ছবি রাখবে তখন আপনি বিব্রত হয়ে বন্ধুর ওপর জবাবী হামলা করবেন না, বরং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চাই কারণ, তিনি আপনার বন্ধুত্বের হক আদায় করেছেন। শুধু মুখে নয়, বরং হৃদয় থেকে তার শোকরিয়া আদায় করা উচিত। আপনি নিজেকে সংশোধন ও তারবিয়াতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আন্তরিক সৌহার্দ ও ভালোবাসার সাথে বন্ধুর কদর ও মূল্যায়ন করে তার কাছে নিবেদন করুন ভবিষ্যতেও সে যেন আপনাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে।

(৫) মুসলমানদের প্রত্যেকে তার ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। ভাই ভাইয়ের জন্য ইখলাস ও মুহাব্বতের নমুনা হয়। একে অপরের প্রতি হিতৈষী, কল্যাণকামী, সমব্যর্থী ও সমবেদনা পোষণকারী হয়ে থাকে। ভাইকে বিপদে দেখলে তার হৃদয় উদ্বিগ্ন হয়। আনন্দে দেখলে সেও আনন্দে আত্মহারা হয়।

এ কারণে ভাই এবং বন্ধু যে সমালোচনা করে তাতে সমবেদনা ও ভালবাসা, আন্তরিকতার ছাপ পাওয়া যায়। এমন সমালোচনা দ্বারাই হৃদয়সমূহকে জোড়ান এবং জীবনকে নির্মাণের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

তাওবাকারী বান্দা আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়

(১) রাসূল সা. বলেছেন, “সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা ভুল করে যদি এই যমিন ও আসমান ভরে রাখ, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তবে নিঃসন্দেহে তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। ওই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ যদি তোমরা ভুলই না কর তবে

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে ধ্বংস করে এমন লোকদেরকে নিয়ে আসবেন যারা ভুল করবে তারপর ক্ষমা চাইবে। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসনাদে আহমদ)

(২) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা., নিজের ইত্তিকালের সময় বলেন, “একটি হাদীস আজ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে শোনাইনি। এখন সে হাদীস বয়ান করব। আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি তোমরা গোনাহ না করতে তবে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের পরিবর্তে এমন এক কওমকে সৃষ্টি করতেন যারা গোনাহ করত তারপর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ক্ষমা করতেন। (সহিহ মুসলিম)

(৩) হযূর সা. বলেন, “লজ্জা এবং অনুশোচনাই হচ্ছে গোনাহের কাফফার।” রাসূল সা. বলেন, যদি তোমরা গোনাহ না করতে তবে আল্লাহ তা'য়ালা এমন লোকদেরকে নিয়ে আসতেন যারা গোনাহ করত তারপর তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করতেন। (মুসনাদে আহমাদ)

(৪) রাসূল সা. বলেন, “আল্লাহ তা'য়ালা ওই বান্দাকে পছন্দ করেন যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী এবং গোনাহ থেকে তাওবাকারী।”^{১০৮}

ফায়েদা: এই হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা গোনাহ পছন্দ করেন, বরং এই হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে, গোনাহ থেকে তাওবাকারী বান্দা আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়। তাই গোনাহগার বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে পানাহ চাইতে হবে। গোনাহ থেকে তাওবা করলে আল্লাহ তা'য়ালা খুশি হয়ে ক্ষমা করে দেন।

সর্বোত্তম রহস্যবিদ হও

আপনার প্রতি বিশ্বাস করে বন্ধু আপনাকে মনের কথা বললে সেই কথা হেফাজত করা উচিত। কখনও বন্ধুর বিশ্বাসকে ভাঙা উচিত নয়। নিজের বন্ধুকে রহস্যের নিরাপদ ভাণ্ডার বানাও। তবে বন্ধু নিঃসংকোচে সব বিষয়ে তোমার সাথে পরামর্শ করবে। তবেই তুমি বন্ধুকে ভালো পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে পারবে। হযরত উমর রা. বলেন, হযরত হাফসা যখন বিধবা হন আমি হযরত উসমান রা. এর সাথে সাক্ষাত করলাম।

আমি তাকে বললাম, আপনি চাইলে হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। হযরত উসমান রা. বললেন, আমি এ বিষয়ে চিন্তা করব। আমি ক'রাত পর্যন্ত তার অপেক্ষা করলাম। তারপর হযরত উসমান আমার সাথে মিলিত হলেন। আমাকে বললেন, আমার এখন বিয়ে করার ইচ্ছা নেই। আমি তারপর হযরত আবু বকর রা. এর কাছে গেলাম এবং বললাম, যদি আপনি পছন্দ করেন তবে হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। তিনি চুপ রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। এভাবে ক'দিন কেটে গেল। তারপর রাসূল সা. হাফসার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। আমি নবী কারিম সা. এর সাথে হাফসার বিবাহ দিলাম।

তারপর হযরত আবু বকর রা. আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি বললেন, তুমি আমাকে হাফসার ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিলে আমি নীরবতা অবলম্বন করেছিলাম। আমার নীরবতা হযরত তোমাকে কষ্ট দিতে পারে। আমি বললাম, হ্যাঁ আমি কষ্ট পেয়েছি। তিনি বললেন, আমি জানতাম রাসূল সা. এমন চাইতেন এবং তা রাসূলের সা. একটি গোপন বিষয় ছিল যা আমি জানতাম, প্রকাশ করতে চাইনি। যদি রাসূল সা. হাফসার রা. আলোচনা না করতেন তবে আমি অবশ্যই হাফসাক কবুল করতাম।

-বুখারী।

হযরত আনাস রা. একদিন ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। এমন মুহূর্তে রাসূল সা. তাশরিফ রাখলেন এবং আমাদেরকে সালাম দিলেন। তারপর একটি প্রয়োজনের কথা বলে আমাকে পাঠালেন। ওই কাজ করতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল। কাজ শেষে যখন আমি ঘরে ফিরলাম, আমাকে মা প্রশ্ন করলেন, এত দেরি হলো কেন? আমি বললাম, নবী কারিম সা. একটি প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন, প্রয়োজনটি কি। আমি বললাম, এটা গোপন কথা। মা বললেন, দেখ রাসূল সা. এর একান্ত ব্যক্তিগত কথা কাউকে বলবে না।

(সহিহ মুসলিম)

বন্ধুদের মাঝে হাসিখুশি, উৎফুল্ল থাক

বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ও বন্ধুদের মাঝে হাসিখুশি, প্রাণবন্ত থাকা উচিত। মন বিষন্ন রেখে অন্যদেরকে বিষন্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে অকৃত্রিম ও খোশমেযাজে চলাফেরা করা উচিত।

বন্ধুদের সাথে একজন অকৃত্রিম বন্ধু, খোশমেয়াজী সহপাঠী ও সুহৃদ সঙ্গী হতে চেষ্টা করুন। আপনার সান্নিধ্যে সহপাঠীরা বিরক্তি বোধ করবে না, বরং তারা আনন্দ ও ফুর্তিতে সময় কাটাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস রা. বলেন, ‘আমি নবী কারিম সা. এর থেকে অধিক মুচকি হাসি দিতে কাউকে দেখিনি।’

(তিরমিযী)

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন, আমি রাসূল সা. এর একশত বেশি মজলিসে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এই মজলিসগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। এমনভাবে জাহেলী যুগের বিভিন্ন ঘটনাও আলোচনা করা হত। নবী কারিম সা. নিশ্চুপ বসে এ সব আলোচনা শুনতেন। মাঝে মাঝে তিনি তাদের সাথে হাস্যরসেও শরীক হতেন।

হযরত ছারিদ রা. বলেন, আমি একবার রাসূল কারীম সা.এর সাথে সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসেছিলাম। সাওয়ারীর পিঠে বসে আমি রাসূল সা. কে উমাইয়া বিনতে আবী সালতের একশ’ কবিতা শোনালাম। প্রতি কবিতা শুনে তিনি বলতেন আরেকটি শোনাও, আমি আরো শোনাতাম।

(তিরমিযী)

এমনভাবে রাসূল সা. নিজের মজলিসে কখনও নিজে গল্প শোনাতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, একবার রাসূল সা. পরিবারের সদস্যদেরকে একটি ঘটনা শোনান। একজন মহিলা বললেন, এই ঘটনা তো খোরাফার কেচ্ছা কাহিনীর মতো। নবী কারিম সা. বলেন, তুমি কি খোরাফার কাহিনী জানো? তারপর তিনি নিজেই খোরাফার আসল ঘটনা বর্ণনা করলেন। এমনভাবে একবার হযরত আয়েশা রা. কে এগার জন মহিলার আকর্ষণীয় কাহিনী শোনান। হযরত বকর বিন আব্দুল্লাহ র. সাহাবায়ে কেরামের সরলতা, অকৃত্রিম চাল চলনের ঘটনা বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম হাসি-আনন্দ ও কৌতুকচ্ছলে একে অপরের দিকে তরমুজের বাকল ছুঁড়ে দিতেন। আবার যখন যুদ্ধের ময়দানে লড়াই ও শত্রু আক্রমণের প্রতিরোধ সময় হত তারা সেই ময়দানের অশ্বারোহী হতেন।

(আদাবুল মুফরাদ)

মেয়েদের জন্মকে বোঝা মনে করো না

মেয়েদের জন্মে সেই আনন্দ প্রকাশ কর যেমন ছেলেদের জন্মে কর। ছেলে হোক বা মেয়ে দু'জনই আল্লাহর দান। আল্লাহই ভাল জানেন যে, আপনার জন্য ছেলে ভাল হবে না মেয়ে। মেয়ের জন্মে নাক, ঝাঁ কুঁচকান এবং মন ভেঙে যাওয়া কোনো আনুগত্যশীল বান্দার পরিচয় নয়। এটা হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা ও অবমূল্যায়ন।

(১) হাদীসে এসেছে, যখন কোনো ব্যক্তির মেয়ে সন্তান জন্ম লাভ করে তার কাছে ফেরেশতা আসেন। তিনি এসে বলেন, হে ঘরবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি মেয়েকে নিজের ছায়ায় নিয়ে নেন এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তিনি বলেন, “এটা দুর্বল প্রাণ, একটি দুর্বল প্রাণ থেকে যার জন্ম। যে এই বাচ্চার লালন-পালন করবে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।” (তাবরানী শরীফ)

(২) মেয়েদেরকে অনেক বেশি আন্তরিকতা, আনন্দচিত্তে এবং দীনী চেতনা নিয়ে লালন-পালন করা চাই। তার প্রতিদানে আল্লাহর কাছে বেহেশতের তামান্না করা চাই। নবী কারিম সা. এর ইরশাদ হচ্ছে, “যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোনের লালন-পালন করবে, তাদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দিবে, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে যতদিন তাদের প্রয়োজন শেষ না হয়। আল্লাহ তা'য়ালার এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব করেছেন।” তারপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, যদি দু'জন হয়? নবী কারিম সা. বললেন, দু'জনের প্রতিপালনের বিনিময়ও একই। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “যদি লোকেরা একজনের ব্যাপারে প্রশ্ন করত তবে তিনি একজনের প্রতিপালনের ব্যাপারেও একই সুসংবাদ দিতেন।” (মেশকাত শরীফ)

(৩) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, একদিন একজন মহিলা দু'টি সন্তান নিয়ে আমার কাছে এলো। আমার কাছে কিছু চাইল। তখন আমার কাছে একটি মাত্র খেজুর ছিল। আমি তার হাতে সেটি তুলে দিলাম। সেই মহিলা খেজুরটি দু' টুকরো করে দুই সন্তানকে ভাগ করে দিল। নিজে কিছুই খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেল। ওই সময়েই রাসূল সা. ঘরে তাশরিফ আনলেন। আমি তাঁকে পুরো ঘটনা শোনালাম। তিনি শুনে বললেন, “যে ব্যক্তিকে মেয়ে সন্তান দান করে পরীক্ষা করা হয়,

সে তার সাথে উত্তম আচরণ করে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। এই মেয়েরা কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে তার জন্য ঢাল হবে।”

(মেশকাত শরীফ)

(৪) মেয়েদেরকে তুচ্ছ মনে কর না। ছেলেদেরকে কোনো ব্যাপারে তাদের থেকে প্রাধান্য দিয়ো না। উভয়ের সাথে সমান ভালোবাসা ও সৌহার্দের প্রকাশ করা চাই। নবী কারিম সা. ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তির মেয়ে সন্তান জন্ম লাভ করল এবং সে জাহেলী যুগের মত তাকে জীবন্ত দাফন করল না, তাকে তুচ্ছ করল না। ছেলেকে তার ওপর প্রাধান্য দিল না। তবে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’য়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”

(সুনানে আবি দাউদ শরীফ)

(৫) পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়েদের নির্ধারিত অংশ গুরুত্বসহকারে দিতে হবে। আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ থেকে কম বা বেশি করা যাবে না। মেয়েদের নির্ধারিত অংশ দিতে টালবাহানা করা বা নিজের ইচ্ছামত কিছু দিয়ে তাকে বিদায় করা কোনোভাবেই কোনো পরিপূর্ণ মুমিনের শান হতে পারে না। এটা হবে খেয়ানত এবং আল্লাহর বিধানের অপমান করা। আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফিক দান করুন।

নয়টি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত

(১) পড়ো...নির্বাচন করে (২) চিন্তা করো...গভীরভাবে (৩) খেদমত করো...মনোযোগ দিয়ে (৪) বিতর্ক করো...প্রমাণের সাথে (৫) কথা বলো...সংক্ষিপ্তভাবে (৬) মোকাবেলা কর...বীরত্বের সাথে (৭) ইবাদত কর...মুহাব্বতের সাথে (৮) কথা শুনো...মনোযোগ দিয়ে (৯) জীবন-যাপন কর...মধ্যমপন্থার সাথে।

যারা চারটি বিষয় থেকে গাফেল

সব ধরনের পেরেশানী থেকে দূরে থাকার কুরআনী চিকিৎসা।

হযরত জাফর সাদেক র. একবার মদিনায় তাশরিফ নিলেন। মানুষ তাঁর কাছে ইলম শেখার জন্য আসত। তিনি লোকদেরকে বলতেন, আমি চার ধরনের লোকের প্রতি বিস্মিত যারা চারটি বিষয়ে গাফেল।

(১) আমার তাজ্জব লাগে সে ব্যক্তির জন্য যে বিপদে হাবুডুবু খাচ্ছে অথচ সে “ইয়া আরহামুর রহিমীন” পড়ে না। কুরআনে পাকে হযরত

আইয়ুব আ. সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, “আর আইয়ুব যখন নিজের প্রভূকে ডেকেছে, আমি বিপদে আক্রান্ত হয়েছি। আপনি তো আরাহামুর রহিমীন।

(সূরা আশিয়া: আয়াত:৮৩)

কুরআনে কারিমে এই দু’আর ফায়দা বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব আমি তার দু’আ কবুল করেছি এবং তার কষ্ট দূর করে দিয়েছি।

(সূরা আশিয়া: আয়াত ৮৭)

(২) আমার তাজ্জব লাগে সে ব্যক্তির জন্য যে সমস্যায় জর্জরিত অথচ এই দু’আ পাঠ করে না যা ইউনুস আ. মাছের পেটে পাঠ করেছিলেন। “লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যোয়ালিমীন” অর্থ: তুমি ছাড়া কোনো বিচারক নেই, তুমি পবিত্র আর আমি তো পাপিষ্ঠ।

(সূরা আশিয়া: আয়াত:৮৭)

কুরআনে পাকে এই দু’আর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, “তাই আমি তাঁর দু’আ কবুল করেছি এবং তাকে পেরেশানী থেকে মুক্তি দিয়েছি। এমনভাবে আমি মুমিনদের নাজাত দেই।

(সূরা আশিয়া: আয়াত: ৮৮)

(৩) আমার তাজ্জব লাগে সেই ব্যক্তির জন্য যে কোন ভয়ে সময় কাটাচ্ছে অথচ সেই দু’আ পাঠ করে না, সাহাবায়ে কেরাম যে দু’আ পাঠ করতেন। দু’আটি হচ্ছে, “হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি‘মাল ওয়াকিল”। অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক।

(সূরা আল ইমরান:আয়াত :১৭৩)

কুরআনে পাকে এই দু’আর ফায়েদা বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরেছে, তাদের কোন পেরেশানী নেই।

(সূরা আল ইমরান: আয়াত: ১৭৪)

(৪) আমার তাজ্জব লাগে সেই ব্যক্তির জন্য যে শত্রুদের ধোকা ও ষড়যন্ত্রের শিকার অথচ সে এই দু’আ পড়ে না যা ফেরআউনের বংশের এক মুমিন পড়েছিল। দু’আটি হচ্ছে, “ওয়া উফাউয়িযু আমরি ইলান্নাহ ইল্লাল্লাহা বাহিরুম বিল ইবাদ” অর্থ: আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয়ই সব বান্দাই আল্লাহর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রয়েছে। এই দু’আর ফায়েদা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব আল্লাহ তা’য়ালা তাকে তাদের মন্দ চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন।

—সূরা মুমিন: আয়াত: ৪৫।

সালামে কেবল শান্তি আর শান্তি

সালাম এমন এক মহান জিনিস যা ঝগড়া খতম করে দেয়। যে সালাম দেয় না তাকে খারাপ মনে করা হয়। যদি সালাম দেয়া হয় তবে জাহেল ব্যক্তিও মাথা নত করে এ ভেবে যে, সে কত ভালো মানুষ, তিনি সালাম দিয়েছেন। এ কারণেই বলা হয় একে অপরের সাথে যত বৈরীতা, শত্রুতা হোক না কেন যদি শত্রুকে সালাম দেয়া হয় তবে শত্রুতা শেষ হয়ে যায়। সে “ওয়া আলাইকুম সালাম” বলতে বাধ্য হবে। যখন সে শান্তির দু’আ করবে তার অর্থই হচ্ছে সে ঝগড়া খতম করতে চায়। সে নিজেই তোমার জন্য শান্তির দু’আ করছে। এই সালাম সব দুশমনি খতম করে দেয়। এ কারণে হাদীসে এসেছে, সালাম দাও প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাকে চেন বা না চেন। আজকের যুগের সভ্যতা হচ্ছে, যতক্ষণ তৃতীয় ব্যক্তি পরিচয় না করায়, না কোনো কথা বলা বা শোনা হয়, না সালাম বা কালাম হয়। এটা হচ্ছে অহংবোধের সভ্যতা। এটা কোনভাবেই ইসলামের সভ্যতা নয়। ইসলামের সভ্যতা হচ্ছে যখন তোমার এবং আমার মধ্যে ইসলামী সম্পর্কের বন্ধন, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান তখন তৃতীয় পক্ষের পরিচয় করানোর কি প্রয়োজন রয়েছে? আমরা প্রথম থেকেই পরিচিত। আমরা মুসলমান ভাই। তার মধ্যে ইসলামের সভ্যতা থাকলে সে আরেকজনের সালামের অপেক্ষায় থাকবে না, বরং সে নিজেই প্রথমে সালাম দিবে। কারণ তাতে সাওয়াব বেশি মিলে।

হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, ইহুদিদের সালাম আঙ্গুলের মাধ্যমে, খৃস্টানদের সালাম হাতের তালু দিয়ে এবং মুসলমানদের সালাম “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহ”।

প্রত্যেক মুসলমান অপরকে দু’আ করবে। এর মাধ্যমে তার প্রতি তার ভালোবাসা ও শুভ কামনা প্রকাশ পায়। প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আছে, কোন এক ব্যক্তির কাছে জিন এসেছে। এখন সে খুব ভয়ের মধ্যে ছিল তাকে হয়ত খেয়ে ফেলবে। সে আগে আগেই বলল, মামুজান! সালাম। সে উত্তরে বলল, ওয়া আলাইকুম সালাম এবং সে বলল, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে খেয়ে ফেলব। কিন্তু তুমি আমাকে মামু বলে ডেকেছ এবং সালাম দিয়েছ। আমার মনে দয়া সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে

দিলাম। তুমি এখন মুক্ত। তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাও, তুমি সালাম দিয়ে নিজের জান বাঁচালে। এমনভাবে দুশমনের অবস্থাও তাই। যদি কারও সাথে পাক্কা দুশমনী থাকে আপনি বলবেন, ‘আসসালামু আলাইকুম’ তবে দুশমনী শেষ হয়ে যাবে। এটা অনেক বড় নেয়ামত ও দু’আ।

হযরত তোফায়েল র. বলেন, আমি প্রায়ই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর খেদমতে উপস্থিত থাকতাম। তাঁর সাথে আমি বাজারে যেতাম। যখন আমরা দু’জনে বাজারে যেতাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. যার পাশ দিয়েই যেতেন তাকেই সালাম দিতেন। সে যে কেউ হোক, দোকানদার হোক বা কোনো গরিব বা মিসকিন লোক হোক সবাইকেই তিনি সালাম দিতেন। একদিন আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম, তিনি বললেন চলো বাজারে যাব। আমি বললাম, হযরত কী কাজে বাজারে যাবেন? আপনি না কোনো সদাই কেনার জন্য দাঁড়ান না কোনো পণ্য সম্পর্কে জানতে চান। আপনি কোনো জিনিসের দরদাম করেন না এবং বাজারের কোনো আসরেও বসেন না। আসুন এখানে বসেই আমরা কথাবার্তা বলি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, হে পেটুক! আমরা তো শুধু সালাম করার উদ্দেশ্যে বাজারে যাই। আমাদের সাথে যাদের সাক্ষাত হয় তাদেরকেই আমরা সালাম করি। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক)

সব সময় মুখে “আসসালামু আলাইকুম” উচ্চারণ করে সালাম দিতে হবে। যাকে আপনি সালাম দিচ্ছেন সে যেন স্পষ্ট শুনতে পায়। তবে কোথাও যদি আসসালামু আলাইকুম মুখে উচ্চারণের সাথে হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করার প্রয়োজন হয় তবে কোন অসুবিধা নেই। যেমন : আপনি যাকে সালাম দিচ্ছেন সে দূরে এবং মনে হচ্ছে তার পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছবে না, অথবা কোনো বধির ব্যক্তিকে সালাম দিলেন তবে এমন অবস্থায় ইশারা করা যেতে পারে। (আদাবে যিন্দেগী: পৃ:২১৮)

মোটকথা এ হাদীসে এই হেদায়াত করা হয়েছে যে, শুধু পরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দিবে না। পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে এমন ঘটে যে, কোনো বড় ব্যক্তি তাকে পরিচিত করানো হচ্ছে। কিন্তু কোনো ছোট ব্যক্তিকে পরিচয় করান হয় না। তাহলে আপনার সালাম তো শুধু বড় মানুষের জন্য হবে, ছোট মানুষের জন্য হবে না। এটাও একটি বড়

ধরনের অহংকার যে, ছোটদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। আর বড়দের সামনে মস্তক অবনত করে থাকবেন।

এ কারণে ফকিহগণ লিখেন, যদি কেউ কোনো সাওয়ারীর পিঠে চড়ে যায় এবং সড়কের সামনে মানুষ বসে থাকে তবে সাওয়ার ব্যক্তির ওপর ফরজ হচ্ছে সে উপবিষ্ট লোকদেরকে সালাম দিবে। নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করবে। এমন যেন না হয় যে অপেক্ষা করবে আমাকে সালাম করা হোক, কারণ তারা আমার থেকে ছোট। মানুষ নিজেই ছোট। সবচে' বড় সত্তা তো হচ্ছে আল্লাহ। তাঁর সামনে সবাই ছোট। এ কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি এই মনে করে আমি ছোট এবং সে বড়। যখন এটা মনে করতে পারবে সালামের সূচনা করার চেষ্টা করতে হবে।

শহীদরা ছয়টি পুরস্কার পাবে

মুসনাদে আহমাদে এসেছে, শহীদরা ছ'টি পুরস্কার পাবে।

(১) তার খুনের প্রথম ফোটা যমিনে পড়ার আগেই তার সব গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(২) তাকে তার জান্নাতের স্থান দেখানো হয়।

(৩) অনিন্দ্য সুন্দরী, ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট ছরদের সাথে তাদের বিবাহ দেওয়া হবে।

(৪) সে বড় ভয় থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৫) তাকে কবরের শান্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

(৬) তাকে অলংকারে সুসজ্জিত করা হবে।

আরেকটি হাদীসে এসেছে, তার মাথায় সম্মানের মুকুট স্থাপন করা হবে। তার একটি ইয়াকুত গোটা দুনিয়া এবং তার সমস্ত জিনস থেকে অনেক বেশি মূল্যবান। সে বাহাত্তর জন ছরে আইন পাবে। নিজের বংশের সত্তর জন ব্যক্তিকে তিনি সুপারিশ করতে পারবেন। সহিহ মুসলিমে রয়েছে, ফরজ ব্যতীত শহীদদের সব গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(তাফসিরে ইবনে কাসীর: খ:৫, পৃ:৯৯-১০০)

হারাম খাদ্যের কারণে চল্লিশ দিন ইবাদত কবুল হয় না

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন। আল্লাহ তা'য়াল! আমার দু'আ কবুল করবেন।

রাসূল সা. বলেন, হে সা'দ! পাক জিনিস এবং হালাল খাবার খাও। আল্লাহ তা'য়ালা তোমার দু'আ কবুল করবেন। কসম ওই সত্তার যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! হারাম খাবার যে মানুষ তার পেটে ফেলে তার কারণে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ইবাদত কবুল হয় না। হারাম খাদ্যে যে শরীর গঠন হয়েছে তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।^{১০৯}

চাইলেন রুটি পেলেন চল্লিশ হাজার দিনার

একদিন হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম র. এর ক্ষুদা পেয়েছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে তার কাছে থাকা একটি জিনিস দিলেন। তাকে বললেন, এটা জামানত রেখে কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর। ওই ব্যক্তি ওই জিনিস নিয়ে যখন সেখান থেকে বের হল হঠাৎ সে আরেকজন ব্যক্তির সাক্ষাত পেল। সে লোকটি খচ্চরের পিঠে চড়ে আসছিল। ওই খচ্চরের পিঠে চল্লিশ হাজার দিনার বহন করে আনছিল। আগন্তুক তার কাছে ইবরাহিম ইবনে আদহাম সম্পর্কে জানতে চাইল। তাকে বলল, এই চল্লিশ হাজার দিনার হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহামের মিরাস বা উত্তরাধিকার সম্পত্তি। তিনি তার পিতা থেকে এই সম্পত্তি লাভ করেন। আমি তার গোলাম তাই এই সম্পত্তি তার কাছে নিয়ে এলাম।

তারপর ওই ব্যক্তি ইবরাহিম ইবনে আদহামের দরবারে উপস্থিত হলো। তাকে চল্লিশ হাজার দিনার দিল। হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম র. বললেন, যদি তুমি সত্য বলে থাক তুমি আমার গোলাম এবং এই সম্পত্তি আমার তবে তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে দিলাম। এই চল্লিশ হাজার দিনারও তোমাকে দিলাম। এখন তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও। যখন ঐ ব্যক্তি চলে গেল ইবরাহিম ইবনে আদহাম র. বললেন, পরওয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে এক টুকরো রুটি চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে এত বেশি পরিমাণ দুনিয়া দিলে। কসম তোমার সত্তার! তুমি এখন আমাকে ক্ষুধায় মেরে ফেললেও আমি তোমার কাছে কিছু চাইব না।^{১১০}

^{১০৯} তাফসিরে ইবনে কাসীর :খ :১, পৃ: ২৩৫।

^{১১০} মাযাহারে হক : খ :৩, পৃ: ১৪২।

আল্লাহ তা'য়ালা নিজের বান্দাদের তাওবা কবুল করেন

(১) রাসূল সা. বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা নিজের বান্দাদের তাওবা কবুল করেন যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু না হয়।

(২) যে মুমিন নিজের মৃত্যুর আগে পূর্ণমাস তাওবা করে তার তাওবা আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেন। এমনকি মৃত্যুর একদিন পূর্বে, বরং এক ঘণ্টা পূর্বেও যে ইখলাস এবং সততার সাথে নিজের রবের দিকে মনোযোগ দেয় আল্লাহ তা'য়ালা তার তাওবা কবুল করেন।

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, যে নিজের মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করে আল্লাহ তা'য়ালা তা কবুল করবেন। আর যে একমাস আগেও তাওবা করে তাও কবুল করেন। আর যে সপ্তাহখানেক আগে তাওবা করে আল্লাহ তা'য়ালা তার তাওবা কবুল করেন। আর যে একদিন আগে তাওবা করে আল্লাহ তা'য়ালা তার তাওবাও কবুল করেন।

(৪) মুসনাদে আহমদে আছে, চার সাহাবী রা. একত্রিত হলেন। তাদের একজন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ থেকে শুনেছি যে ব্যক্তি মৃত্যুর একদিন আগেও তাওবা করে আল্লাহ তা'য়ালা তার তাওবা কবুল করেন। দ্বিতীয় জন প্রশ্ন করল তুমি কি সত্যিই রাসূল সা. থেকে এ কথা শুনেছ? সে বলল, হ্যাঁ, আমি শুনেছি। দ্বিতীয় জন বলল, আমি শুনেছি যদি অর্ধ দিবস আগেও তাওবা করে আল্লাহ তা'য়ালা তা কবুল করেন। তৃতীয়জন বলল, তুমি কি এমন শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি নিজ কানে শুনেছি। তিনি বললেন, আমি শুনেছি যদি এক প্রহর আগেও তাওবা নসিব হয় তবে তাও কবুল করেন। চতুর্থ জন বললেন, তোমরা কি এমন শুনেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি। তিনি বললেন, আমি তো রাসূল সা. কে এমন বলতে শুনেছি যতক্ষণ পর্যন্ত রুহ কঠ থেকে বের হয়ে না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাওবার দরজা তার জন্য খোলা থাকবে।

(৫) হযরত আবু কিলাবা র. বলেন, যখন আল্লাহ তা'য়ালা ইবলিসের ওপর লানত করেন সে সুযোগ চেয়েছিল। সে বলেছিল, তোমার সম্মান ও মর্যাদার কসম! আদম সন্তানের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত রুহ থাকবে আমি তার অন্তর থেকে বের হব না। আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, আমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম! যতক্ষণ তার দেহে রুহ থাকবে আমি তার তাওবা কবুল করবো।

(৬) একটি মারফু' হাদীসে প্রায় একই কথা বর্ণিত আছে। এই সব হাদীসের আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা জীবিত থাকবে এবং তার বেঁচে থাকার প্রত্যাশা থাকবে সে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে, তাওবা করবে, আল্লাহ তা'য়ালার তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ তা'য়ালার সব বিষয়ে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। হ্যাঁ, যখন জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যাবে, ফেরেশতাদেরকে দেখবে।^{১১১}

সগিরা গোনাহ আগামীকাল কবিরি হয়ে যাবে

হযূর সা. বলেন, সগিরা (ছোট) গোনাহকে হালকা মনে করো না, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হযরত সুলাইমান বিন মুগিরা র. বলেন, একবার আমার একটি সগিরা গোনাহ প্রকাশ পায়। আমি এই গোনাহকে হালকা মনে করলাম। এক আগন্তুক এসে আমাকে বলল, হে সুলায়মান!

(১) সগিরা গোনাহকে হালকা মনে করো না, এই সগিরা আগামীকাল কবিরি হয়ে যাবে।

(২) গোনাহ চাই যত ছোটই হোক না কেন এবং অনেক আগের হোক না কেন আল্লাহর কাছে তা অনেক পরীক্ষার করে লেখা থাকে।

(৩) নিজেকে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখ। এমন যেন না হয় নেকী করতে খুব কষ্ট হয়, বরং ভালোর দিকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাও।

(৪) যখন কোনো ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালোবাসে তার অন্তর উড়তে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার চিন্তা ভাবনা করার তাওফিক হয়।

(৫) নিজের রবের থেকে হেদায়েত কামনা কর। নরম ও কোমল ব্যবহার কর। হেদায়াত ও সাহায্যকারী প্রভু তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।^{১১২}

কোনো কৌশলই মৃত্যুকে অপসারণ করতে পারবে না

ইবনে জারির এবং ইবনে আবী হাতেমের মধ্যে হযরত মুজাহিদ র. এর বর্ণনায় একটি লম্বা ঘটনা এসেছে। পূর্বের যুগে একজন মহিলা

^{১১১} তাফসিরে ইবনে কাসীর : খ:১, পৃ:৫২৩।

^{১১২} তাফসিরে ইবনে কাসীর : খ:৫, পৃ:২২৭।

গর্বভর্তী ছিল। যখন তার প্রসব বেদনা শুরু হলো এবং সে সন্তান জন্ম দিল সে নিজের চাকরকে বলল, কোথাও থেকে আগুন নিয়ে এসো। সে বের হতেই দরজায় একজন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সে তাকে প্রশ্ন করলো সন্তান কি মেয়ে না ছেলে। সে উত্তরে বলল, মেয়ে। ওই লোকটি বলল, শোন এই মেয়েটি একশ' মানুষের সাথে সহবাস করবে। সবশেষে তাদের এখানে যে চাকর আছে তার সাথেই তার বিবাহ হবে। একটি মাকড়সা তার মৃত্যুর কারণ হবে। সেই চাকর সাথে সাথে ঘরে ফিরে এলো। একটি ধারালো ছুরি নিয়ে ওই মেয়ে সন্তানের পেট চিরে ফেলল। তাকে মৃত ভেবে সে পালিয়ে গেল। ওই মেয়ের মা অবস্থা দেখে নিজের বাচ্চার পেট বেঁধে দিল এবং চিকিৎসা দিতে থাকল। তারপর সে সুস্থ হয়ে গেল। অনেক দিন গত হয়েছে। তখন সে মেয়ে পূর্ণ ও প্রাপ্ত বয়স্কা হয়েছে। রূপ লাভণ্যে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। সে মন্দ পথে চলা শুরু করেছে।

অপরদিকে সেই চাকর সমুদ্র পথে দূরে কোথাও চলে গেছে। বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে সে প্রচুর অর্থ পয়সা উপার্জন করেছে। বহুদিন পর সে তার অর্থসম্পদ নিয়ে তার সেই পুরনো গাঁয়ের কাছে ফিরে এলো। একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বলল, আমি বিয়ে করতে চাই। গ্রামের সবচে' সুন্দরী, রূপসী যে নারী আছে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। গোটা এলাকায় এই মেয়ের চেয়ে অধিক সুন্দরী আর কোনো নারী ছিল না তাই তাকেই বিয়ের পয়গাম দিল। তারপর বিয়ে সম্পন্ন হলো এবং মেয়ে বিদায় নিয়ে স্বামীর কাছে চলে এলো। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হলো। একদিন আলোচনায় স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করল আপনার পরিচয় কী? আপনি কোথেকে এসেছেন। এখানে কিভাবে এলেন। স্বামী তার জীবনের অতীত কাহিনী সবিস্তারে বলল। আমি এখানের এক মহিলার চাকর ছিলাম। তার এক মেয়েকে মেরে আমি পালিয়ে যাই। এখন অনেক বছর পর আমি ফিরে এসেছি। স্ত্রী বলল আমিই হচ্ছি সেই মেয়ে যার পেট চিরে তুমি পালিয়ে ছিলে। তারপর সে তার যখমের চিহ্নও তাকে দেখায়। এখন তো সে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করল এবং বলল, আমি তো তোমার ব্যাপারে এটাও জানি তুমি একশ' পুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়েছো। সে বলল এই কাজ তো হয়েছে তবে সংখ্যা আমার জানা নেই।

স্বামী বলল তোমার ব্যাপারে আমি আরেকটি বিষয়ও জানি, তোমার মৃত্যুর কারণ হবে একটি মাকড়সা। তবে যেহেতু তোমার সাথে আমার মুহাব্বত সৃষ্টি হয়েছে আমি তোমাকে এমন একটি উঁচু প্রাসাদ করে দিব, তুমি সেখানেই বসবাস করবে, কোনো মাকড়সা বা কীট পতঙ্গ সেখানে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তার জন্য সেরকম একটি প্রাসাদ তৈরি করে দেওয়া হয়, সেখানেই সে বসবাস করতে থাকে। অনেক দিন পরের ঘটনা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বসে ছিল। হঠাৎ ছাদের মধ্যে একটি মাকড়সা দেখা গেল। ওটা দেখেই সে ব্যক্তি বলল, দেখ আজকে এখানে মাকড়সা দেখা গেল। স্ত্রী বলল, সে কি আমার জান নিবে? তবে তো আমিই তার জান নিব। গোলামকে হুকুম করল তাকে ধরে নিয়ে এসো। মাকড়সা ধরে আনা হলো। সে তাকে যমিনের ওপর রেখে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে তাকে পিষে মেরে ফেলল। মাকড়সার পেট থেকে যে ময়লা তার পায়ের নখ এবং গোশতের মধ্যে ঢুকে তার বিষ দিয়ে সমস্ত পা বিষাক্ত করে ফেলল এবং সে মৃত্যু বরণ করল।^{১১৩}

অনেক বড় অপরাধী একটি আয়াত শুনে পূণ্যবান হলো

বনু উমাইয়া সাম্রাজ্যের এক বিদ্রোহী ব্যক্তি যার নাম ছিল আলী আসাদী। সে লড়াই করত, রাস্তায় হামলা করে মানুষকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত। রাষ্ট্রের প্রধান সেনা কর্মকর্তা এবং প্রজারা তাকে শ্রেষ্টতারের চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি। একবার সে জঙ্গলে ছিল। সেখানে এক ব্যক্তির কুরআন পাঠ শুনছিল। সে সময় এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিল।

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

অর্থ: আমার পক্ষ থেকে বলুন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়াল্লা গোনাহ সমূহকে ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

—সূরা যুমার: আয়াত :৫৩।

এ কথা শুনে সে সচকিত হল। তাকে বলল, আমাকে আরেকবার এই আয়াত পড়ে শোনাও। তিনি আবার এই আয়াত পড়লেন। আল্লাহর এই বক্তব্য “হে আমার গোনাহগার বান্দা! তুমি আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আমি সব গোনাহ ক্ষমা করার অধিকারী, আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” এই বক্তব্য শুনে সে ব্যক্তি অতর্কিতে তার তরবারি কোষবদ্ধ করে ফেলল। তখনই সে অন্তর থেকে তাওবা করে ফেলল এবং ফজরের নামাযের আগেই মদিনায় পৌঁছল। সে গোসল করে মসজিদে নববীতে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করল। হযরত আবু হুরায়রার রা. পাশে যে লোকেরা বসে ছিল সে তাদের এক পাশে বসল।

যখন দিন হলো, লোকেরা তাকে দেখে চিনতে পারল। সে তো হুকুমতের বিদ্রোহী ব্যক্তি, অনেক বড় অপরাধী ও দাগী আসামী আলী আসাদী। লোকেরা দাঁড়িয়ে তাকে ধরতে এগোলো। তিনি বললেন, “শোনো ভাইয়েরা! তোমরা আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। কারণ তোমরা আমাকে ধরার আগেই আমি তাওবা করেছি। তাওবার পরেই আমি তোমাদের কাছে এসেছি।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, সে সত্যই বলছে। তাকে নিয়ে মারওয়ান বিন হাকামের কাছে চলো। তিনি সে সময় হযরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষ থেকে মদিনার গভর্নর ছিলেন। সেখানে পৌঁছে বলা হলো এই হচ্ছে আলী আসাদী; সে তাওবা করেছে, অতএব আপনি এখন তাকে কোন শাস্তি দিতে পারেন না।

তাই কেউ তাকে কোনো শাস্তি দেয়নি। মুজাহিদিনদের একটি জামাত যখন রোমকদের সাথে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা করলেন তিনিও তাদের সাথে রওয়ানা করলেন। তারা সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে সামনে এগিয়ে চলছিলেন। কিছুক্ষণ পর বিপরীত দিক থেকে রোমকদের একটি জাহাজের মুখোমুখি হলেন। তারা তাদের জাহাজে থেকেই তাদের সাথে লড়াই করতে চেষ্টা করলেন। তাদের নিপুণ তরবারী চালনার সামনে রোমকরা কিছুতে প্রতিরোধ করতে পারল না। তাই তারা একদিকে পালিয়ে বাঁচল। তারাও তাদের পেছনে ধাওয়া করল। সারা বোঝা যেহেতু এক দিকে ছিল তাই জাহাজটি একদিকে হেলে গিয়ে ডুবে গেল। ফলে সব রোমক সৈন্যরা

সলিল সমাধী বরণ করল। আর আলী আসাদী র. পানিতে ডুবে শহীদ হলেন। (আল্লাহ তার ওপর রহমত নাযিল করুন। আমিন!)^{১১৪}

দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূল সা. এর হৃদয়স্পর্শি বয়ান

সহিহ মুসলিমে এসেছে, একদিন সকালে হযরত নবী কারীম সা. দাজ্জালের আলোচনা করেছেন। তিনি এমনভাবে আওয়াজ ওঠানামা করাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল মদিনার কোনো খেজুরের বাগানে দাজ্জাল অবস্থান করছে কি না। তারপর আমরা যখন রাসূল সা. এর দিকে ফিরে তাকালাম তিনি আমাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? আমরা তাই বললাম। তিনি বললেন, সে যদি আমার বর্তমানে বের হয় তবে আমি নিজেই তার মোকাবেলা করব। কিন্তু সে যদি আমার পরে আসে তবে সকল মুসলমান তার ভোগান্তিতে পড়বে। সে হবে যুবক। তার চোখগুলো ভাসা ভাসা থাকবে। আব্দুল উয্ফা বিন কুতনের মত হবে। তোমাদের মধ্যে যে তাকে দেখবে সে যেন সূরায়ে কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করে। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হবে এবং ডানে বামে সে প্রদক্ষিণ করবে। হে আল্লাহর বান্দারা সে সময় খুব অবিচল থেক।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হযর! সে কতদিন অবস্থান করবে। রাসূল সা. বললেন, সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। তবে তার একদিন হবে এক বছরের সমান। আরেকটি দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আরেকটি দিন হবে এক সপ্তাহ সমান। বাকি দিনগুলো হবে তোমাদের সাধারণ দিনগুলোর মত। তারপর আমরা জানতে চাইলাম যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সে দিনে একদিনের নামাযই কি যথেষ্ট হবে? রাসূল সা. বললেন, না যথেষ্ট হবে না। আমরা জানতে চাইলাম সে দিনের গতির পরিমাণ কী হবে? তিনি বললেন, গতি হবে ওই মেঘের মত হাওয়া যাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। দাজ্জাল এক কণ্ঠকে নিজের দিকে ডাকবে, তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে। তখন আসমান থেকে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ হবে, যমিন থেকে ফল ও ফসল উৎপন্ন হবে। তাদের প্রাণীগুলো বেশি

^{১১৪} তাকসিরে ইবনে কাসীর : খ:১, পৃ: ৭৪৮।

হুটপুট এবং অধিক দুধ দিনো। সে আরেক কওমের কাছে যাবে, তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তাকে অস্বীকার করবে। সে সেখান থেকে ফিরে চলে আসবে, তাদের কাছে কোনো কিছুই থাকবে না। সে অনুর্বর যমিনে দাঁড়িয়ে হুকুম করবে হে যমিনের অভ্যন্তরে লুকায়িত ভাণ্ডার! তোমরা বেরিয়ে এসো। তারা সবাই তখন বেরিয়ে আসবে। মধু মক্ষিকার সবাই তার পেছনে ছুটতে থাকবে।

সে একজন যুবককে ডেকে হত্যা করবে। তারপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দু'টি অংশ তীর নিক্ষেপের দূরত্বে নিক্ষেপ করবে। তারপর তাকে ডাকলে সে জীবিত হয়ে হাসতে হাসতে তার কাছে চলে আসবে। সে সময় আল্লাহ তা'য়ালা মসিহ ইবনে মরিয়মকে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্ব প্রান্তে মিনারের কাছে দু'টি চাদর গায়ে দু' ফেরেশতার ডানার ওপর বাহু রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন পানির ফোটা উপকে পড়বে আর যখন মাথা তুলবেন মুক্তার মত দু' ফোঁটা লটকে থাকবে। যে কাফের পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস পৌঁছবে সে মারা যাবে। তাঁর শ্বাস তাঁর দৃষ্টি যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন। 'লুদের ফটকের' কাছে তাকে পেয়ে হত্যা করবেন। তারপর তিনি সেসব লোকের কাছে ফিরবেন। যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা এই ফেতনা থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি তাদের চেহারা হাত বুলিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন।

এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ঈসা আ. এর নিকট ওহী আসবে আমি আমার সেইসব বান্দাদেরকে পাঠাবো কেউ যাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। তুমি আমার সেই সব বান্দাদেরকে নিয়ে তুরের দিকে যাও। তারপর ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে এবং তারা চারদিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বের হবে। তাদের প্রথম দলটি তাইগ্রীস নদীর তীরে আসবে। তার সব পানি তারা পান করবে। তাদের পর দ্বিতীয় দলটি যখন আসবে এমন শুকিয়ে থাকবে তারা বলবে এখানে মনে হয় কোনো সময় পানি ছিল না।

হযরত ঈসা আ. নিজের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তুর পাহাড়ে এমন অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন একটি ঘাঁড়ের মাথা তাদের কাছে এতোটাই মূল্যবান মনে হবে যেমন আজ তোমাদের কাছে একশত দিনার। এমন মুহূর্তে তিনি এবং

মুমিনগণ মিলে দু'আ করবেন ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন। আল্লাহ তা'য়ালা এই (ইয়াজুজ মাজুজ) এর গলায় গলগণ্ড রোগ সৃষ্টি করবেন। যার ফলে তাদের সবাই একসাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর হযরত ঈসা আ. এবং তার সঙ্গীরা যমিনে নেমে আসবেন। কিন্তু মাটিতে এক বিষত পরিমাণ যমিনও এমন পাওয়া যাবে না যেখানে তাদের পঁচা দুর্গন্ধময় লাশের সারি নেই। তারপর ঈসা আ. এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ ও আশ্রয় চাইবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বখতি উটের গর্দান সমান এক প্রজাতির পাখি পাঠাবেন তারা সে লাশগুলো আল্লাহর মর্জি মাফিক ফেলে আসবে। তারপর ভারী বর্ষণ হবে যা গোটা যমিনকে ধুয়ে মুছে আয়নার মত পরিষ্কার করে দিবে। তারপর যমিনকে হুকুম করা হবে তুমি তোমার অভ্যন্তরের ভাণ্ডার বের করে দাও এবং বরকতসমূহ ফিরিয়ে দাও। সেদিন একটি আনার গোটা এক দলের জন্য যথেষ্ট হবে। সবাই তার বাকলের নিচে আরাম করতে পারবে। এক উটের দুধ একটি গোত্রের সবাই পান করে শেষ করতে পারবে না। অতপর বিশ্বপ্রতিপালক মৃদুমন্দ, পবিত্র হাওয়া চালাবেন যা সব ঈমানদার নারী ও পুরুষের বগলের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে। সাথে সাথে তাদের রুহও উড়ে যাবে। শুধু মন্দ লোকেরা বাকি থাকবে। তারা নিজেদের মধ্যে গাধার মত আচার আচরণে লিপ্ত থাকবে, তাদের ওপর কেয়ামত সংঘটিত হবে।^{১১৫}

দাজ্জালের ফিতনা এবং কেয়ামতের আলামতসমূহ

মুহাদ্দিসীনগণ লিখেছেন, নিচের হাদীসটি বাচ্চাদেরকে শিখাবে, বরং তাদেরকে লিখে দিবে যেন তারা মুখস্ত রাখতে পারে। ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, হযরত সা. একটি খুতবায় দাজ্জালের ঘটনা বর্ণনা করেন। এই ঘটনায় শুধু ভয়ের কাহিনীই বিবৃত হয়েছে। তিনি এমন বলেছেন, দুনিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার চেয়ে ভয়াবহ ও বড় কোনা ফিতনা আর নেই। সকল নবীগণ নিজ নিজ উম্মতকে এই ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আমি সর্বশেষ নবী, আর তোমরা হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আসবে। আমার বর্তমানে যদি সে আসে তবে

আমি তাকে পর্যদুস্ত করব। কিন্তু যদি সে আমার পরে আসে তবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজেকে বাঁচাতে হবে।

সে শাম ও ইরাকের মধ্য থেকে বের হবে। ডানে বামে সে অনেক ঘুরাঘুরি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভালো করে খেয়াল কর, সে সময় তোমরা দৃঢ়, অবিচল থেক। আমি তোমাদেরকে তার এমনসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানাবো যা আগের কোনো নবী তার উম্মতকে জানাতে পারেনি। সে প্রথমে নিজেকে নবী দাবী করবে। তোমরা ভালো করে জেনে রাখ আমার পরে কোনো নবী আসবে না। তারপর সে একধাপ এগিয়ে আরো বলবে, আমি খোদা। তোমরা ভালো করে জেনে রেখ খোদাকে এই চর্মচক্ষু দিয়ে কেউ দেখতে পাবে না। হ্যাঁ, মৃত্যুর পর আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে। আরো শুনে রেখো দাজ্জাল কানা হবে, তোমাদের প্রভু তো কানা নন। তার দু' চোখের মধ্যবর্তী স্থানে কাফের লেখা থাকবে। সব ঈমানদার চাই সে পড়ালেখা জানুক বা নাই জানুক তারা সেটি পড়তে পারবে। তার সাথে আগুন থাকবে এবং বাগান থাকবে। তার কাছে আগুন হচ্ছে মূলত জান্নাত। আর বাগান হচ্ছে মূলত জাহান্নাম। তোমাদের মধ্যে যাকে ওই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং সূরায়ে কাহাফের প্রথম কিছু আয়াত তেলাওয়াত করবে। সে আগুন তার ওপর ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাবে। যেমনিভাবে ইবরাহিম আ. এর ওপর নমরুদের আগুন ঠাণ্ডা হয়েছিল।

তার আরেকটি ফেতনা হবে, সে একজন বেদুঈনকে বলবে আমি যদি তোমার মৃত মা, বাবাকে জীবিত করে দেই তবে কি তুমি আমাকে রব হিসাবে মানবে? সে স্বীকার করবে এমতাবস্থায় দু' শয়তান তার মা, বাবার আকৃতিতে প্রকাশ পাবে। তার কাছে এসে বলবে, হে আমার সন্তান! ইনিই হচ্ছেন তোমার রব! তুমি তাকে মেনে নাও। তার আরেকটি ফেতনা হবে তাকে এক ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব দেওয়া হবে। সে তাকে করাত দিয়ে চিরে দু' টুকরো করে ফেলবে। তারপর লোকদেরকে বলবে, তোমরা দেখ আমি আমার এই বান্দাকে জীবিত করব। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলবে আমার রব সে ছাড়া আরেকজন। সে তাকে জিজ্ঞেস করবে তোমার রব কে? সে উত্তর দিবে আমার রব আল্লাহ। আর তুমি হচ্ছে আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল। খোদার কসম! এখন আমার আগের চেয়েও বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

আরেকটি সনদে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেন, এই মুমিন আমার সমস্ত উম্মতের চেয়ে বেশি মর্যাদা পাবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, এই হাদীস শুনে আমাদের মনে হয়েছিল, এই ব্যক্তি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব হবেন। তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত আমাদের এই ধারণাই ছিল। রাসূল সা. বলেন তার একটি ফেতনা এটাও হবে যে, সে একটি গোত্রের কাছে যাবে, কিন্তু তারা তাকে মানবে না। সে সময়ই তাদের সব জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে। আরেক গোত্রের কাছে যাবে যারা তাকে খোদা হিসেবে মেনে নিবে। সে সময় তার নির্দেশে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে এবং যমিনে বিভিন্ন সবজি ও ফলমূল উৎপন্ন হবে। তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো আগের চেয়ে বেশি মোটা তাজা ও বেশি দুধ দিবে।

মক্কা ও মদিনা ছাড়া সে গোটা পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে। সে যখন মদিনার অভিমুখে রওয়ানা করতে চাইবে সেখানে প্রতিটি রাস্তায় ফেরেশতাদেরকে খোলা তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। তখন সে সানজার শেষ সীমানায় থেমে যাবে। তারপর মদিনায় তিন তিনটি ভূমিকম্প হবে। এ কারণে যত মুনাফিক নারী ও পুরুষ থাকবে সবাই মদিনা থেকে বের হয়ে তার বাহিনীর সাথে মিলে যাবে। সেই দিনের নাম হবে ‘মুক্তির দিন’। উম্মে শরিক রা. রাসূল সা. এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে দিন আরবরা কোথায় থাকবে। তিনি বললেন, সেদিন তাদের সংখ্যা থাকবে কম। তাদের অধিকাংশ থাকবে বায়তুল মুকাদাসে। তাদের ইমাম হবে একজন নেককার ব্যক্তি যিনি নিজে ফজরের নামায পড়াবেন। যখন হযরত ঈসা আ. অবতরণ করবেন, সে ইমাম পেছনের দিক থেকে পেছনে ফিরবেন যেন ঈসা আ. সামনে গিয়ে ইমামতি করতে পারেন। কিন্তু ঈসা আ. তার কোমরে হাত রেখে বলবেন, সামনে অগ্রসর হও এবং নামায পড়াও। তোমার জন্যই ইকামত বলা হয়েছে তাই তাদের ইমামই নামায পড়াবেন। নামায শেষে ঈসা আ. বলবেন দরজা খুলে দাও। যখন দরজা খুলে দেওয়া হবে দাজ্জাল সত্তর হাজার ইহুদির এক বাহিনী নিয়ে উপস্থিত থাকবে। যাদের মাথায় মুকুট ও তরবারিগুলোতে স্বর্ণ থাকবে। দাজ্জাল ঈসা আ. কে দেখে এমনভাবে গলে যাবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। সে সাথে সাথে পিঠ ফিরে পালাতে থাকবে। কিন্তু ঈসা

আ. বলবেন, আল্লাহ আমার হাতে তোর শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছেন। তুমি তা থেকে বাঁচতে পারবে না। সুতরাং ঈসা আ. তাকে 'লুদের প্রাচীর' থেকে ধরবেন। সেখানেই তাকে হত্যা করবেন। তখন ইহুদিরা দিগ্বিদিক ছোট্টাছুটি করে পালাতে থাকবে। কিন্তু তারা কোথাও মাথা লুকানোর জায়গা পাবে না। প্রতিটি পাথর, গাছ, প্রাচীর এবং জন্তু জানোয়ার বলতে থাকবে হে মুসলমান ভাই! এখানে ইহুদি আছে তাকে হত্যা কর। হ্যাঁ, তবে বাবলা গাছ ইহুদিদের গাছ সে বলবে না।

রাসূল সা. বলেন, তারপর হযরত ঈসা আ. আমার উম্মতের হাকিম বা শাসক হবেন। তিনি হবেন ন্যায়পরায়ণ ইমাম; তিনি ত্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং শুকর হত্যা করবেন। তিনি জিযিয়া বা কর মওকুফ করবেন। হিংসা-বিদ্বেষ কোনো কিছু থাকবে না। প্রতিটি বিষধর প্রাণীর বিষ শূন্য হয়ে যাবে। বাচ্চারা নিজের আঙ্গুল সাপের মুখের মধ্যে ঢুকাবে কিন্তু তাতে তাদের কোনো সমস্যা হবে না। বাঘের সাথে তারা লড়াই করবে কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে না। ভেড়া ও বকরির পাল একসাথে এমনভাবে ঘুরাফেরা করবে যেমন রাখাল করে। গোটা পৃথিবী ইসলাম ও ইসলাহের মাধ্যমে এমন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যেমন কোনো পাত্র পানি দিয়ে পরিপূর্ণ হয়। সবার কালিমা এক ও অভিন্ন হবে। আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত হবে না। যুদ্ধ ও লড়াই বিলকুল থেমে যাবে। মাটি সাদা রোপোর মত আলোকিত হয়ে যাবে। আঙ্গুরের থোকা একটি দলের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি আনার এত বড় হবে একটি বড় দল তা থেকে খাবে এবং পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। ষাঁড়ের দাম বেড়ে যাবে, কিন্তু ঘোড়া অনেক সস্তায় মিলবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঘোড়ার দাম কমে যাওয়ার কারণ কী? তিনি বললেন, এ কারণে যে যুদ্ধে ঘোড়া নেওয়া হবে না। ষাঁড়ের দাম বাড়ার কারণ কী? বললেন, সমস্ত যমিনে প্রচুর পরিমাণে সবজি উৎপন্ন হবে।

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের তিন বছর আগে কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। প্রথম বছর এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি আল্লাহর হুকুমে বন্ধ থাকবে এবং যমিনের ফসলও এক তৃতীয়াংশ কমবে। তারপর দ্বিতীয় বছর আল্লাহ আসমানকে হুকুম করবেন, বৃষ্টির দুই তৃতীয়াংশ বন্ধ থাকবে এবং যমিনকেও দুই তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপাদনের নির্দেশ দেওয়া হবে। তৃতীয় বছর আসমান থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষণ হবে না। যমিন থেকেও কোনো

ফসল উৎপন্ন হবে না। এই দুর্ভিক্ষের কারণে সব প্রাণী মারা যাবে। কিন্তু আল্লাহ যাকে চাইবেন সে মরবে না। রাসূল সা. কে জিজ্ঞেস করা হলো সে সময় মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকবে? রাসূল সা. বললেন, সে সময় তাদের এই যিকিরসমূহ খাবারের চাহিদা পূরণ করবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ‘আল্লাহু আকবার’ ‘সুবহানাল্লাহ’ এবং আলহামদুলিল্লাহ বলা তাদের খাবারের চাহিদা পূরণ করে দিবে। ইমাম ইবনে মাজাহ র. বলেন, আমার উস্তাদ তাঁর উস্তাদ থেকে শুনেছেন, তিনি বলতেন এই হাদীসটি বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে দিতে হবে এমনকি তাদেরকে লিখে দিতে হবে। যেন তারা মুখস্থ রাখতে পারে।^{১১৬}

অহংকারীদের পিঁপড়ার আকৃতিতে সমবেত করা হবে

মুসনাদে আহমদে এসেছে, কেয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে জাহান্নামের জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। উত্তপ্ত আগুনের শিখা তাদের মাথায় উত্তাপ ছড়াবে। জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ, মল-মূত্র তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে।^{১১৭}

মেঘ থেকে আওয়াজ এলো চলো

হযরতজি মাও. মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব র. (আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন এবং তার বাসস্থান শীতল রাখুন!) পাকিস্তানে এক আলোচনায় বলছিলেন, হযরত উমর রা. এর খেলাফত কালে (হিজরী ১৮) গোটা আরব উপদ্বীপে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, মূল্য দিয়েও খাবারের কোনো ব্যবস্থা করা যেত না। খাদ্যের অভাবে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। এমন সময়ে উমর রা. এর কাছে সংবাদ এলো মিসরে প্রচুর খাদ্য মজুদ আছে। ইতিপূর্বে মিসর বিজয় হয়েছিল। হযরত আমর ইবনুল আস রা. মিসরের গভর্নর ছিলেন। হযরত উমর রা. তাঁর কাছে চিঠি লিখলেন, এখানে হিজাযে কোনো খাদ্য পণ্য নেই। আমি জানতে পেরেছি মিসরে প্রচুর খাদ্য শস্য মজুদ রয়েছে। অতএব হিজাযের বাসিন্দাদের জন্য সেখান থেকে খাদ্য শস্য পাঠাও। গভর্নর উত্তরে লিখলেন, “আপনি নিশ্চিত

^{১১৬} তাফসিরে ইবনে কাসীর, খ: ১, পৃ: ৬৭০-৬৭২।

^{১১৭} তাফসিরে ইবনে কাসীর : খ :৪, পৃ: ৪৭৪।

থাকুন, আমি এমন বড় কাফেলা দিয়ে খাদ্য পাঠাচ্ছি যার প্রথম উট মদিনাতে থাকবে এবং শেষ উট মিসরে থাকবে।”

মিসর এবং হিজাজ হচ্ছে এক মাসের দূরত্বের পথ। সে সময় উট দিয়ে যাতায়াত করতে হতো। এই গোটা পথ শস্য দিয়ে পরিপূর্ণ করব। সুতরাং এ পরিমাণ শস্য আসল মদিনাতে এবং আশেপাশে ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়া হল যে কেউ ইচ্ছে করবে সে তার রেশন নিতে পারবে। তাই হাজার হাজার লোক সেখানে দস্তুরখানে খাবার খেয়েছে এবং নিজেদের ঘরে রেশন নিয়েছে। একজন সাহাবী তিনি মঙ্গলবারে বাড়িতে কাটাতেন। তিনিও আগন্তুকদের কাছে গুনলেন মদিনাদে খাদ্যশস্য এসেছে এবং তা বিতরণ হচ্ছে। তার কাছে একটি বকরি ছিল। তিনি ভাবলেন, আমি বকরি রেখে একা চলে গেলে যদি কোনো হিংস্র প্রাণী এসে তা খেয়ে ফেলে। তাই বললেন, চলো বকরি যবাই করে খেয়ে নেই তাহলে চলার শক্তি পাবো। তিনি বকরি যবাই করার পর এক ফোটা রক্তও ঝরতে দেখলেন না। এই দৃশ্য দেখে সে সাহাবী কেঁদে দিলেন এবং মাথা ধরে বসে পড়লেন। আমাদের অবস্থাও তো খারাপ আমাদের জানোয়ারদের রক্ত শুকিয়ে পড়েছে। (বকরিতে রক্ত তো তখনই হবে যখন তা দানা পানি এবং ঘাস খাবে। যখন তার খাদ্য জোটেনি তার গায়ে রক্ত থাকেনি।) সে সাহাবী মাথা ধরে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, রাসূল সা. তাশরিফ আনলেন এবং বললেন, তুমি উমরের কাছে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বল। তাকে আরো বলবে, আপনি বড় বুদ্ধিমান ছিলেন, এখন আপনার বুদ্ধি কোথায়? এই সাহাবী ঘুম থেকে জেগে কাঁদতে কাঁদতে মদিনায় পৌঁছলেন। তিনি হযরত উমর রা. এর বাড়ির দরজায় করাঘাত করলেন এবং বললেন, রাসূল সা. এর দূত আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছে।

হযরত উমর রা. খালি পায়ে বাড়ির বাইরে আসলেন। তিনি জানতে চাইলেন কি হয়েছে? সাহাবী গোটা স্বপ্নের ঘটনাটি বললেন। হযরত উমর রা. শূনে কেঁপে উঠলেন। তিনি বলতে থাকলেন আমার কি ভুল হয়েছে? সাথে সাথে মদিনাতে উপস্থিত পরামর্শদাতাদের ডেকে পাঠালেন। সবাইকে ডেকে বললেন, ভাইয়েরা! আমি সব সময় তোমাদেরকে বলে এসেছি, আমার কোন ভুল হয়ে থাকলে তোমরা আমাকে সতর্ক করবে

এবং জানাবে। কিন্তু তোমরা তো আমাকে সতর্ক করছ না। আমার মনিব জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই সংবাদ পাঠিয়েছেন। তোমরা বলো আমার কি ভুল হয়েছে?—সাহাবারা বললেন, আমাদের বুঝে আসছে না কি ভুল হয়েছে। এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার মাথায় একটি বিষয় এসেছে, আপনার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ পড়েছে এবং খাদ্যশস্য ছিল না। মানুষ ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করার পরিবর্তে আপনার গভর্নর, আপনারই মত মানুষের কাছে আবেদন করেছেন। এটাই হচ্ছে সেই ভুল। হযরত উমর রা. বললেন, সত্যিই এটাই হচ্ছে প্রকৃত ভুল। সাথে সাথে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং দু'আ করলেন। দু'আ করার সাথে সাথে আসমানে মেঘের গর্জন শোনা গেল মেঘেরা পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করল। একে অপরকে বলতে বলতে অগ্রসর হতে থাকল। চলো মদিনাতে, উমর ডেকেছেন, চলো মদিনাতে, উমর ডেকেছেন।^{১১৮}

দীনদার ব্যক্তির জানাযা জাঁকজমকের সাথে হবে

এই বিষয়কে খুব মনযোগের সাথে পড়ুন। আল্লাহ তা'য়ালা মালাকুল মাউত ফেরেশতাকে বলবেন, তুমি আমার বন্ধুর কাছে যাও। আমি তাকে সব ধরনের আসমানী বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেছি। সর্বাবস্থায় আমি তাকে আমার প্রতি রাজি, খুশি পেয়েছি। তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে সব ধরনের আরাম ও শান্তিতে রাখব। মালাকুল মাউত তার সাথে পাঁচশত ফেরেশতা নিয়ে রওয়ানা দিবেন। তাদের কাছে যত কাফন, খুশবু ও রায়হানের খোশা থাকে তার মাথায় বিশটি রং থাকে; প্রত্যেক রঙের আলাদা আলাদা গন্ধ থাকবে। সাদা রেশমের কাপড়ের মধ্যে উন্নত মিশক মিলানো থাকবে। তারা সবাই প্রস্তুতি নিয়ে আসবে। মালাকুল মাউত তার মাথায় উপবেশন করবে। ফেরেশতারাও তার চারপাশে বসে থাকবে। প্রত্যেকের কাছে যা কিছু জান্নাতি তোহফা থাকবে সবকিছু তার বিভিন্ন অঙ্গের ওপর রেখে দিবে। সাদা রেশম ও মিশক তার থুথুর নিচে রেখে দিবেন। তার জন্য জান্নাতের দরোজা খুলে দেওয়া হবে। তার আত্মা কখনও জান্নাতি ফুল,

কখনও জান্নাতের লেবাস, কখনও জান্নাতের ফলের মাধ্যমে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হবে। সে সময় তার হ্রেরা হাসতে হাসতে তাঁকে চাইবে। রুহ এই সর দৃশ্য দেখে দ্রুত দেহের খাঁচা থেকে বের হয়ে যেতে চাইবে।

মালাকুল মাউত বলবেন, হে পবিত্র আত্মা! তুমি লম্বা ছায়ার দিকে এবং প্রবাহমান ঝর্ণার দিকে চলো। আল্লাহর কসম! মা সন্তানকে যেমন ভালোবাসে ফেরেশতারাও তাকে তেমন ভালোবাসতে থাকবে। কারণ ফেরেশতা জানে, সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা। যদি সে সামান্যতম কষ্ট পায় তবে আমার রব অসম্ভ্রষ্ট হবেন। তাই তারা তার দেহ থেকে আত্মাকে এমনভাবে বের করে নেন, যেমন— মাখানো আটা থেকে চুল বেরিয়ে আসে। মালাকুল মাউতের আত্মাকে কবজ করার সময় রুহ দেহকে বলে, আল্লাহ তা'য়াল! তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিক, কারণ তুমি আল্লাহর আনুগত্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে এবং খোদার নাফরমানী করতে দেবী করতে। তুমি নিজেও মুক্তি পেলে আমাকেও মুক্তি দিলে। দেহও আত্মাকে এমন উত্তর দিবে। যমিনের যে যে অংশে সে ইবাদত করত তার মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তা কাঁদতে থাকবে। সে সময় সেই পাঁচশত ফেরেশতা তার দেহের চারপাশে দাঁড়িয়ে যাবে। তাকে তারা গোসল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। মানুষ তার পার্শ্ব পরিবর্তনের আগেই ফেরেশতা পরিবর্তন করে দিবে। তাকে গোসল দিয়ে মানুষ কাফন দেওয়ার আগেই ফেরেশতারা নিজেদের সাথে আনা কাফন পরিয়ে দিবে এবং তাকে খুশবু দিয়ে সুগন্ধিময় করবে। তার ঘর থেকে কবর পর্যন্ত দু'দিকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে। তার জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবে। সে সময় শয়তান এতো জোরে চিল্লাতে থাকবে তার হাড়ি ভেঙ্গে যাবে। সে বলতে থাকবে হে আমার বাহিনী! তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও, কিভাবে সে তোমাদের হাত থেকে বেঁচে গেল। তারা জবাব দিবে, সে তো মাসুম বা নিষ্পাপ ছিল। যখন তার রুহ নিয়ে ফেরেশতারা উপরের দিকে আরোহন করতে থাকবেন, হযরত জিবরিল আ. সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়ে তার অভ্যর্থনা জানাবে। প্রত্যেকে আলাদাভাবে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ শোনাবে। এভাবে তার রুহ আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছবে তারপর সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। সে সময় মহান রবের ইরশাদ হবে, আমার বান্দার রুহকে কাঁটাবিহীন কুল, সারি সারি কলাগাছ, লম্বা ছায়া এবং প্রবাহমান পানিতে জায়গা দাও।

তারপর যখন তাকে কবরে রাখা হয় তার ডান দিকে নামায দাঁড়িয়ে যায়। বা দিকে রোযা দাঁড়িয়ে যায়। মাথার দিকে কুরআন দাঁড়িয়ে যায়। একদিকে সবর দাঁড়িয়ে যায়। আযাবের এক টুকরো লাফ দিয়ে আসতে চায় কিন্তু ডান দিকে নামায প্রতিহত করে। সে সব সময় এ ব্যাপারে সতর্ক ছিল, এখন কবরে এসে একটু আরাম পাচ্ছে। আযাব বা দিকে আসতে চায়, রোযা তাকে একই কথা বলে প্রতিরোধ করে। মাথার দিকে আসতে চাইলে কুরআন এবং যিকির একই কথা বলে বাঁধা সৃষ্টি করে। আযাব পায়ের দিক থেকে আসার চেষ্টা করলে নামায বাঁধা সৃষ্টি করে। চারপাশ থেকে প্রাচীর তৈরি হয়ে যায় এবং আযাব কোন দিক দিয়েই পথ খুঁজে পায় না, সে ফিরে যায়।

সে সময় সবর বলে আমি দেখছিলাম যদি তোমার কারণেই এই আযাব দূর হয়ে যায় তবে আমার কি প্রয়োজন? তা না হলে আমি ও তার সহযোগিতা করতাম। এখন আমি পুলসেরাত এবং মিয়ানের সময় তার উপকারে আসব। এখন দু'জন ফেরেশতা পাঠানো হবে, একজন হচ্ছে নাকির এবং অপরজন হচ্ছে মুনকার। তারা বজ্রবিদ্যুতের মত, তাদের দাঁতগুলো হবে কালো, তাদের নিশ্বাস থেকে আগুনের রশ্মি বের হবে, তাদের চুলগুলো পায়ের পাতা পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। তাদের দু' কাঁধের মধ্যে অনেক বেশি দূরত্ব থাকবে। তাদের অন্তরে দয়া, মায়া বলতে কিছু থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের হাতেই হাতুড়ি থাকবে। কবিলা রবিআ' এবং মুযর একত্রিত হয়ে এই হাতুড়ি ওঠাতে চাইলেও সক্ষম হবে না। তারা এসেই বলবে, ওঠে বস। সে ওঠে সোজা হয়ে বসবে। তার কাফন তার একপাশে চলে আসবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে। তোমার প্রভু কে? তোমার দীন কী? তোমার নবী কে? সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এমন ভয়ংকর ফেরেশতার প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারবে? রাসূল সা. এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন। সে নির্দিধায় উত্তর দিবে আমার প্রভু আল্লাহ। যিনি এক ও একক তার কোনো শরিক নেই। আমার দীন হচ্ছে ইসলাম, ফেরেশতাদের দীন ও ইসলাম। আমার নবী খাতামুননাবিয়্যন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ফেরেশতারা বলবে আপনি সঠিক জবাব দিয়েছেন। এখন তারা তার কবরকে ডান, বাম, পেছনে, সামনে, মাথা এবং পায়ের দিক থেকে চল্লিশ

হাত প্রশস্ত করে দিবে। তাকে বলবে আপনি ওপরের দিকে তাকান। সে দেখবে জান্নাতের দরজা খোলা। তাঁরা বলবে, হে আল্লাহর বন্ধু! তুমি যেহেতু আল্লাহর কথা মেনেছ এটাই হচ্ছে তোমার মনখিল।

রাসূল সা. বলেন সেই খোদার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের জান! সে মুহূর্তে তার অন্তরে যে আনন্দ ও পুলক অনুভব করবে তা অকল্পনীয়। তারপর তাকে বলা হবে এখন নিচের দিকে তাকান। সে দেখবে জাহান্নামের দরজা খোলা। ফেরেশতারা বলবে আল্লাহ তোমাকে চিরজীবনের জন্য এখান থেকে নাজাত দিয়েছেন। তারপর তার অন্তর এমন আনন্দিত হবে এই খুশি কখনও শেষ হবে না। হযরত আয়েশা রা. বলেন, তার জন্য জান্নাতের সত্তরটি দরোজা খুলে দেওয়া হবে। সে দরজা দিয়ে প্রভাতের শীতল, মৃদুমন্দ মিষ্টি বাতাস প্রবাহিত হবে। এমনভাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার এই স্বপ্নের ঘুম থেকে কিয়ামতের দিন জাগাবেন।^{১১৯}

মৃতের ওপর কান্নাকাটি করা

জাহেলী যুগে নিয়ম ছিল, যখন কোনো বড় মানুষ মরে যেত সে ওসিয়ত করত ছ' মাস বা এক বছর বা দু' বছর পর্যন্ত তার জন্য কান্নাকাটি করবে। এখন একটি বিষয় পরিষ্কার যে, এত দীর্ঘদিন চোখে পানি নিয়ে কে বসে থাকবে? এটা তো হতেই পারে না। আবার কেউ না কাঁদলে মানুষ কি বলবে, একান্তই সাধারণ ছিলেন। তাই ন্যূনতম ছ'মাস কাঁদার ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু এখন ছয় মাস কাঁদবে কে? তাই কাঁদার জন্য লোক ভাড়া করা হত। তারা ছয় মাস ধরে কাঁদতে থাকত। আর তারা ছিল নারী। কারণ তারা সহজেই কাঁদতে পারে। এখন চাইল সাথে সাথে চোখ থেকে পানি ঝরে পড়তে থাকল। কাঁদা ও কাঁদানোর জন্য নারীদের চেয়ে অধিক ভালো আর কে হতে পারে। তাই এ কাজে মহিলাদেরকে ভাড়ায় নেয়া হত। তাদের পারিশ্রমিক দেয়া হত, খাবার ও পোশাক দেওয়া হত। তাদের কাঁদার পদ্ধতি এমন ছিল, তারা ঘরে বসে থাকত, খানা পিনায় থাকত। তারা দেখত কেউ শোক প্রদর্শনের জন্য আসত সাথে সাথে তারা বসে কাঁদতে থাকত। তারা বলতে থাকত, সে পাহাড় ছিল, সূর্য ছিল, চাঁদ ছিল।

^{১১৯} তাফসিরে ইবনে কাসীর : খঃ, ৩ পৃঃ ৭২-৭৪।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ রা. অসুস্থ হলেন। রাসূল সা. আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সবাইকে নিয়ে তাকে দেখতে আসলেন। রসূল সা. যখন তার ঘরে প্রবেশ করলেন তাকে খুব কঠিন অবস্থায় পেলেন। তিনি দেখলেন তার চারপাশে মানুষের ভিড় লেগে আছে। রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, 'তার জান কি শেষ হয়ে গেছে? লোকেরা বলল, জি না এখনও মরে নাই। রাসূল সা. তার অবস্থা দেখে প্রায় কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর চোখে কান্নার ছাপ দেখে সবাই কাঁদতে থাকল। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, "লোকেরা শোনো! ভালো করে শোনো এবং বুঝে নাও আল্লাহ তা'য়ালার চোখের পানি এবং হৃদয়ের ব্যথার কারণে শাস্তি দিবেন না। কারণ এ বিষয়ের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।" কিন্তু এই দুর্বলতা তথা বিলাপ ও মাতম করার কারণে শাস্তি দিবেন। দু'আ ও ইস্তিগফার করার কারণে রহমত বর্ষণ করেন।

(সহিহ মুসলিম ও বুখারী শরীফ)

হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তাঁর স্বামী আবু সালামা রা. এর মৃত্যুর সময় রাসূল সা. তাশরিফ আনলেন। তাঁর চোখ খোলা ছিল। রাসূল সা. চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, যখন দেহ থেকে আত্মা বের করেন তার সাথে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়। এ কারণে মৃত্যুর পর চোখ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। রাসূল সা. এর এই কথা শুনে তাঁর পরিবারের লোকেরা চিৎকার করে কাঁদতে থাকল। এই বিপদ ও দুঃখজনক ঘটনার মুহূর্তে তাদের মুখ থেকে এমন কথাও বের হচ্ছিল যা স্বয়ং তাদের জন্যই বদদু'আ ছিল। রাসূল সা. বললেন, লোকেরা! নিজের ক্ষেত্রে ভালো ও কল্যাণ মূলক দু'আ করা উচিত। কারণ তোমরা যা কিছু বলছ, ফেরেশতারা তার ওপর আমীন বলে। তারপর রাসূল সা. এইভাবে দু'আ করলেন। হে আল্লাহ! আবু সালামাহকে তুমি ক্ষমা কর। তুমি নিজের হেদায়েতপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে তাকে शामिल করে নাও। তুমিই তাঁকে তোমার তত্ত্বাবধানে রাখ। হে রাব্বুল আলামিন তুমি তাঁকে ক্ষমা করে দাও। তাকে ও তার কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত কর।

(সহিহ মুসলিম শরীফ)

রাসূল সা. নিজের উম্মতের জন্য 'ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন' এবং আল্লাহর ফায়সালার ওপর সম্ভ্রষ্ট থাকাকে মসনুন করেছেন।

আর এই বিষয়টি কান্নাকাটি বা ব্যথিত হৃদয়ের বিপরীত নয়। এটাই কারণ, রাসূল সা. সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্তুষ্ট এবং সবচেয়ে বেশি প্রশংসাকারী ছিলেন। তা সত্ত্বেও নিজের সাহেবজাদা ইবরাহিম রা. এর মৃত্যুর কারণে মুহাব্বত ও দয়ার কারণে কান্না করেন। রাসূল সা. এর হৃদয় আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও শোকের ছিল পরিপূর্ণ এবং যবান তার যিকির ও প্রশংসায় ছিল মুখরিত।

(যাদুল মাআ'দ)

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূল সা. এর সাথে আবু সাইফের ঘরে গেলাম। এই আবু সাইফ ছিলেন রাসূল সা. এর ছেলে ইবরাহিমের দাইমা খাওলা বিনতে মুনযিরের স্বামী। ওই সময়ের রেওয়াজ অনুযায়ী ইবরাহিম নিজের দাইমার ঘরেই অবস্থান করত। রাসূল সা. নিজের সন্তানকে ওঠালেন, চুমু দিলেন এবং তার নাকে মুখ রাখলেন। বাচ্চাদের আদর করার সময় যেমন করা হয়।

তারপর একবার রাসূল সা. এর সন্তান ইবরাহিমের সর্বশেষ অসুস্থতার সময় আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। সে সময় ইবরাহিম প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি ছিলেন। তার এই অবস্থা লক্ষ্য করে রাসূল সা. এর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. (যিনি মনে করতেন রাসূল সা. এই ধরনের ঘটনায় মর্মান্বিত এবং প্রভাবিত হতে পারেন না।) বিস্ময় কণ্ঠে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারও এই অবস্থা?” রাসূল সা. বললেন, হে ইবনে আউফ! এটা কোনো খারাপ কথা বা খারাপ অবস্থা নয়, বরং এটা হচ্ছে মায়া ও ভালোবাসার প্রকাশ। তারপর দ্বিতীয়বার রাসূল সা. এর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে। রাসূল সা. বললেন, চোখ পানি প্রবাহিত করে এবং হৃদয় চিত্তিত। আমরা মুখে সেই কথাই বলব যা আল্লাহ পছন্দ করেন। ইনালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন। হে ইবরাহিম! তোমার বিদায়ে আমরা খুবই ব্যথিত।^{১২০}

^{১২০} সহিহ আলবুখারি, মুসলিম, মাআ'রিফুল হাদীস, উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম: পৃ: ৫৫৭-৫৫৯।

রাসূল সা. এর মূল্যবান হাদিয়া

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. এক কৃষকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে নামাযে দু'আ করছিল এবং বলছিল:

- (১) হে ওই সত্তা! চোখ যাকে দেখে না।
- (২) হে ওই সত্তা! কারো চিন্তা ও কল্পনা যাকে খুঁজে পায় না।
- (৩) হে ওই সত্তা! প্রশংসাকারী যার প্রশংসা করে শেষ করতে পারে না
- (৪) হে ওই সত্তা! যুগের কোনো পরিবর্তন তাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

(৫) হে ওই সত্তা! সময়ের কোনো পরিবর্তন থেকে যিনি কোনো আশংকা করেন না।

- (৬) হে ওই সত্তা! যিনি পাহাড়ের ওজন সম্পর্কে জানেন।
- (৭) হে ওই সত্তা! যিনি সমুদ্রের পানির পরিমাণ সম্পর্কে জানেন।
- (৮) হে ওই সত্তা! যিনি বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা সম্পর্কে জানেন।
- (৯) হে ওই সত্তা! যিনি গাছের পাতার সংখ্যাও জানেন।
- (১০) হে ওই সত্তা! যিনি ওই সমস্ত বিষয় জানেন যা রাতের আঁধার ঢেকে রাখতো এবং দিনের আলো যা আলোকিত করত।

(১১) হে ওই সত্তা! যাকে এক আসমান আরেক আসমান লুকাতে পারে না।

- (১২) হে ওই সত্তা! যাকে যমিন আরেক যমিন থেকে লুকাতে পারে না।
- (১৩) হে ওই সত্তা! সমুদ্রের পেটে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন।
- (১৪) হে ওই সত্তা! যিনি পাহাড়ের মধ্যে যা কিছু তিনি জানেন।

তুমি আমার জীবনের শেষ অংশকে কল্যাণমূলক বানিয়ে দাও। আমার শেষ আমলগুলো সবচেয়ে উত্তম আমল বানিয়ে দাও। আমার জন্য সেই দিনকে উত্তম দিন বানাও যে দিন তোমার সাথে আমার সাক্ষাত হবে।

রাসূল সা. একজন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিলেন, এই কৃষক যখন নামায থেকে ফারেগ হবে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। নামায শেষে সেই ব্যক্তি রাসূলের সা. দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসূল সা. এর কাছে কিছু স্বর্ণ হাদিয়াস্বরূপ ছিল। তিনি তাকে সেখান থেকে হাদিয়া দিলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বেদুইন! তুমি কোনো গোত্রের লোক? সে

বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বনি আমের বিন ছা'ছাআ গোত্রের লোক। রাসূল সা. বললেন, তুমি কি জানো আমি তোমাকে এই স্বর্ণ কেন দিলাম? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাথে আমার যে সম্পর্ক তার কারণে। রাসূল সা. বললেন, আত্মীয়তার হক তো আছেই। তবে আমি তোমাকে এই কারণে এগুলো হাদিয়া দিলাম, তুমি অনেক উত্তমভাবে আল্লাহর প্রশংসা করেছ। (হায়াতুস সাহাবা: খ: ৩, পৃ: ৩৬৮-৩৬৯)

যার ওসিলায় দু'আ করলে অবশ্যই কবুল হয়

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সা.কে এই দু'আ করতে শোনতাম। অনুবাদ: “হে আল্লাহ! আমি তোমার নামের ওসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। যা তোমার কাছে সবচে' প্রিয় যার মাধ্যমে তোমাকে ডাকা হলে তুমি অবশ্যই শোন। যখন তোমাকে তার ওসিলায় চাওয়া হয় তুমি অবশ্যই দাও। যখন তার ওসিলায় তোমার রহমত আশা করা হয় তুমি অবশ্যই রহমত কর। আর যখন তোমার ওসিলায় প্রশস্ততা চাওয়া হয় তবে তুমি অবশ্যই প্রশস্ততা দাও।”

হযরত আয়েশা রা. বলেন, একদিন রাসূল সা. বলেন, হে আয়েশা! তুমি কি জানো আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এমন নাম বলেছেন, যেই নামের ওসিলায় কোনো দু'আ করলে সে দু'আ অবশ্যই কবুল করা হয়। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা বাবা আপনার ওপর কোরবান হোক। আমাকে সে নাম শিখিয়ে দিন। রাসূল সা. বললেন, হে আয়েশা! তোমাকে শেখানো উচিত হবে না। তিনি বলেন, আমি একদিকে ফিরে বসে থাকলাম। তারপর আমি দাঁড়িয়ে রাসূল সা. এর মাথায় চুম্বন করলাম। তারপর আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সে নাম শিখিয়ে দিন। রাসূল সা. বললেন, “হে আয়েশা! তোমার জন্য উচিত হবে না তোমাকে এই নাম শিখিয়ে দেয়া। কারণ তোমার জন্য উচিত হবে না এর মাধ্যমে কোনো কিছু চাইবে। আমি সেখান থেকে উঠে ওয়ু করে দু'রাকাত নামায পড়লাম। তারপর এই দু'আ পড়লাম— হে আল্লাহ! আমি তোমাকে আল্লাহ বলে ডাকি। তোমাকে রাহমান বলে ডাকি। তোমাকে তোমার সুন্দর নাম বলে ডাকি। যা জানি এবং যা জানি না। তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমার ওপর তুমি রহমত কর।”

হযরত আয়েশা রা. বলেন, হযূর সা. আমার এই দু'আ শুনে অনেক হাসলেন এবং বললেন, তুমি যে নামে আল্লাহকে ডেকেছো তার মধ্যে আল্লাহর ওই বিশেষ নাম আছে।^{১২১}

হযূর সা. এর দু'আর বরকত

হযরত আলী রা. বলেন, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি রাসূল সা. এর খেদমতে উপস্থিত হই। রাসূল সা. আমাকে তাঁর স্থানে বসালেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে নামায পড়া শুরু করলেন। তাঁর কাপড়ের একটি অংশ আমার ওপর রেখে দিলেন। তারপর নামায শেষে বললেন, “হে ইবনে আবি তালেব! এখন তুমি ঠিক হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা করো না। আমি যে জিনিস আমার জন্য আল্লাহর কাছে চেয়েছি তা তোমার জন্যও চেয়েছি। আর আমি আল্লাহর কাছে যা চেয়েছি আল্লাহ তা আমাকে অবশ্যই দিবেন। তবে আমাকে এতটুকু বলা হয়েছে আপনার পরে কোনো নবী আসবে না।” আমি সেখান থেকে ওঠার পর পরিপূর্ণ সুস্থ বোধ করলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমার কোনো অসুখই হয়নি।^{১২২}

পেরেশানী ও চিন্তা দূর করার নববী আমল

হযরত আনাস বিন মালেক রা. বলেন, নবী কারীম সা. যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন, তিনি ডান হাত নিজের মাথায় রাখতেন এবং বলতেন, আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি ব্যতিত কোন মারুদ নেই। তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপাশীল। হে আল্লাহ তুমি আমার সব চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দাও। আরেকটি বর্ণনায় আছে, তিনি নিজের ডান হাত কপালে রেখে বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার সব চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দাও”।

পরিবারকে আল্লাহর হেফাজতে দেওয়ার নববী আমল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবী কারীম সা. এর কাছে এক লোক আসল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি আমার প্রাণ, নিজের পরিবার-পরিজন এবং সম্পদ নিয়ে ভয় করছি। রাসূল সা. বললেন, সকালে ও সন্ধ্যায় এই কালিমা পড়তে থাক। আমি আমার দীন,

^{১২১} হায়াতুস সাহাবা: খ:৩, পৃ:৩৬৯-৩৭০।

^{১২২} হায়াতুস সাহাবা : খ: ৩, পৃ: ৩৭৩।

আমার প্রাণ, আমার সন্তান এবং পরিবার, পরিজনের ওপর আল্লাহর নাম নিচ্ছি। ওই লোক এই কালিমা পড়া শুরু করেছে। তারপর রাসূল সা. এর কাছে আসলেন। রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার যে ভয় করত, এখন কি অবস্থা। সে বলল, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন সে ভয় এখন একদম নেই।^{১২৩}

শয়তানের অকল্যাণ থেকে বাঁচার নব্বী নির্দেশনা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বলেন, যখন নবী কারীম সা. মসজিদে প্রবেশ করতেন এই কালিমা পড়তেন, “আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি সে মহান, সম্মানিত ও ক্ষমতাবান আল্লাহর কাছে।” মানুষ যখন এই কালিমা পড়ে শয়তান বলে সারা দিন এই মানুষটি আমার অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকবে।^{১২৪}

হে আদম সন্তান! রাগের সময় আমাকে স্মরণ কর

হযরত ওহাইব ইবনে দারদ রা. থেকে বর্ণিত আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, “হে আদম সন্তান! তুমি রাগের সময় আমাকে স্মরণ কর আমি আমার রাগের সময় তোমাকে ক্ষমা করে দিব। যাদের ওপর আমার শাস্তি হবে আমি তাদের থেকে তোমাকে রক্ষা করব। ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে আমি তোমাকে ধ্বংস করব না। হে আদম সন্তান! যখন তোমার ওপর যুলুম করা হয় তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আমার দিকে মনোযোগী হও, আমার ওপর ভরসা কর, আমার সাহায্যের ওপর সন্তুষ্ট থেক। স্মরণ রেখ আমি তোমাকে সাহায্য করব এটা তার চাইতে উত্তম তুমি নিজে নিজেকে সাহায্য করবে।” আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে ভালোর তাওফিক দান করুন। তার সাহায্য আমাদের ওপর নাযিল করুন। আমিন।^{১২৫}

নিচের দু’আটি পড়লে পরীক্ষা থেকে সুরক্ষা করা হবে

হযরত বুসর বিন আবি তারাহ রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে এই দু’আ বলতে শুনেছি। “হে আল্লাহ! সমস্ত কাজে ভালো পরিণাম দাও।

^{১২৩} হায়াতুস সাহাবা: খ: ৩, পৃ: ৩৮৯।

^{১২৪} হায়াতুস সাহাবা : খ: ৩, পৃ: ৩৯৪।

^{১২৫} তাফসিরে ইবনে কাসীর: খ: ৩, পৃ: ৪৪৪।

আমাদেরকে দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখ।” তাবরানীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সা. এও বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দু’আ করবে পরীক্ষায় লিপ্ত হওয়ার আগেই সে মৃত্যু বরণ করবে।^{১২৬}

ভয় ও আতংক দূর করার নববী আমল

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, হযরত খালেদ বিন ওলিদ রা. রাসূল সা. কে বললেন, তিনি রাতে ভয়ংকর কিছু দেখেছেন। এর কারণে তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়তে পারেননি। রাসূল সা. বললেন, হে খালেদ বিন ওয়ালিদ! তোমাকে এমন কালিমা শিখিয়ে দেব না যা তুমি তিনবার পড়লে আল্লাহ তা’আলা তোমার এই কষ্ট দূর করে দিবেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা, বাবা আপনার ওপর কোরবান হোক। নিশ্চয়ই আপনি তা শেখাবেন। আমি তো আপনাকে আমার এই সমস্যার কথা এ কারণেই বলেছি। রাসূল সা. বললেন, এই কালিমা পড়।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

অর্থ: আমি আল্লাহর গোস্বা, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর বান্দাদের অকল্যাণ ও শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং শয়তানের আমার কাছে আসা থেকে তাঁর এই পরিপূর্ণ কালিমার মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, কয়েক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা বাবা আপনার ওপর কোরবান হোক। ওই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। যে কালিমা আপনি আমাকে শিখিয়েছেন আমি তা তিন বার আদায় করেছিলাম আল্লাহ আমাকে সেই কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। এখন তো আমার অবস্থা এই যে আমি জঙ্গলে বাঘের সাথেও রাত কাটাতে কোন ভয় করি না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, রাসূল সা, বলেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায় সে যেন এই দু'আ পড়ে। আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি...।

নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ঘুমের মধ্যে ভয় পেতেন। তিনি রাসূল সা. এর কাছে এই বিষয়ে আলোচনা করলেন। রাসূল সা. বললেন, যখন তুমি ঘুমোতে যাবে তখন এই দু'আ পড়বে। আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি...। ইমাম মালিক র. মুয়াত্তায়ে লিখেন, আমার কাছে এই সংবাদ এসেছে যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. হযর সা. এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমি ঘুমের মধ্যে ভয় পাই। তুমি সে সময় এই দু'আ পড়ে নিবে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. রাসূল সা. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভয় ও আতংক লাগে। রাসূল সা. বলেন, যখন তুমি বিছানায় ঘুমোতে যাবে এই দু'আ পড়বে।^{১২৭}

ওলীদের পোশাক বিভিন্ন হয়

হযরত জানে জানা র. নকশবন্দিয়া তরিকার অন্যতম বড় বুয়ুর্গ ছিলেন। কোনো বাদশাহরও সে শান হয় না যা তাঁর ছিল। তাঁর মসনদ ছিল ভিন্ন। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ছিল ভিন্ন। আলাদা খাদেম ছিল। দরজায় আলাদা দারোয়ান ছিল। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এতোটাই বেশি সচেতন ছিল যে, খড়কুটাও যদি তার সামনে থাকত তাঁর মাথায় ব্যথা শুরু হত। তিনি বলতেন, ঘরের মধ্যে ময়লা দিয়ে ভরে রেখেছে। তার স্বভাবে ছিল ভিন্ন রকম লাজুকতা।

সে সময়ের বাদাশা তাঁর কাছে আসার অনুমতি চাইল। তিনি সাক্ষাতের জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু অনুমতি পেলেন না। অবশেষে মির্জা সাহেব র. এর বিশেষ খাদেমকে নিজের দরবারে ডাকলেন। তুমি তাঁর অনেক প্রিয় ব্যক্তি। তাঁর সাথে তোমার সম্পর্ক অনেক গভীর। তুমি যে কোনো উপায়ে হোক আমার জন্য পাঁচ মিনিটের সাক্ষাতের ব্যবস্থা কর। সে যে কোনোভাবেই হোক হযরত র.কে রাজি

করালেন। পাঁচ মিনিটের জন্য বাদশার সাক্ষাতের অনুমতি মিলল। তখন বাদশা আসলেন। খুব আদব ও বিনয়ের সাথে দু' হাঁটু গেড়ে একদিকে বসে পড়লেন। হযরত মির্যা সাহেব র. এর পিপাসা অনুভূত হলো। তিনি পানি পান করানোর জন্য খাদেমকে ইশারা করলেন। বাদশা বুঝে ফেললেন, তিনি পানি পান করতে চাইছেন। তাই বাদশা দাঁড়িয়ে করজোর হাতে আরজ করলেন, হযরত! যদি আমাকে অনুমতি দিতেন। বাদশাকে অনুমতি দেওয়া হল। ঠিক আছে তুমি পানি পান করাও। বাদশা পানি আনার জন্য গেলেন। কলসের ওপর যে ঢাকনা রাখা হয় তিনি যখন পানি এনে রাখলেন তা একটু বাঁকা ছিল। ব্যস, হযরতের মেযাজ বিগড়ে গেল। হযরত বললেন, তুমি পানি পান করতে শেখনি, কিভাবে তুমি রাজ্য পরিচালনা কর। এখান থেকে দূরে যাও। বিশেষ খাদেমকে পানি দিতে হুকুম দিলেন। এ রকম শানের বুয়ুর্গ ছিলেন। তাদের বুয়ুর্গীতে কোনো কমতি ছিল না। তাঁদের সোহবত, সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে হাজারও মানুষ আল্লাহর ওলী হয়েছে। এটাই হচ্ছে বুয়ুর্গীর ভিন্ন শান।

এমনিভাবে ভিন্ন শান ছিল হযরত শাহ গোলাম আলী র.এর। তাঁর অবস্থা তো এমন যে, না তাঁর ভিটে মাটি, না কাপড় চোপড়, না কোনো সহায় সম্বল ছিল। যুহুদ ও অল্পতুষ্টি, ক্ষুধা ও অভাব যার নিত্যসঙ্গী; তারপর ও তাঁর দরবারে অনেক মেহমানের সমাবেশ ছিল। তিনশ, চারশ মেহমান সব সময় তাঁর মেহমানখানার দস্তরখানে উপস্থিত থাকতো। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তাঁর কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা ছিল না। টুংকের জামিদারের নওয়াব, নওয়াব মীর খান হযরতের মুরিদ ছিলেন। তিনি দেখলেন শায়খের দরবারে প্রতিদিন তিনশ, চারশ মেহমানের সমাগম হয়। তিনি কোথেকে এতো লোকের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। হযরতকে হয়তো তার জন্য অনেক পেরেশানী করতে হয়। তাই টুংকের জমিদারির অধিনে এক জেলা যার বাৎসরিক আয় এক লাখ রুপি ছিল। তিনি একটি পিতলের পাথরে পুরো জেলার বাৎসরিক আয় হযরতের নামে লিখে পাঠালেন। আমি তার পুরো আয় আপনার জন্য হাদিয়া হিসেবে পাঠালাম। আপনি যেন মেহমান ও পরিবারের খরচ মিটাতে পারেন। আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে আমার হাদিয়া কবুল করুন। হযরত শাহ গোলাম আলী র. সে পাথরের ওপর জবাব লিখে পাঠালেন এবং একটি কবিতার পংক্তি লিখলেন। আমরা

আমাদের অভাব ও দারিদ্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। আমার পক্ষ থেকে তাকে বলে দাও, রিষিক পূর্ব নির্ধারিত। তোমার জেলার আয়ের আমাদের প্রয়োজন নেই।

একদিকে তো এই পরহেযগারী, অল্পতুষ্টি ও দুনিয়া বিমুখতার উদাহরণ। অন্যদিকে জাঁকজমক ও ঠাটবাটের উদাহরণ। হযরত মির্যা জানে জানা র. এর বৈশিষ্ট্য। তিনি ওলীয়ে কামিল ছিলেন। ওলীদের পোশাক বিভিন্ন ধরনের হয়। ওলী হওয়ার সম্পর্ক কাপড়ের সাথে নয়, বরং অন্তরের সাথে। অন্তর যখন আল্লাহর কাছে সমর্পিত হয় ওলী কামিল হয়ে যায়। নেক নিয়তের সাথে কেউ যদি উন্নত পোশাক পরিধান করে তবে তাতেও সাওয়াব রয়েছে। পক্ষান্তরে কারো মধ্যে যুহুদ ও অল্পতুষ্টি প্রাধান্য বিস্তার করে।^{১২৮}

রমযানের প্রথম রাতেই মাগফিরাত করা হয়

হযরত আনাস রা. বলেন, যখন রমযান মাস নিকটবর্তি হয় রাসূল সা. মাগরিবের সময় সংক্ষিপ্ত বয়ান করেন। তিনি বলেন, তোমাদের সামনে রমযান চলে এসেছে। তোমরা রমযানকে স্বাগত জানাবে। মনোযোগ দিয়ে শোন! রমযানের প্রথম রাতেই আহলে কিবলা (মুসলমান)দের প্রত্যেকেই মাগফিরাত করা হয়।^{১২৯}

জিবরিল আ. ইয়াকুব আ. কে ওযীফা শিখিয়েছেন

তাফসিরে রুহুল মাআ'নিতে হযরত আলুসী র. লিখেছেন, যখন হযরত ইউসুফ আ. নিজের ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তোমাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই বলে ঘোষণা দিলেন, ভাইয়েরা বলল, হে আব্বাজান! এবং আমাদের ভাই! আপনি তো আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আপনাদের ক্ষমা আমাদের কোনো উপকারেই আসবে না। এ কারণে আপনারা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দু'আ করুন ওহীর মাধ্যমে আমাদের ক্ষমার বিষয়টি জানান। আশ্বিয়ায়ে কেরাম যেহেতু আল্লাহর প্রিয় বান্দা হন এ কারণে হযরত ইয়াকুব আ. বললেন, শীঘ্রই আমি তোমাদের জন্য আমার প্রভূর

^{১২৮} খুতুবাতে হাকিমুল ইসলাম:খ:৪, পৃ: ৩৪৩-৩৪৫।

^{১২৯} হায়াতুস সাহাবা : খ:৩, পৃ: ৪৩৯-৪৪০।

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তারপর ইয়াকুব আ. কিবলামুখি হয়ে দু'আ করার জন্য দাঁড়ালেন এবং হযরত ইউসুফ আ. তাঁর পেছনে এবং এই দু'জনের পেছনে বাকি সব ভাইয়েরা দাঁড়ালো। তিনি খুব বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, কিন্তু বিশ বছর পর্যন্ত দু'আ কবুল হয়নি। তারপর জিবরিল আ. আসলেন এবং এভাবে দু'আ শেখালেন।

- (১) হে ঈমানদারদের আশা! তুমি আমাদের আশা পূরণ কর।
 - (২) হে ঈমানদারদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী তুমি আমাদের কবুল কর।
 - (৩) হে ঈমানদারদের সাহায্যকারী তুমি আমাদের সাহায্য কর।
 - (৪) হে তাওবাকারীদের পছন্দকারী তুমি আমাদের তাওবা কবুল কর।
- ভোর রাতে যখন এই দু'আ করা হয় তা কবুল করা হয়।^{১৩০}

মুকাদ্দমায় সফলতা অর্জন করার সর্বোত্তম আমল

এক লাখ একান্ন হাজার বার এই দু'আ পড়বে। ইয়া হালিমু, ইয়া আলেমু, ইয়া আলীয়্যু, ইয়া আযিমু। মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানভী র. লিখেন, কঠিন থেকে কঠিন কোনো মোকাদ্দমায় এই ওযীফা পাঠে অনেক উপকার রয়েছে। একাধিকবার পরিক্ষিত আমল। এই ওযীফা এক লাখ একান্ন হাজার বার ওযীফা হিসাবে পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ সফলকাম হবে।^{১৩১}

সাধারণ নেকীও মাগফিরাতের কারণ হয়

আল্লাহ তা'য়ালা হচ্ছেন শাকুর। মিরকাতে শাকুরের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যিনি কম আমলের ওপর বিনিময় প্রদান করেন তাকে শাকুর বলা হয়। হযরত মোল্লা আলী কারী র. একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখানো হলো, তাকে প্রশ্ন করা হলো আল্লাহ তা'য়ালা তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? সে বলল, আমার হিসাব হয়েছে। তাই আমি ভয় পেলাম। কারণ নেকীর পাল্লা হালকা ছিল। হঠাৎ সেখানে মাটির একটি থলে এসে পড়ল এবং নেকীর ওজন বেড়ে গেল। আমি

^{১৩০} তাফসিরে রুহুল মাআ'নি, পারা: ১৩, খ: ৭, পৃ: ৫৬।

^{১৩১} আততারায়েফ ও আযযারায়েফ: খ: ২, পৃ: ২৬, কাশকুলে মা'রিফাত : পৃ: ২৯।

আরজ করলাম এই থলে কোথেকে এসেছে। ইরশাদ হলো এটি সেই মাটি যা তুমি অমুকের কবরের ওপর রেখেছিলে।^{১৩২}

একজন বিধবার আশ্চর্য কাহিনী

যদি বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর বাচ্চাদের প্রতিপালনের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ না করে তবে তাকে বাকি জীবন গাজী হয়ে বেঁচে থাকার সাওয়াব দান করা হয়।^{১৩৩}

একটি ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। হযরত হাসান বাসরী র. এর যুগ। তাঁর এক ছাত্র নিয়মিত তাঁর দরসে উপস্থিত হতেন। তার এক ছেলে ছিল। স্বামীর ভালো ব্যবসা ছিল। সে মহিলা খুব ভালো ছিল। ইবাদত করত। নিয়মিত দরস শুনত এবং পুণ্যবান জীবন যাপন করত। সে বেচারির যৌবন বয়সে স্বামী ইন্তিকাল করে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, যদি আমি দ্বিতীয় বিবাহ করি তবে তো আমি স্বামী পাবো। কিন্তু আমার সন্তানের জীবন তো ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই স্বামী তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে তা আমার জানা নেই। সে তো এখন প্রায় যুবক, সেই আমার ভরসা। এসব ভেবে মা তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা কোরবানী দিলেন। এমন মহিলার জন্য হাদীসে এসেছে, যে এভাবে পরবর্তী বিবাহ না করবে এবং বাচ্চাদের প্রতিপালনের জন্য এভাবে জীবন-যাপন করবে, বাকি সময় সে গাজী হয়ে জীবন-যাপন করার সাওয়াব পাবে। কারণ সে নিজের মনের বিরুদ্ধে জেহাদ করছে।

সেই মা বাড়িতে বাচ্চার পুরোপুরি দেখাশোনা করত। কিন্তু যখন সে বাচ্চা ঘর থেকে বের হত, মা তাকে দেখাশোনা করতে পারত না। এ কারণে সে বাচ্চা খারাপ সংস্রবের শিকার হয়। সে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। মা নিয়মিত তাকে বুঝাতো, কিন্তু তার কোনো পরিবর্তন হত না। মা তাকে হাসান বাসরী র. এর কাছে নিয়ে এলেন। হযরতও তাকে কয়েক ঘণ্টা বুঝালেন। কিন্তু তার ভালোর দিকে কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি হলো না। কখনও মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে আসত। মা আবার

^{১৩২} কাশকুলে মা'রিফাত: পৃ: ৬০-৬১।

^{১৩৩} বুখারী, বিধবা অধ্যায়: হাদীস নং: ৬০০৬।

তাকে বুঝাতো এবং হযরতের কাছে নিয়ে যেত। হযরত তাকে বুঝাতেন এবং দু'আ করতেন। কিন্তু তার কানে কোনো কিছুই প্রবেশ করত না। এমনকি হযরত মনে মনে ভাবলেন এই ছেলের অন্তর পাথর হয়ে গেছে। মা তো মা-ই। মায়েরা ভালো সন্তানকে ভালোবাসেন এবং এমনভাবে খারাপ সন্তানকেও ভালোবাসেন। তার দৃষ্টিতে সন্তান তো সন্তানই। মা তো তাকে কখনও ত্যাগ করতে পারে না। বাবা বলতে পারেন তাকে ঘর থেকে বের করে দাও। কিন্তু মা কখনও তা বলতে পারেন না। কারণ তার অন্তরে মুহাব্বত, ভালোবাসা রাখা হয়েছে। এ কারণে মা তার জন্য খাবার প্রস্তুত রাখেন। তার জন্য দরজা খুলে রাখেন। তাকে আদর করে বুঝান। হে আমার কলিজার টুকরা! তুমি ভালো হয়ে যাও, ভালোভাবে জীবন-যাপন কর।

এখন দেখুন কয়েক বছর মন্দ কাজে লিপ্ত থেকে সে তার স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে, সম্পদ খুইয়ে ফেলেছে এবং তার শরীরে রোগ বাসা বেঁধেছে। ডাক্তাররা বলল, এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। এখন তার চলা ফেরা করার কোন শক্তিও নেই। সব সময় বিছানায় পড়ে থাকে। এখন সে তার সামনে আখেরাতের সফরের চিন্তা আসতে থাকল। আরেকবার তার মা তার পাশে বসে মুহাব্বতের সাথে বুঝালেন, আমার আদরের সন্তান! এতদিনে তুমি তোমার জীবনের সবকিছু শেষ করে দিয়েছ। এখনও যতটুকু সময় আছে তুমি তওবা করে আল্লাহর কাছে গোনাহের ক্ষমা চাও।

মা যখন তাকে মুহাব্বতের সাথে বুঝালেন তার মনে কিছু প্রভাব হল। সে বলল মা আমি কিভাবে তওবা করব। আমি তো অনেক বড় বড় গোনাহ করেছি। মা বলল বেটা! আমি হযরতের কাছে জিজ্ঞেস করব। সে বলল, মা আমি তো হেঁটে যেতে পারব না। আপনি আমাকে নিয়েও যেতে পারবেন না। আপনি নিজেই হযরত হাসান বসরী র. এর কাছে যান। হযরতকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। মা বলল, ঠিক আছে বেটা আমি হযরতের কাছে যাচ্ছি। ছেলে বলল, মা আপনি আসতে আসতে আমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই তবে হাসান বসরী র. কে বলবে তিনি যেন আমার জানাযা পড়ান।

মা হযরত হাসান বসরী র. এর কাছে গেলেন। হযরত এই মাত্র খানাপিনা শেষ করেছেন। কিছুটা ক্লান্ত ছিলেন এবং দরস দেওয়াও বাকি

ছিল। তিনি দুপরের বিশ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময়ে মা দরজায় করাঘাত করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? তিনি আরজ করলেন হযরত আমি আপনার শিষ্য। আমার ছেলেকে আপনি তাওবা পড়িয়ে দিন। হযরত চিন্তা করলেন সে তাকে এখন ধোকা দিচ্ছে। সে তার নিজের সময় এবং হযরতের সময় নষ্ট করবে। বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়েছে এখনও পর্যন্ত কোনো কথাই তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি এখন আর কি হবে। তিনি বললেন, আমি আমার সময় কেন নষ্ট করব। আমি যাব না। মা বলল, হযরত সে তো এ কথাও বলেছে যদি আমার ইত্তিকাল হয়ে যায় তবে হযরত হাসান বসরী র. আমার জানাযা পড়াবেন। হযরত বললেন, আমি তার জানাযা পড়াব না। সে তো কখনও নামাযই পড়েনি। এখন এই মা একদিকে চুপ করে ব্যথিত অন্তরে বসে থাকল। একদিকে ছেলে অসুস্থ আরেক দিকে হযরত অস্বীকার করলেন। তার ব্যথা দিগুণ হয়ে গেল, বেচারি অশ্রুসিক্ত চোখে ঘরে ফিরলেন। ছেলে মাকে কান্নায় জর্জরিত দেখতে পেল। এখন ছেলের মন অনেক নরম হলো সে বলল, আম্মু! আপনি কেন এত কান্না করছেন? মা বললেন, বেটা একদিকে তোমার এই দূর্বস্থা, আরেকদিকে হযরত তোমার কাছে আসতে অস্বীকার করেছেন। তুমি এত খারাপ কেন? তিনি তোমার জানাযা পড়াতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই কথা শুনে ছেলের মনে আঘাত লাগে। সে বলল, আম্মাজান আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তাই তুমি আমার একটি ওসিয়ত শোনো। মা জিজ্ঞেস করল কি ওসিয়ত?

একটি আশ্চর্য ওসিয়ত:

সে বলল, আম্মাজান! আমার ওসিয়ত হচ্ছে যখন আমার আত্মা বের হয়ে যাবে তুমি প্রথমেই তোমার ওড়না দিয়ে আমার গলায় পেঁচিয়ে উঠানে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে। যেমনভাবে মৃত কুকুরের লাশ টেনে হিঁচড়ে নেওয়া হয়। মা জিজ্ঞেস করল বেটা এমনটা কেন করব? সে বলল, আম্মা কারণ দুনিয়াবাসী জানুক, যে নিজের রবের নাফরমান এবং মা বাবার আবাধ্য হয় তার পরিণাম এমন হবে। হে আম্মা! আমাকে কবরস্থানে দাফন কর না। মা বলল, বেটা তোমাকে কবরস্থানে কেন দাফন করব না। সে বলল, আম্মাজান! আমাকে এই উঠানেই দাফন কর। এমন যেন না হয় আমার গোনাহের কারণে কবরবাসী কষ্ট পায়।

যে সময় এই যুবক ভাঙা হৃদয় নিয়ে এই কথাগুলো বলছিল তখন পরওয়ারদেগারের তার এই কথা খুব ভালো লেগেছে। তার রুহ কবজ করা হয়েছে। তার রুহ বের হচ্ছিল এমন মুহূর্তে যা তার চোখ বন্ধ করছিল, বাইরে থেকে দরজায় করাঘাতের আওয়াজ পাওয়া গেল। মহিলা ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন কে? জবাব এলো আমি হাসান বসরী। তিনি বললেন, হযরত আপনি কিভাবে আসলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ফেরত দেয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে আমি আল্লাহকে দেখলাম। পরওয়ারদেগার বললেন, হাসান বসরী তুমি আমার কেমন ওলী? আমার এক ওলীর জানাযা পড়াতে তুমি অস্বীকৃতি জানিয়েছ। আমি বুঝেছি তোমার সন্তানের তাওবা কবুল হয়েছে। তোমার সন্তানের জানাযা পড়ানোর জন্য হাসান বসরী দাঁড়িয়ে আছে।

হে প্রিয় প্রভু! যখন তুমি এত দয়ালু, মৃত্যুর অল্প মুহূর্ত আগে যদি কোনো বান্দা তার জীবনের গোনাহ মার্ফ করে দেন। হে আমার মালিক! আজ আমরা তোমার ঘরে বসে আমরা নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করছি। হে আল্লাহ! আমরা মিথ্যা বলতে পারব না। আমাদের হাকিকত তোমার কাছে পরিষ্কার। আমার মাওলা আমাদের গোনাহ ক্ষমা করুন। আমাদের তো রোদের গরমই সহ্য হয় না। হে আল্লাহ! জাহান্নামের গরম আমরা কিভাবে সহ্য করবো। হে পরওয়ারদেগার! আমাদের তাওবা কবুল করুন। বাকি জীবন ঈমান, ইসলাম এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী বলার তাওফিক দান করুন।^{১৩৪}

আল্লাহ আলেম ও তালিবে ইল্মের জন্য জান্নাতে শহর তৈরি করেন

আমাদের আকাবিরগণ ইলম হাসিল করার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। প্রচুর মেহনত করেছেন এবং নিষ্ঠার সাথে নিজেদের কাজে লেগে ছিলেন। মাদরাসাকে নিজের বাড়ি, কিতাবের কাগজকে নিজেদের কাফন মনে করতেন। তারা তাদের জীবন ব্যয় করতেন পড়া এবং পড়ানোর মধ্যে। এ কারণে হযরত সুফিয়ান সাওরী র. বলতেন: নেক নিয়ত থাকলে তালেবে ইলম থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ হতে পারে না। তারা

এতোটাই বরকতপূর্ণ হয়ে থাকে ফেরেশতাও আল্লাহ তা'য়ালার সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়। এ কারণেই বলা হয়, যখন আল্লাহ তা'য়ালার কোনো সাধারণ মুমিনের প্রতি সন্তুষ্ট হন তার জন্য জান্নাতে একটি শহর নির্মাণ করেন। দুনিয়াতে যেমন নওয়াবদের আলাদা এলাকা থাকে, আল্লাহ তা'য়ালার যখন কোনো আলেমের প্রতি সন্তুষ্ট হন জান্নাতে তার জন্য আলাদা একটি শহর নির্মাণ করেন যা একান্তই তার একটি আলাদা স্টেট হিসাবে থাকবে। এ কারণেই বলা হয়েছে: যে মানুষ ইলম অর্জনে নিয়োজিত থাকবে, জান্নাত তাকে খোঁজ করবে।

আল্লাহর বড় অনুগ্রহ এই যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে ইলম অর্জনের জন্য কবুল করেন। আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, আপনারা আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা। কুরআনই হচ্ছে এর বড় প্রমাণ: আল্লাহ তা'য়ালার বলেন, “অতপর আমি আমার সেইসব বান্দাদের এই কিতাবের উত্তরাধিকার বানিয়েছি যাদের আমি বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছি।

—সূরা ফাতির: আয়াত:৩২।

আমার নির্বাচিত বান্দা প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দাদেরকেই এই কিতাবের ওয়ারিস বানাই। আল্লাহ তা'য়ালার কতইনা দয়ালু তিনি আমাদেরকে এই কিতাবের ইলমের জন্য নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহর এই অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে মনোযোগ দিয়ে এই ইলম হাসিল করা অপরিহার্য।^{১৩৫}

ইমাম মালিকের কন্যাদের ইলমী মর্যাদা

ইমাম শাফেঈ র. বলেন, আমি একবার মিনার বাজারে ছিলাম। তখন ছিল হজের মওসুম। কংকর নিক্ষেপ শেষ করে আমার এক বৃদ্ধ লোকের সাথে সাক্ষাত হল। কিছুক্ষণ তিনি আমাকে দেখলেন এবং বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমার দাওয়াত কবুল কর। আমি তার দাওয়াত কবুল করলাম। তিনি খুবই সাধারণভাবে উপস্থিত যা ছিল আমার মেহমানদারী করেছেন। তিনি সাধারণ একটি রুটির টুকরো আমার দস্তরখানে দিলেন। বললেন, তুমি খাও। আমি খেতে শুরু করলাম। তিনি আমাকে দেখতে থাকলেন এবং বললেন, আমার ভয় হচ্ছে তুমি কুরাইশী।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন? তিনি বললেন, এই কুরাইশিরা দাওয়াত দিতে ও কবুল করতে খুব কৃত্রিম হয়। তারপর তিনি কথা বলতে থাকলেন, আমি বুঝতে পারলাম তিনি মদিনা থেকে এসেছেন। আমি তাকে ইমাম মালিক র. সম্পর্কে জানতে চাইলাম, তিনি আমাকে তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করলেন।

তিনি যখন দেখলেন খুব আগ্রহ নিয়ে আমি তার অবস্থা জানতে চাচ্ছি, যদি আপনি মদিনাতে যেতে চান তবে এই বাদামি রংয়ের ঘোড়া আমার কাছে প্রস্তুত। আমি আপনাকে এই ঘোড়া দিব, আপনি মদিনা যেতে পারবেন। আমি তো প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। তাই আমি একটি কাফেলার সাথে রওয়ানা দিলাম। মক্কা থেকে মদিনায় পৌঁছতে আমাদের ষোল দিন সময় লেগেছে। এই সময়ে আমি ষোল বার কুরআন পড়েছি। আজকে অবস্থা এই যে, হজ করতে এসে দশ দিন মদিনাতে অতিবাহিত হয় একবার ও কুরআন পড়ার তাওফিক হয় না। আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গেরা যখন হজের জন্য আসা যাওয়া করতেন শত শত লোক তাদের হাতে কালিমা পড়ে মুসলমান হত। আজকে তো অবস্থা হচ্ছে নিজেই সঠিক মুসলমান হয়ে হজ থেকে ফিরি না বরং ফিরে এসে গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ি।

মোটকথা ইমাম শাফেঈ র. সফরে ষোল দিনে ষোলবার কুরআন পড়েছেন। তিনি বলেন, আমি যখন মসজিদে নববিতে পৌঁছলাম একজন লম্বা দেহবিশিষ্ট লোক দেখতে পেলাম। তিনি একটি লুঙ্গি পরে এবং চাদর গায়ে জড়িয়ে আছেন। তিনি একটি উঁচু জায়গায় বসে বলতে শুরু করলেন, “ক্বালা রাসূলুল্লাহ” এবং লোকেরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে বসে পড়লো। আমি বুঝতে পারলাম তিনিই হচ্ছেন ইমাম মালিক র.। সে সময়ে ইমাম মালিক র. হাদীসের অনুলিখন করাচ্ছিলেন। মুয়াত্তায়ে মালিকের হাদীস সমূহ লেখাচ্ছিলেন। আমি একটি খড়কুটা তুলে নিলাম এবং মনে মনে ভাবলাম এটা আমার কলম। আর হাত সামনে নিয়ে ভাবলাম এটা আমার কাগজ বা খাতা। আমার মুখকে সেই খড়কুটার সাথে লাগালাম যেন আমি কালি লাগাচ্ছি এবং হাতের তালুতে লিখতে শুরু করলাম। এখন তো ছাত্ররা কাগজে লিখে। আমিও তার নিকট থেকে অনুলিখনের বরকত হাসিল করার জন্য হাতের তালুতে লিখতে শুরু করলাম। সেই মুহূর্তে ইমাম মালিক আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন। তিনি সেই মাহফিলে একশ

সাতাইশটি হাদীস লিখিয়েছেন। পরবর্তী নামাযের সময় হলে তিনি সে মাহফিল মূলতবি করলেন।

ইমাম শাফেঈ র. বলেন, ইমাম মালিক র. আমাকে দেখে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। আমাকে বললেন, তোমাকে অপরিচিত মনে হচ্ছে। আমি বললাম, জি হ্যাঁ, আমি মক্কা মোকাররমা থেকে এসেছি। তিনি বললেন, তুমি হাতের তালুতে কি করছিলে? আমি বললাম, আমি হাদীস লিখছিলাম। তিনি বললেন, আমাকে দেখাও। আমি যা দেখালাম তাতে তো কোন লেখা ছিল না। তিনি বললেন, এখানে তো কোন কিছু লেখা নেই। আমি বললাম, হযরত আমার কাছে কাগজ, কলম কিছুই ছিল না। আপনি যে অনুলিখন করাচ্ছিলেন তার বরকত হাসিল করার জন্য আমি একটি খড়কুটো হাতে নিয়ে হাতের তালুতে লিখছিলাম। এই কথা শুনে ইমাম মালিক র. একটু রাগান্বিত হলেন। কারণ এমনটাতো হাদীসের সাথে বেয়াদবী। আমি বললাম, হযরত আমি তো বাহ্যিক সাদৃশ্যের জন্য হাতের তালুতে লিখছিলাম। প্রকৃত অর্থে আমি তো অন্তরে হাদীস লিখছিলাম। ইমাম মালিক র. বললেন, ঠিক আছে তুমি যদি তোমার অন্তরে লিখে রাখ তবে আমাকে কিছু হাদীস শোনাও। আমি তাঁকে একশ সাতাইশটি হাদীস তার মতন ও সনদসহ শুনিয়েছি। এটাই হচ্ছে ইলম! যে ধারাক্রমে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন সেভাবেই তিনি হাদীস শোনালেন।

ইমাম মালিক র. খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, হে যুবক! তুমি আমার মেহমান হয়ে যাও। অন্ধের কি প্রয়োজন? তার প্রয়োজন দু'টি চোখ। আমি তো আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। তাই বললাম, হযরত আমি প্রস্তুত। আমি ইমাম মালিক র. এর বাড়িতে তাশরিফ নিলাম। ইমাম মালিকের র. বাড়িতে তাঁর মেয়েরা ছিল। তারা ছিলেন খুবই আল্লাহ ওয়ালা। হাদীস, কুরআনে হাফেজা ছিলেন। অনেক বেশি পরহেযাগার, পবিত্র জীবন যাপন করতেন। তারা এতো বেশি ইলমের অধিকারী ছিলেন, ইমাম মালিক র. মসজিদে নববীতে যে হাদীসের দরস দিতেন, তারা পর্দার আড়ালে থেকে সে দরসে উপস্থিত থাকতেন। কোনো ছাত্র যদি হাদীসের ভুল ইবারত পড়তেন সাথে সাথে তারা লাকড়ি দিয়ে আওয়াজ করতেন যেন ইমাম মালিক র. বুঝতে পারেন ছাত্ররা ভুল পড়ছে।

ইমাম মালিক র. ঘরে জানালেন আজকে আমাদের বাড়িতে একজন আলেম আসবেন। সে অনেক বড় জ্ঞানী ও এলেমের প্রতি গভীর অনুরাগী ও আগ্রহী। তারা ঘরে খুব ভালো করে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। বিছানা, নামাযের মুসল্লা, লোটা বদনি সবকিছু গুছিয়ে রেখেছেন। ইমাম শাফেঈ র. খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ইমাম মালিকের র. সাথে মসজিদে আসলেন। ইশরাকের নামায পড়া শেষ হলে ঘরে ফিরে আসলেন। ইমাম মালিক র. শাফেঈ র. কে বলেন, আপনার ব্যাপারে আমার মেয়েদের প্রশ্ন আছে। তিনি বললেন, আমার মেয়েরা বললো, আব্বু! আপনি তো বলেছেন তিনি একজন বড় আলেম, খুব পরহেযগার এবং ভালো লোক। কিন্তু তার ব্যাপারে আমাদের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

(১) প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যতটুকু খাবার পাকিয়েছিলাম তা কয়েক জনের জন্য যথেষ্ট। মাশাআল্লাহ! এই একজন মেহমান পরিপূর্ণভাবে থালা পরিষ্কার করে রেখেছেন। আমাদের ধোয়ার প্রয়োজনও হয়নি। আজ দুনিয়া বলে বাচ্চাদেরকে আলেম বানালে তারা কোথেকে খাবে। আপনি বলুন! আজ পর্যন্ত আপনি কি শুনেছেন কোন আমলকারী আলেম, আমলকারী হাফিয না খেয়ে ক্ষুৎ পিপাসায় পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে মারা গেছে? এরকম একটি উদাহরণ দেখানো সম্ভব হবে না। আমি পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এই প্রশ্ন করেছি কোন একটি উদাহরণ ন্যূনতম দেখাও। কিন্তু আমাদের কাছে জানা আছে এম, বি, বি, এস ডাক্তার এবং পি, এইচ, ডি ডাক্তার এমন ক'জন ছিলেন যারা বৃদ্ধ বয়সে খাবারের অভাবে ক্ষুধায় তড়পাতে তড়পাতে মারা যায়। তাহলে কোন শিক্ষায় রিযিকের নিশ্চয়তা বেশি। আমাদের কাছে এমন উদাহরণও রয়েছে খাবার বেশি খেয়ে মানুষ মারা যায়। ইমাম মুসলিম র. হাদীস তালাশ করছিলেন এবং পাশে খেজুর রাখা ছিল। তিনি হাদীস খোঁজায় এতই নিমগ্ন ছিলেন তিনি খাচ্ছিলেন এবং বেশি খাবারের কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। অতএব বেশি খাবার কারণে মৃত্যুর ঘটনা আছে। কিন্তু ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর উদাহরণ এই দীনি লাইনে নেই। আলহামদুলিল্লাহ রিযিক আল্লাহ তা'য়ালার খুব ভালো ব্যবস্থা করে দেন এবং দুনিয়া এই রিযিক থেকে ভয় করে। মানুষ বলে আলেম বানাতে তবে খাবে কোথেকে? হে আল্লাহর বান্দারা সেখান থেকেই খাবে যেখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের আশ্বিয়াদের খাওয়াতেন।

ইমাম শাফেঈ র. এর ব্যাপারে তাদের একটি প্রশ্ন এই ছিল যে তিনি একাই সব খাবার খেয়ে ফেলেন।

(২) দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে, আমরা জায়নামাজ বিছিয়ে রেখেছি এবং পানি রেখেছি। তবে জায়নামাজ যেভাবে রেখেছি সকালে আমরা তা সেভাবেই পেয়েছি। আর পানিও সেরকম পেয়েছি যেমনটি আমরা রেখেছিলাম। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়েননি। তাছাড়া মসজিদে ওয়ুর ব্যবস্থা নেই, মানুষ ঘর থেকেই ওয়ু করে যায়। তিনি এই অবস্থায়ই আপনার সাথে মসজিদে চলে যান। আমাদের জানা নেই তিনি নামায কিভাবে পড়লেন? এ বিষয়টি আমাদের বোধগম্য নয়।

প্রশ্ন শুনে ইমাম শাফেঈ র. জবাব দিলেন, বিষয়টা হচ্ছে, যখন আমি আপনার বাসায় খাবার খাই, খাবারে এত বেশি নূর ও বরকত ছিল প্রতিটি লোকমা খাবারের সময় আমার অন্তর নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। আমি ভাবলাম হয়ত এতোটা হালাল খাবার জীবনে আর নাও মিলতে পারে, তবে আমি কেন এই হালাল খাবারকে নিজের দেহের অংশ বানিয়ে নিব না। এ কারণেই আমি ওইসব খাবার নিজের দেহের অংশ বানিয়ে নিলাম। আল্লাহ্ আকবার! তিনি বলেন, তারপর আমি গুয়ে গেলাম। কিন্তু সেই খাবারের নূর এতোই বেশি ছিল যে চোখ থেকে ঘুম হারিয়ে গেল। আমি হাদীস নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলাম। আমার একটি হাদীস নজরে আসে, নবী কারিম সা. ওই ছোট বাচ্চা যার পাখি মারা যায় তাকে অনেক আদর করে ডাকে: ইয়া আব্বা উমাইর! মা ফাআলান নুগাইর। এই বাক্যে ক'টি শব্দ ছিল আমি তা নিয়ে ভাবতে থাকি। আজ রাতে আমি সেই শব্দগুলো থেকে ফিকাহর চল্লিশটি মাসাইল বের করি। ইয়া আব্বা উমাইর! এই বাক্যে উপাধী কেমন হওয়া উচিত তা ব্যক্ত হয়েছে। বাচ্চাদের সাথে সম্বোধন কেমন হওয়া উচিত। কারো মন ভালো করার জন্য কিভাবে কথা বলা উচিত। শুধু এই বিষয়গুলো চিন্তা করে আমি ফিকাহর চল্লিশটি মাসআলা বের করি। তাই যেহেতু আমার ওয়ু ছিল এ কারণে আমি ফজরের নামায আদায় করি। আমাদের আকাবিরদের অবস্থা ছিল তারা প্রথমে ইলম হাসিল করতেন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল ওই ইলম অনুযায়ী আমল করা। কিন্তু আমলের সাথে সাথেই কাজ শেষ হয়ে

যায় না আরেকটি পদক্ষেপ রাখা জরুরী। সেটা হচ্ছে সবকিছুর ওপরে ইখলাস সৃষ্টি করা।^{১৩৬}

সব চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্তির নববী পদ্ধতি

হযরত আবু দারদা রা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এই কালিমা সাতবার পড়বে “হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযিম” অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তার ওপরই আমি ভরসা করি, তিনিও মহান আরশের অধিপতি। এই দু’আ সাতবার পড়লে আল্লাহ তা’আলা সব ধরনের পেরেশানী থেকে মুক্ত রাখবেন।^{১৩৭}

কেয়ামতের দিন অভাব থেকে বাঁচার নববী পদ্ধতি

ইবনে আবি হাতেমের হাদীস, রাসূল সা. হযরত বশির গাফফারী রা. কে বলেছেন, তুমি সে দিন কি করবে যেদিন মানুষ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর সামনে তিনশত বছর দণ্ডায়মান হয়ে অপেক্ষা করবে। আসমান থেকে কোনো সংবাদ আসবে না এবং কোনো নির্দেশ ও দেওয়া হবে না। হযরত বশির বললেন, আল্লাহই সাহায্য করবেন। রাসূল সা. বললেন, শোনো! যখন বিছনায় ঘুমোতে যাও, আল্লাহর কাছে কেয়ামতের দিনের কষ্ট এবং হিসাব নিকাশের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করবে। সুনানে আবু দাউদে আছে, রাসূল সা. কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার স্থানের অভাব থেকে আশ্রয় কামনা করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষ নিজেদের মাথা সোজা রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কোনো কথা বলবে না। হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, একশ বছর পর্যন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে। (ইবনে জারির)

আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাতে উল্লেখ হয়েছে, রাসূল সা. যখন রাত জেগে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করতেন দশবার আল্লাহু আকবার পড়তেন। দশবার আলহামদুলিল্লাহ পড়তেন। তারপর আল্লাহুম্মাগফিরলী

^{১৩৬} দাওয়ায়ে দিল : পৃ: ৪৪-৫০।

^{১৩৭} হায়াতুস সাহাবা: খ:৩, পৃ: ৩৪২।

ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী ওয়াফিনী পড়তেন। অর্থ: হে খোদা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমাকে হেদায়াত দান কর। আমাকে রিযিক ও সুস্থতা দান কর। তারপর কেয়ামতের দিন জায়গার অভাবের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।^{১৩৮}

ভাষা ভালো ও মন্দ উভয়টিই রয়েছে

এই বিষয়টি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

মুসনাদে আহমাদে এসেছে, মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য একটি কালিমা বলল। কিন্তু সে জানে না এই কালিমা অনেক বেশি সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার এই কালিমার ওসিলায় কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য নিজের সন্তুষ্টি লিখে দেয়। পক্ষান্তরে সে না জেনে বুঝেই এমন কালিমা উচ্চারণ করে যা শুনে আল্লাহ তা'য়ালার কেয়ামত পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেয়। হযরত আলকামা র. বলেন, এই হাদীস আমাকে অনেক বিষয় থেকে রক্ষা করেছে। আহনাফ ইবনে কায়স র. বলেন, ডান দিকের ফেরেশতারা নেকী লিখে এবং বাম দিকের ফেরেশতারা আমিন বলে। যখন বান্দা কোনো ভুল করে তারা বলে তুমি এখানে থেমে যাও। যদি সে সময়ই তাওবা করে নেয় তবে তা লিখতে দেওয়া হয় না। যদি সে তাওবা না করে তবে তা লিখা হয়।

(ইবনে আবি হাতেম)

ইমাম হাসান বসরী র. এই আয়াত {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ} “নিশ্চয়ই তোমাদের ওপর দায়িত্বশীল রয়েছে” (সূরা ইনফিতার: আয়াত:১০)} তেলাওয়াত করে বলতেন, হে আদম সন্তান! তোমার জন্য সহিফা খুলে দেওয়া হয়েছে। তোমার জন্য দু'জন মহান ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন তোমার ডানদিকে আরেকজন তোমার বা দিকে। ডান দিকের ফেরেশতা তোমার নেকী সংরক্ষণ করে। বা দিকের ফেরেশতা তোমার মন্দকর্ম লিখে রাখবে। এখন তুমি যে আমল করতে চাইবে তাই করতে পারবে। যখন তুমি মৃত্যু বরণ করবে তোমার এই আমলনামা গুটিয়ে নেওয়া হবে এবং তোমার সাথে কবরে রাখা হবে। কেয়ামতের

দিন যখন তুমি কবর থেকে উত্থিত হবে তোমার সামনে এই আমল উপস্থাপন করা হবে।^{১৩৯}

পুরুষ তিন প্রকার

হযরত উমর রা. বলেন, পুরুষ তিন প্রকারের হয়: যথা—

(১) পবিত্র, নরম ও সহজ মেয়াজের, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও উত্তম পরামর্শদাতা। সে কোনো কাজ করতে চাইলে খুব ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয় এবং যে কোনো কাজকে তার যথার্থ মর্যাদা দান করে।

(২) এমন পুরুষ যার কোনো বোধ, জ্ঞান নেই; সে নিজের সিদ্ধান্তে কোনো কাজ করতে পারে না। কিন্তু সে কোনো কাজ চাইলে সঠিক বিবেক সম্পন্ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের কাছে পরামর্শ চায়। সর্বোপরি সে পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে।

(৩) এমন পুরুষ যে পেরেশান ও উদ্ভিগ্ন থাকে; তার ভুল ও সঠিকের কোনো জ্ঞান থাকে না। এ কারণে সে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। কারণ নিজের একার বুদ্ধি অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। আর সে কোনো সঠিক পরামর্শ দাতা মেনে চলে না।^{১৪০}

পেরেশানী ও অভাব দূর করার নব্বী পদ্ধতি

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমরা সবাই ঘরে ছিলাম, রাসূল সা. দরজার দু' চৌকাঠে হাত রেখে বলল, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! যখন তোমরা কাউকে কোনো কঠিন পেরেশানীতে দেখবে এই কালিমা পড়বে “আল্লাহ্ রাক্বুনা ওয়া লা তুশারিকু বিহি শাইআ”।^{১৪১}

অন্তরের কাঠিন্য দূর করার নব্বী চিকিৎসা

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের সা. কাছে নিজের অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করল। রাসূল সা. বললেন, ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনদের খানা খাওয়াও। হযরত আবু দারদা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের সা. দরবারে এসে নিজের অন্তরের

^{১৩৯} তাফসিরে ইবনে কাসীর: খ: ৫, পৃ: ১৬৪।

^{১৪০} হায়াতুস সাহাবা: খ: ৩, পৃ: ৫৬২।

^{১৪১} হায়াতুস সাহাবা: খ: ৩, পৃ: ৪১১।

কঠোরতা সম্পর্কে অভিযোগ করল। রাসূল সা. বললেন, তুমি কি চাও তোমার দিল নরম হোক এবং তোমার অভাব মিটে যাক। তবে তুমি ইয়াতিমকে আদর করবে এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিবে। তাকে নিজের সাথে খাবারে শরিক করবে, তাতে তোমার দিল নরম হয়ে যাবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।

হযরত বশির জুহানী রা. বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিনে রাসূলের সা. সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমি জানতে চাইলাম আমার বাবার অবস্থা কেমন? রাসূল সা. বললেন, তিনি তো শাহাদত বরণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার তাঁকে রহমত করুন। আমি এই সংবাদ শুনে কাঁদতে থাকলাম। রাসূল সা. আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমাকে তাঁর সাথে আরোহণ করালেন। আমাকে বললেন, তুমি কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না যে, আমি তোমার বাবা হব এবং আয়েশা রা. তোমার মা হবে।^{১৪২}

দ্বীনী বোনকে আল্লাহ নিজের কুদরতে বাঁচিয়েছেন

ইবনে আসাকিরে একটি ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। একজন সুন্দরী নারীর সাথে এক আমির মিলিত হতে চাইল। কিন্তু মহিলাটি অস্বীকার করল। এভাবে আরো তিনজন ব্যক্তি তার সাথে মন্দ কাজ করতে চাইল। কিন্তু সে নিজেকে বিরত রাখল। এ কারণে ওইসব আমিরগণ পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হযরত দাউদ আ. এর আদালতে গিয়ে বিচার দিল এই মহিলা নিজের কুকুরের সাথে মন্দ কাজ করে। চারজনের সম্মিলিত বক্তব্যের কারণে তার বিরুদ্ধে রজমের সিদ্ধান্ত হয়।

সেই সন্ধ্যায়ই হযরত সুলাইমান আ. নিজের সমবয়সী ছেলেদের সাথে বসে ছিলেন। তিনি বিচারক হলেন এবং সেই চার ছেলে ওই লোকদের মত তার কাছে মোকাদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা একজন মহিলার বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করে। হযরত সুলাইমান আ. হুকুম দিলেন এই চারজনকে পৃথক করে দাও। তারপর প্রত্যেককে আলাদাভাবে নিজের কাছে ডাকলেন। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ওই কুকুরের রং কি ছিল? সে বলল, ওই কুকুরের রং ছিল কালো। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস

করলো সে বলল, লাল। তৃতীয় ব্যক্তি বলল বাদামী। চতুর্থ ব্যক্তি বলল, সাদা। তিনি সাথে সাথে সিদ্ধান্ত দিলেন মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি মিথ্যা অপবাদ। তাই ওই চারজনকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

হযরত দাউদ আ. এর সামনে এই ঘটনা পেশ করার পর তিনিও সাথে সাথে চারজনকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রত্যেককে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিল। তিনি বুঝতে পারলেন তারা মিথ্যুক। তাই নির্দেশ দিলেন তাদের হত্যা করা হোক।^{১৪৩}

ইবনে মাসউদ রা. ঘর থেকে বিশেষ আওয়াজ শোনা যেত

হযরত উমর রা. যখন মসজিদে আসতেন তিনি শুনতেন কেউ বলছে, হে খোদা! তুমি ডেকেছ আমি সাড়া দিয়েছি। তুমি হুকুম দিয়েছ আমি পালন করেছি। এই ভোরের সময় তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝতে পারলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ঘর থেকে এই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা বলল এই সময়েই হযরত ইয়াকুব আ. নিজের সন্তানকে বলেছিলেন, আমি তোমার জন্য অল্লিকিছুক্ষণের মধ্যেই ইস্তিগফার করব। হাদীসে এসেছে এই রাত হচ্ছে জুমআ'র রাত।^{১৪৪}

এক মদপানকারীর কাছে হযরত উমর রা. এর চিঠি

আপনি মদপানে অভ্যস্ত হলে হযরত উমরের রা. এই চিঠিটি পড়ুন। ইনশাআল্লাহ আপনার এই অভ্যাস খতম হয়ে যাবে। হযরত ইয়াযিদ ইবনে আসম র. বলেন, শামের এক ব্যক্তি খুবই বাহাদুর, শক্তিশালী এবং লড়াইয়ে পারদর্শী ছিল। সে হযরত উমরের রা. দরবারে আসা যাওয়া করত। কয়েক দিন হযরত উমর রা. তাকে দেখতে পেলেন না। তিনি জানতে চাইলেন অমুক ব্যক্তি কোথায়? লোকেরা বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! সে তো মদপান শুরু করেছে। হযরত উমর রা. নিজের লেখককে দিয়ে চিঠি লিখতে হুকুম দিলেন। এই চিঠি উমর বিন খাত্তাবের রা. পক্ষ থেকে অমুকের নামে। তোমার ওপর সালাম। আমি তোমার সামনে সেই আল্লাহর তারিফ করছি

^{১৪৩} তাফসিরে ইবনে কাসীর : খ : ৩, পৃ: ২৮৮।

^{১৪৪} তাফসিরে ইবনে কাসীর : খ: ৩, পৃ: ১৪।

যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনিই একমাত্র গোনাহ ক্ষমা করার মালিক। তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা, পুরস্কার প্রদানকারি ও অনুগ্রহশীল। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। সূর্যে মুমিনের দ্বিতীয় আয়াতের তরজমা।

তারপর হযরত উমর রা. নিজের সাথীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা নিজের এই ভাইয়ের জন্য দু'আ কর, আল্লাহ যেন তাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়। তাকে তাওবা করার তাওফিক দান করেন। যখন তার কাছে হযরত উমরের রা. চিঠি পৌঁছল তিনি বারবার চিঠিটি পড়লেন এবং বললেন, হে গোনাহাসমূহ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী এবং কঠিন শাস্তি দাতা। এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন এবং ক্ষমা করার ওয়াদাও করেছেন।

আবু নাস্ঈমের বর্ণনায় আরেকটা বিষয় এই রয়েছে, তিনি বারবার তা পড়তে থাকলেন তারপর কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি পরিপূর্ণভাবে মদপান ছেড়ে দিলেন। হযরত উমর রা. যখন এই সংবাদ অবগত হলেন তিনি বললেন, যখন তোমাদের কোনো ভাই এমন করবে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা নিবে। তাকে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করবে এবং ক্ষমা লাভের ব্যাপারে আশ্বাস দিবে। আল্লাহর কাছে দু'আ করবে তাকে তিনি তাওবা করার তাওফিক দান করেন এবং তুমি তার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী না হও। তাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করো না।^{১৪৫}

ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করবে

যখন কেউ আল্লাহ না করুক কোনো অপছন্দ এবং ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন তবে কখনও কারো কাছে বলা উচিত নয়। ওই স্বপ্নের মন্দ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করবে। আল্লাহ চাইলে তার মন্দ থেকে নিরাপদ রাখবেন। হযরত আবু সালমা র. বলেন, আমি অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে অধিকাংশ সময় অসুস্থ হয়ে যেতাম। একদিন আমি হযরত আবু কাতাদা রা. কে অভিযোগ করলাম, তিনি আমাকে নবী কারিম সা. এর

হাদীস শোনালেন। ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যদি তোমাদের কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে তবে নিজের একনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া কাউকে বলবে না। আর যদি কোন অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তবে কোনো অবস্থাতেই কাউকে বলবে না, বরং ঘুম থেকে জেগে ‘আউযু বিল্লাহি মিনাশশাইতানীর রাজীম’ পড়ে তিনবার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করবে। তবে স্বপ্নের মন্দ প্রভাব থেকে সে নিরাপদ থাকবে। নবী কারীম সা. সাধারণভাবে ফজরের নামাযের পর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। যারা যে স্বপ্ন দেখত সব বলত। স্বপ্ন শোনার আগে তিনি বলতেন স্বপ্নের ভালো ও কল্যাণ তোমাদের অর্জিত হোক এবং তার অকল্যাণ থেকে তোমরা নিরাপদে থাক। আমাদের পক্ষে তা কল্যাণকর এবং আমাদের শত্রুদের পক্ষে অকল্যাণকর হোক। সকল প্রশংসা ও শোকর আল্লাহর জন্য যিনি গোটা জাহানের প্রভু। কখনও স্বপ্ন দেখে ভয় পেলে বা কোনো পেরেশানী সৃষ্টিকারী স্বপ্ন দেখে পেরেশানিতে আক্রান্ত হলে সেই ভয় ও পেরেশানী দূর করার জন্য এই দু’আ পড়ুন। “আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতী মিন গাযাবিহী ওয়া ইকাবিহী ওয়া শাররি ইবাদিহী ওয়া মিন হামাযাতীশ শাইতানী ওয়া আইয়াহ যুরুন।” হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আলআস রা. বলেন, যখন কেউ স্বপ্ন দেখে ভয় পায় বা পেরেশান হয়ে যায়। নবী কারিম সা. তার ভয় ও পেরেশানী দূর করার জন্য এই দু’আ শিখিয়েছেন।^{১৪৬}

কা’বার গিলাফের পর্দা কখন থেকে ব্যবহার শুরু হলো

মুহতারাম জনাব হযরত মাও. ইউনুস পালনপুরী।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহ!

প্রশ্ন: সালাম বাদ আরজ এই যে, কিছু দিন ধরে আমার মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কা’বার গিলাফের পর্দা কখন থেকে ব্যবহার করা শুরু হয়। এর কারণ কি ছিল। মেহেরবানী করে আমাকে সন্তোষজনক জবাব দিবেন। আপনার একজন দীনি বোন, মোম্বাই থেকে।

উত্তর: এক বাদশাকে হিংসুকরা পরামর্শ দেয় এই বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করে দিন। পশ্চিমধ্যে ইহুদি আলেমরা তাদেরকে পরামর্শ দিল তোমরা নিজেদের ও আত্মীয়দের মঙ্গল চাইলে কখনও এরকম কাজ করো না, বরং এখানে যে কাজ করা হয় তোমরা সে কাজ কর। ইহরাম, সাঈ, তাওয়াফ, হলক, কোরবানী, নামায, যিকির ইত্যাদি কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত কর। বাদশা তাদের এই পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি হিংসুকদেরকে হত্যা করলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন এই ঘরের ওপর পর্দা দেয়া হয়েছে। তিনি পর্দা দিলেন। দ্বিতীয় বার তিনি স্বপ্নে দেখলেন, আরো ভালো পর্দা দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তিনি সেই নির্দেশ পূরণ করেন। সে সময় থেকেই বাইতুল্লাহর ওপর পর্দার রেওয়াজ শুরু হয়। যে বাইতুল্লাহর সম্মানকে টিকিয়ে রেখেছে। আল্লাহ তা'য়ালা তার বংশধরকে অব্যাহত রেখেছেন। আর যে বাইতুল্লাহর সম্মানকে মিটিয়েছে তার পরিণাম আবরাহার সৈন্যের মত হবে।^{১৪৭}

পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম হাযরামী পদ্ধতি

ইমাম আবু বকর বিন ওলিদ র. দু'আ অধ্যায়ে মুতাররাফ বিন আব্দুল্লাহ র. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি খলিফা মনসুরের কাছে গেলাম। সে সময় তিনি কঠিন পেরেশানীতে ছিলেন। তিনি নিজের কিছু বন্ধু হারানোর বেদনায় চুপচাপ বসে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে মুতাররাফ! আমার ওপর এমন চিন্তা ভর করেছে আল্লাহ ছাড়া— যিনি আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন— আর কেউ দূর করতে পারবে না। এমন কোনো দু'আ কি আছে যার বরকতে আল্লাহ তা'য়ালা আমার পেরেশানী দূর করে দিবেন? আমি জবাব দিলাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ছাবিত র. বলেছেন, বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তির কানে মশা ঢুকে যায় এবং তার মগজে প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি এ কারণে কঠিন যন্ত্রণা কাতর ছিলেন। দিনে রাতে তিনি ঘুমাতে পারতেন না। তাকে হাসান বসরী র. এর সাথীদের একজন তাকে বললেন, হুযুর সা. এর সাহাবী হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা. এর এই দু'আ পড়। তিনি সমুদ্রে এই দু'আ পড়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সাহায্য করেছেন। অসুস্থ

ব্যক্তিটি বলল, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, সে দু'আটি কী? তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, হযরত আলা ইবনে হাযরামি রাযী কে একটি দলের সাথে বাহরাইনের দিকে পাঠানো হয়। আমিও সে দলের সদস্য ছিলাম। আমরা একটি জনমানব শূন্য মরুভূমির মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। কঠিন পিপাসা আমাদেরকে এতোটাই যন্ত্রণা কাতর করে রাখে যে আমরা মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। তখন হযরত আলা রা. সাওয়ারী থেকে নামলেন এবং দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর বললেন, “ইয়া হালিমু, ইয়া আলিমু, ইয়া আলীয্যু, ইয়া আযিমু আসকিনা” সাথে সাথে পাখির পালকের মত এক মেঘের আবির্ভাব হলো এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হলো। আমরা আমাদের সব খালিপাত্র ভরে ফেললাম এবং ঘোড়াগুলোকে খুব ভালো করে পানি পান করালাম।

পুনরায় আমরা রওয়ানা করলাম এবং এবার আমরা একটি উপকূলীয় সমুদ্রের কাছে পৌঁছলাম। সে সমুদ্র এতোই গভীর ছিল তার আগে বা পরে কেউ সে সমুদ্র ভ্রমণ করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস হলো না। আমরা সেখানে আকর্ষণের কিছুই পেলাম না। হযরত আলা দু' রাকাত নামায পড়লেন এবং এই দু'আ পড়লেন, “ইয়া হালিমু, ইয়া আলিমু, ইয়া আযিমু আসকিনা”। তারপর তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরলেন এবং বললেন আল্লাহর নামে পার কর। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমরা পানির ওপর চলছিলাম। খোদার কসম আমাদের কারো পা বা ঘোড়াগুলোর পা পানিতে ভিজে নাই। আমাদের এই বাহিনীতে লোক সংখ্যা ছিল চারহাজার।

এই ঘটনা শুনে সেই অসুস্থ ব্যক্তি ওই পবিত্র নামের মাধ্যমে দু'আ করেছে। আল্লাহর কসম আমরা তখনও সেখানে ছিলাম, মশা তার কান থেকে বের হয়ে গেছে। সে ভনভন করে আওয়াজ করছিল এবং দেয়ালের সাথে আঘাত খাচ্ছিল এভাবে এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। এই বক্তব্য শুনে খলিফা মনসুর কিবলামুখি হলেন এবং কিছুক্ষণ এই নামসমূহের মাধ্যমে দু'আ করলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুতাররাফ! আল্লাহ তা'য়ালার আমার পেরেশানী দূর করে দিয়েছেন। তারপর খলিফা খাবারের নির্দেশ দিলেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে খাবার খেলেন।^{১৪৮}

হযরত আনাস রা. বর্ণনার শেষে এ কথাও রয়েছে, ফেরার পথে হযরত আলা মৃত্যু বরণ করেন। আমরা তাকে গোসল ও কাফনের পর কবর খুঁড়ে দাফন করি। দাফনের পর এক স্থানীয় ব্যক্তি আসে। সে জিজ্ঞেস করে এই দাফনকৃত ব্যক্তি কে? আমরা বলি তিনি একজন উত্তম মানুষ আলা ইবনে হায়রামী রা.। সে লোক বলে এই যমিন মানুষকে বাইরে নিক্ষেপ করে দেয়, তুমি যদি তাকে দু মাইলের দূরত্বে নিয়ে যাও তবে সেখানের যমিন পুরুষদের লাশ কবুল করে। আমরা বললাম, আমাদের সাথে হযরত আলার কি ক্রটি আমরা তাকে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের শিকার বানিয়ে ফেলে যাব। তাই আমরা কবর খননে একমত হলাম। আমরা যখন কবর খনন করি হযরত আলা রা. কে কবরে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কবর নূরের আলোকে চমকাচ্ছিল, তাই আমরা কবরে আবার মাটি দিয়ে ফিরে চলি। (ইবনে কাসির)

আল্লাহ তা'য়ালার কিছু নেয়ামতের আলোচনা

আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে। তবে তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি নেয়ামতের আলোচনা হচ্ছে। তিনি প্রয়োজন মারফিক আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বেশিও করেন না যার ফলে যমিন নষ্ট হয়ে যাবে, শস্যক্ষেত নষ্ট হয়ে যাবে। আবার কম বর্ষণ করেন না যেন ফল তরকারি ইত্যাদি জন্ম না নেয়। বরং এমন পরিমাণে তিনি বর্ষণ করেন যেন শস্যক্ষেত সবুজ ও সতেজ থাকে। পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্র প্রবাহিত হয়। না পান করতে সমস্যা হয়, না পান করাতে। এমনকি যেখানে বেশি বর্ষণের প্রয়োজন হয় সেখানে বেশি বর্ষণ এবং যেখানে কম বর্ষণের প্রয়োজন হয় সেখানে কম বর্ষণ হয়। আর যে স্থানের যমিন ফসলের উপযুক্ত নয় সেখানে পানি বর্ষণই হয় না। কিন্তু সেই স্থানগুলোতে আল্লাহ তা'য়ালার কুদরতী পানি দ্বারা নদী-নালা মাধ্যমে সেখানে পানি প্রবাহিত করে যমিনকে বর্ষণসিদ্ধ করে দেন।

তিনি বলেন আমরা পানিকে প্রবাহিত করতে ও থেমে রাখতে সক্ষম। আমি চাইলে পাথুরে যমিন, পাহাড় ও জঙ্গলে বর্ষণ করতে পারি। আবার চাইলে পানিকে লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি যা পান করার উপযুক্ত থাকবে না। যা ক্ষেত, শস্য ও বাগান করার উপযুক্ত থাকবে না। আবার চাইলে

যমিনে সে শক্তিই ধ্বংস করতে পারি যা পানিকে সংরক্ষণ করে। বরং পানি শুধু ওপরে ওপরে প্রবাহিত হবে। এটাও আমাদের ক্ষমতার অধীন যে, এমন দূর দূরান্তে বিভিন্ন ঝিলে পানি পৌঁছিয়ে দিব যা তোমাদের কোন উপকারেই আসবে না। এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত ও মেহেরবানী, তিনি মেঘ থেকে মিষ্টি, উন্নত ও সুস্বাদু পানি বর্ষণ করেন। তারপর তা যমিনে প্রবাহিত করেন এবং বিভিন্ন দিকে তা ছড়িয়ে দেন। শস্য আলাদাভাবে পাকে, বাগান আলাদাভাবে তৈরি হয়। নিজেরা পানি পান করি এবং জন্তুগুলোকে পান করাই। পানির মাধ্যমে আমরা গোসল করি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হই। আলহামদুলিল্লাহ আসমানের বর্ষণের মাধ্যমেই রাব্বুল আলামিন তোমাদের খাদ্যশস্য উদগম করেন, তরতাজা সবজি ক্ষেত, সবুজ ও দৃষ্টিনন্দন বাগান সৃষ্টি করেন। খেজুর, আঙ্গুর আরবদের পছন্দনীয় ফল এমনভাবে সব দেশের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা জাতের ফল সৃষ্টি করেন। এ সবের শোকর আদায় করা কারো সাধের মধ্যে নেই। তিনি তোমাদেরকে অনেক ফল দিয়েছেন যার সৌন্দর্য তোমরা উপভোগ করো এবং স্বাদ গ্রহণ করো।

তিনি তোমাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা অনেক ধরনের ফায়েদা অর্জন কর। তাদের থেকে দুধ পান কর, তাদের গোশত খাও, তাদের পশম থেকে পোশাক তৈরি কর। তাদের পিঠে নিজেরা আরোহন করো এবং নিজেদের আসবাব পত্র বহন কর। তারপর মালামাল নিয়ে তারা তোমাদেরকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। যদি তা না হতো তবে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছতে জান বের হয়ে যেত। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের প্রতি মেহেরবান ও রহমত বর্ষনকারী। তারা কি দেখে না আমি তাদেরকে এই চতুষ্পদ জন্তুর মালিক বানিয়েছি। যেন তারা তাদের গোশত খেতে পারে। তাদের ওপর আরোহণ করতে পারে এবং বিভিন্ন উপকার লাভ করতে পারে। এত নেয়ামতের পরও কি তাদের ওপর আমার শোকর আদায় করা ওয়াজিব নয়? এই চতুষ্পদ জানোয়ারকে তিনি শুকনো যমিনের বাহন বানিয়েছেন এবং পানির জন্য আলাদা বাহন বানিয়েছেন।

হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কদর কর বা না কর আমি তোমাদের জন্য আসমান, যমিন সৃষ্টি করেছি। সূর্যকে তোমাদের বাবুর্চি বানিয়েছি, চাঁদকে তোমাদের জন্য মিষ্টি বানিয়েছি। চাঁদের আলোতে ফলে মিষ্টি সৃষ্টি

হয়। আমি যমিনকে হুকুম করেছি আমার বান্দাদের জন্য সে যেন তার পানি ও ভাণ্ডার খুলে দিবে। বাতাসকে হুকুম করেছি তুমি ঠাণ্ডা, গরম হয়ে চলো, একটু ধীরে আবার কখনও তীব্রভাবে চলো। গাছকে হুকুম করেছি ফল দাও। পাখিদেরকে হুকুম করেছি তাদের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র যেন তারা জোগাড় করে। গাভী, মহিষকে হুকুম করেছি তোমরা মানুষকে দুধ সরবরাহ কর। ঘোড়া, গাধাকে হুকুম করেছি তোমরা তাদের মালামাল বহন করো। তোমরা গাভীকে সবুজ ঘাস দাও, অথচ তার রক্ত হয় লাল, গোবর হয় পিলা রংয়ের, গোবর ও খুন নাপাক, লালা ও পিলা রংয়ের অপবিত্রতার মধ্যে সাদা শুভ্র পবিত্র দুধের কারখানা তিনি সৃষ্টি করেছেন। গোটা জাহান আমাদের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আমাকে দুনিয়াতে মেনে চলো, দুনিয়াতে গিয়ে আমাকে ভুলে যেয়ো না।

পর্দার হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ.

“হে নবী আপনি আপনার বিবি, কন্যা ও মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের ওপর চাদর জড়িয়ে নেয়।” —সূরা আহযাব: আয়াত :৫৯।

জালাবিব শব্দটি হচ্ছে জিলবাব শব্দের বহুবচন। এমন বড় চাদরকে জিলবাব বলা হয় যা গোট শরীর ঢেকে ফেলে। নিজের গায়ে চাদর জড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন বড় চাদর দিয়ে ঢাকা যা চেহারার অধিকাংশ অংশকে ঢেকে ফেলে। আবার দৃষ্টি নিচু করে চললে সে দেখতেও পায়। পাক ভারত উপমহাদেশ বা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে যেমন বিভিন্ন বোরকা দেখতে পাওয়া যায়, রাসূল ও সাহাবাদের যুগে তা এত ব্যাপক ছিল না। মহিলারা নিতান্ত সাধারণ পোশাক পরিধান করত। পোশাকের চাকচিক্য, বৈচিত্র্য এবং বেশি সাজসজ্জার আশ্রয় তাদের মধ্যে ছিল না। ফলে এক বড় চাদর দিয়ে পর্দা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে এই সাদাসিধে পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকেনি। বরং কৃত্রিম সৌন্দর্য চর্চা, অলংকার ও সাজসজ্জা গ্রহণ করা সাধারণ ও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

ফলে নিছক চাদর দিয়ে পর্দা করা দূরুহ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ডিজাইন ও ফ্যাশনের বোরকা প্রচলিত হতে থাকে। যদিও নির্দিষ্ট সময়ে বোরকার গরম অনুভূত হয় কিন্তু এই সামান্য কষ্ট শরিয়তের বিধান পালনে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা সত্ত্বেও যে মহিলা বোরকার পরিবর্তে বড় চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে সেও পর্দার হুকুম পালন করল। কারণ বোরকার কোনো নির্দিষ্ট ধরণ শরিয়তের পর্দা বিধান মানার জন্য জরুরী নয়। কিন্তু আজকাল মহিলারা চাদর ব্যবহারকে পর্দাহীনতার মাধ্যম বানিয়ে ফেলেছে। প্রথমে তারা বোরকার স্থানে চাদর ব্যবহার শুরু করেছে। তারপর চাদর ব্যবহারও কমতে থাকে। এভাবে শুধু দোপাট্টা ব্যবহার করতে থাকে। কিছু মহিলারা তো এটা ব্যবহার করতেও অস্বস্তি বোধ করে। এইসব পরিস্থিতির বিবেচনায় এ কথা বলতে হয় এখন বোরকার ব্যবহারই হচ্ছে যথার্থ এবং জরুরী। কারণ বোরকা না পরে এখন মহিলারা পর্দাহীনতার সয়লাবে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে এমনকি কিছু মহিলা তো অর্ধনগ্ন থাকতেই বেশি পছন্দ করে। উল্লিখিত আয়াতে নবী করীম সা. এর বিবি, কন্যা ও সাধারণ মুমিন নারীদেরকে বাইরে বের হওয়ার সময় পর্দা করার হুকুম করা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত পর্দার হুকুম আলেমদের কর্তৃক নতুন আবিষ্কৃত নয়, বরং তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত। অতএব পর্দা থেকে বিমুখতা বা তা অস্বীকার করার মনোবৃত্তি কুফর ও ফাসেক এর শামিল হবে।^{১৪৯}

বিশেষ কারো নাম নিয়ে সালাম করা কেয়ামতের আলামত

কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে পুরো মজলিসকে সালাম দিতে হবে। বিশেষভাবে কাউকে সালাম দেওয়া উচিত নয়। একদিন হযরত আব্দুল্লাহ রা. মসজিদে ছিলেন, এমন সময় এক প্রশ্নকারী এলো এবং তার নাম নিয়ে সালাম দিল। হযরত বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার সত্য বলেছেন, রাসূল সা. তাবলিগের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর তিনি ঘরে চলে গেলেন। লোকেরা অপেক্ষা করতে থাকল, তার এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য কী? যখন তিনি ঘর থেকে ফিরলেন, হযরত তারিক রা. জিজ্ঞেস করলেন হযরত!

আমরা আপনার বক্তব্যের কোনো উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, রাসূল সা. বলেছেন, কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে মানুষ মজলিসে বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে সালাম দিবে।^{১৫০}

বনি উমাইয়ায় রূপার বোতল পেল

বনি উমাইয়ার কোনো স্থানে একটি রূপার বোতল পাওয়া যায় যার ওপর সোনার তালা ছিল। তাতে লেখা ছিল “প্রত্যেক পীড়ার সমাধান এই বোতলে আছে”। ইমাম শাফেঈ র. থেকে বর্ণিত, বনি উমাইয়ার কোন বিশেষ স্থানে রূপার একটি বোতল পাওয়া যায় যাতে স্বর্ণের তালা ছিল। তাতে লেখা ছিল “প্রত্যেক রোগের ওষুধ তাতে আছে”। তাতে এই দু’আ লেখা ছিল:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
أَسْكُنْ أَيُّهَا الْوَجْعُ سَكَتَكَ بِالَّذِي يُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ
بِأَنَاسٍ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَسْكُنْ أَيُّهَا الْوَجْعُ سَكَتَكَ بِالَّذِي يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ
تَزُولَا وَلَكِنَّ زَالَتَانِ أَمْسَكُوهمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا"

ইমাম শাফেঈ র. বলেন, এই দু’আর পর আমি কখনও চিকিৎসকের কাছে যাইনি। এই দু’আ মাথা ব্যথার জন্য উপকারী ও পরিক্ষীত।^{১৫১}

মা বাবা সন্তানের সাথে তিন ধরনের ব্যবহার করবে

একবার হযরত মুয়াবিয়া রা. আহনাফ বিন কায়েস রা. এর কাছে প্রশ্ন করলেন সন্তানদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত? আহনাফ বিন কায়েস রা. বললেন, আমিরুল মুমিনীন! সন্তান হচ্ছে আমাদের অন্তরের ফল, কোমরের শক্তি, আমাদের অবস্থান তাদের জন্য যম্বিনের মত নরম ও উপকারী। আমাদের উপস্থিতি তাদের জন্য আসমানের মেঘমালার ছায়ার মত। আমরা তাদের মাধ্যমেই বড় বড় কাজ সম্পাদনের হিম্মত রাখি।

^{১৫০} আদাবুল মুফরাদ, আদাবে যিন্দেগী: পৃ: ২১৯।

^{১৫১} হায়াতুল হাইওয়ান :খ ১, পৃ: ৪০।

(১) তারা আপনার কাছে কিছু চাইলে তাদেরকে খুশি মনে সবকিছু দিয়ে দিই। (২) যদি কোনো কারণে তাদের মনে কষ্ট থাকে তবে সে কষ্ট দূর করার ব্যবস্থা করবেন। তবে তারা আপনাকে মুহাব্বত করবে, আপনার পিতৃসুলভ আচরণকে সে সহজভাবে গ্রহণ করবে। (৩) কখনও তাদের জন্য অসহনীয় বোঝা হবেন না, এমন হলে তারা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হবে। তারা আপনার মৃত্যু কামনা করবে, আপনার কাছে আসতে ঘৃণা করবে।

হযরত মুয়াবিয়া রা. এই হিকমতপূর্ণ কথা শুনে বেশ প্রভাবিত হলেন। তিনি বললেন, আহনাফ! আল্লাহর কসম যে সময় আপনি আমার কাছে এসেছেন আমি ইয়াযীদের ব্যাপারে খুব গোস্বায় ছিলাম।” তারপর হযরত আহনাফ যখন তাঁর কাছে গেলেন হযরত মুয়াবিয়ার রা. গোস্বা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং ইয়াযীদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং দু’শত দেরহাম ও দু’শত কাপড় পাঠালেন। ইয়াযীদের কাছে যখন এই হাদিয়া পৌঁছল তিনি দু’ ভাগে ভাগ করলেন। একশত দেরহাম এবং একশত কাপড় হযরত আহনাফ বিন কায়েস রা. এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।^{১৫২}

সুলতান মালিক শাহের ইনসাফের অনন্য উপমা

সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান মালিক শাহ নামে একজন বাদশা ছিলেন। একদিন ইস্পাহানের জঙ্গলে শিকারের জন্য বের হলেন। এক গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এদিকে শাহী লোকদের ক্ষুধা লাগে। এক গরিব বৃদ্ধার একটি গাভী ছিল। এই গাভী থেকে সে তার তিন সন্তানকে লালন পালন করত। বাদশার লোকেরা এই গাভী যবাই করে তা কাবাব বানিয়ে খুব তৃপ্তি সহকারে খেলে। বৃদ্ধা অনেক কান্নাকাটি করল কিন্তু তারা শুনল না। বৃদ্ধা মনে মনে ভাবল বাদশার কাছে কেন অভিযোগ করব না। একদিন সংবাদ পেল বাদশা নদীর কাছ দিয়ে যাবে, বৃদ্ধা সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। বাদশার সাওয়ারী সেখানে পৌঁছলে তিনি সামনে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। তিনি বললেন, বাদশা সালামত! আমার ইনসাফ কি নদীর পুলে করবেন না পুল সিরাতে করবেন? বাদশার সঙ্গী সাথীরা বৃদ্ধার সাহস দেখে বিস্মিত হল। তাকে সামনে থেকে সরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু

বাদশা ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল, পুলসিরাত এর ওপর ইনসাফ করার ক্ষমতা আমার নেই, এখানেই ইনসাফ করব।

বৃদ্ধা পুরো ঘটনা আদ্যোপান্ত শোনাল। বাদশা শুনে খুব মর্মান্তিক হলেন। যারা এই অপরাধ করল তাদেরকে শাস্তি দিলেন। বৃদ্ধাকে এক গাভীর পরিবর্তে সত্তরটি গাভী দিলেন। বৃদ্ধা খুব খুশি হলেন এবং বললেন,

“হে বাদশা! তুমি আমার সাথে যেমন ইনসাফ করেছ আল্লাহ তা’য়ালার তোমাকে তার উত্তম প্রতিদান দিক।” ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী বাদশা আল্লাহর রহমতে থাকে।^{১৫৩}

কসম খেলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়

হযরত আবু মুতাররাফ র. বলেন, একদিন আমি মসজিদ থেকে বের হলাম। একজন ব্যক্তি আমাকে পেছন থেকে আওয়াজ দিলেন, তুমি নিজের লুঙ্গি ওপরে তোলো। কারণ লুঙ্গি ওপরে পরলে বুঝা যাবে তুমি নিজের রবকে অনেক বেশি ভয় পাও এবং তোমার লুঙ্গি বেশি পরিচ্ছন্ন থাকবে। তোমার মাথার চুল পরিষ্কার রাখ যদি তুমি মুসলমান হও। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, হযরত আলী রা. ছিলেন এবং তার হাতে লাঠি ছিল। তারপর হযরত আলী রা. চলতে চলতে উটের বাজারে চলে গেলেন। তিনি বললেন, “বেচাকেনা কর তবে কসম খেয়ো না, কারণ কসম খেলে মাল তো বিক্রি হয়ে যাবে কিন্তু বরকত খতম হয়ে যাবে।”

তারপর এক খেজুর বিক্রেতার কাছে আসলেন। এসে দেখলেন এক খাদেমা কাঁদছে। হযরত আলী রা. জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে? ওই খাদেমা বলল, সে আমাকে এক দেহহামের খেজুর দিয়েছে। কিন্তু আমার মনিব তা নিতে অস্বীকার করেছে। হযরত আলী রা. খেজুর বিক্রেতাকে বললেন, তুমি তার থেকে খেজুর ফিরিয়ে নাও এবং দেহহাম ফেরত দিয়ে দাও। কারণ সে তো নিরুপায়। সে তার মালিকের মজি ছাড়া কিছুই করতে পারে না। কিন্তু খেজুর বিক্রেতা নিতে অস্বীকার করল। আবু মুতাররাফ রা. বললেন, তুমি কি জান তিনি কে? ওই ব্যক্তি বলল, না আমি জানি না। আমি বললাম, তিনি হযরত আলী রা.। সে সাথে সাথে খেজুর নিয়ে নিজের

খেজুরের সাথে ঢেলে দিল এবং দেহহাম ফিরিয়ে দিল। সে বলল আমিরুল মুমিনীন আমি চাই আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। তুমি মানুষকে পুরোপুরি দিলে আমি সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট থাকব। তারপর খেজুর বিক্রেতাদের নিকট দিয়ে যেতে যেতে বললেন, মিসকিনদেরকে খাওয়াবে তাতে তোমাদের উপার্জনে বরকত হবে। তারপর মাছ বিক্রেতাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, আমাদের বাজারে সেই মাছ বিক্রি করা যাবে না যে মাছ পানিতে মরে ওপরে ভাসতে থাকে। তারপর তিনি কাপড়ের বাজারে পৌঁছলেন। এটা ছিল খদ্দেরের বাজার। তিনি এক দোকানীকে বললেন, হে বড়ো মিয়া আমাকে তিন দেহহামের একটি কাপড় দাও। ওই দোকানদার হযরত আলী রা. কে চিনতে পেরেছেন। তাই তার থেকে কাপড় কিনলেন না। তারপর আরেক দোকানদারের কাছে গেলেন। যখন সেই দোকানদান চিনে ফেলল তার থেকেও কিনলেন না। তারপর এক যুবকের কাছ থেকে তিন দেহহামের বিনিময়ে একটি কাপড় কিনলেন। সেই যুবক আলী রা.কে চিনতে পারেনি। আলী রা. কাপড় পরিধান করলেন। তারপর দোকানের মালিক আসলে লোকেরা তাকে বলল তোমার ছেলে আমিরুল মুমিনীন এর কাছে তিন দেহহামের বিনিময়ে জামা বিক্রি করেছে। তিনি ছেলেকে বললেন, তুমি দু' দেহহামে কেন বিক্রি করনি। সুতরাং দোকানদার এক দেহহাম নিয়ে হযরত আলী রা.এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন এই দেহহাম ফেরত নিন। হযরত আলী রা. বললেন ব্যাপার কী? সে বলল, এই জামার দাম দু' দেহহাম। আমার ছেলে আপনার নিকট থেকে তিন দেহহাম নিয়েছে। হযরত আলী রা. বললেন, সে নিজের সন্তুষ্টিতে বিক্রি করেছে এবং আমিও সন্তুষ্টিতে কিনেছি।^{১৫৪}

যার ঈমান রয়েছে তার থেকে বড় কোনো সম্পদশালী নেই

একজন বুয়ুর্গ যাচ্ছিলেন। বুয়ুর্গদের অবস্থা এমনই হয় পোশাকের কোন চাকচিক্য থাকে না। পোশাকের ব্যাপারে তাদের কোনো বিশেষ পছন্দ অপছন্দ থাকে না। যখন যেমন পোশাক মিলে তাই পরিধান করে থাকেন। কখনও হয়ত শাহী পোশাক, কখনও ছিন্ন, পুরনো পোশাক

পরিধান করেন। সেই বুয়ুর্গ ব্যক্তি পুরনো কাপড় পরিধান করে চলছিলেন। এমন একটি শহরে আসলেন যার সদর ফটক বন্ধ ছিল। এখন হাজার হাজার গাড়ি শহরে প্রবেশের জন্য বাইরে অপেক্ষমান ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ ছিল। তিনি লোকদের কাছে জানতে চাইলেন এই সদর দরজা কেন বন্ধ? লোকেরা তাকে বলল, এই শহরের বাদশার একটি বাজপাখি হারিয়ে গেছে। বাজপাখি যা বিভিন্ন পাখি শিকার করে তা হারিয়ে গেছে। তাই বাদশা ফরমান করলেন, যেহেতু বাজপাখি হারিয়ে গেছে শহরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং যে কোন স্থান থেকে তাকে পাকড়াও কর।

তিনি বললেন, সে কেমন আহম্মক বাদশা। ভাই! দরজা বন্ধ করলে তাতে পাখির কি সমস্যা। সে তো উড়ে বাইরে চলে যাবে। তার তো দরজার কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ কি এমন আহম্মক হয়? যদি পাখি ধরতেই হয় তবে শহরে জাল বিছিয়ে দিত যেন সে ওপর দিয়ে বের হতে না পারে। দরজা বন্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল। এই বুয়ুর্গ বললেন, হে আল্লাহ! তোমার কুদরতের আশ্চর্য প্রকাশ তুমি এমন আহম্মককে বাদশা বানিয়েছ। যে এই পার্থক্য করতে পারে না বাজপাখি আটক করার জন্য জাল বিছানো প্রয়োজন নাকি শহরের দরজা বন্ধ করা প্রয়োজন। আর আমার মত একজন আলেমকে তুমি ভিথিরি বানিয়ে রেখেছ, যে জুতার তলা ক্ষয় করে চলছি। কেউ জিজ্ঞেস করে না। তোমার কুদরতের কারিশমা এবং নেয়াম হচ্ছে এমন আহম্মককে তুমি সাম্রাজ্য দান করেছ এবং আমাকে জুতার তলা ক্ষয় করতে ব্যস্ত রেখেছ। এই বুয়ুর্গের অন্তরে এই ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ইলহাম হল যে, তুমি কি এ জন্য প্রস্তুত রয়েছ যে, তোমার ঈমানের সম্পদ ওই বাদশাকে দিবে এবং তার সাম্রাজ্য তোমাকে দিব। সেই বুয়ুর্গ কেঁপে উঠলেন। তিনি আরজ করলেন হে আল্লাহ! আমি ঈমান দিতে রাজি নই। আমি তাকে এত বড় সম্পদ দিলাম তারপরও সে নিজেকে ভিথিরি মনে করছে। এই বাহ্যিক সম্পদ যার কাছে থাকবে তা কালকেই শেষ হয়ে যাবে। আর যার কাছে ঈমানের সম্পদ থাকবে তা কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতএব আমি তোমাকে চিরস্থায়ী সম্পদ এবং তাকে ক্ষণস্থায়ী সম্পদ দিয়েছি। তুমি তার কদর করলে না। তারপর সে বুয়ুর্গ তাওবা করলেন হে আল্লাহ! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করে দিন। বাস্তবিকই তুমি আমাকে

সম্পদশালী বানিয়েছ। যার কাছে ঈমানের সম্পদ রয়েছে তার চেয়ে বড় সম্পদশালী আর কে হতে পারে? মুসলমান যদি সম্পদের মালিক হয় তবে তাকে শোকর আদায় করা উচিত। আল্লাহ তা'রালা তাকে ঈমানের সম্পদ এং দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন।^{১৫৫}

পরীক্ষা তো প্রেমিকের হয়, মুনাফিকের নয়

হাফিয ইবনে আসাকির র. হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা সাহমী রা.এর জীবনিত্তে এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি রোমের কাফেরদের হাতে বন্দি হন এবং তাকে বাদশার কাছে পাঠিয়ে দেয়। বাদশা তাকে বললেন, তুমি খৃস্টান হয়ে যাও আমি তোমাকে আমাদের রাজপরিবারে শামিল করব এবং শাহজাদীর সাথে তোমাকে বিবাহ দিব। সাহাবী রা. তাকে জবাব দিলেন এটা তো সামান্য! যদি তুমি তোমার গোটা রাজত্ব আমাকে দিয়ে দাও এবং গোটা আরবের রাজত্ব আমাকে দেওয়া হয় আর আমার কাছে প্রত্যাশা করা হয় এক পলক পরিমাণ সমান সময়ও দ্বীনে মুহাম্মাদী থেকে ফিরে যাব তবে সেটাও অসম্ভব। বাদশা বলল তবে আমি তোমাকে হত্যা করব। হযরত আব্দুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আপনি আমাকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

কথা অনুযায়ী তাকে গুলিতে চড়ানোর হুকুম দেওয়া হলো। বাদশার হুকুমে তীর নিক্ষেপকারীরা তার হাত, পা, শরীর লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে শুরু করল। তাকে বারবার বলা হলো তুমি এখনও খৃস্টান হয়ে যাও। কিন্তু তিনি পূর্ণ অবিচল ও ধৈর্যের সাথে বললেন, আমি কখনও খৃস্টান হবো না। অবশেষে বাদশা তাকে গুলি থেকে নামালেন। তারপর হুকুম দিলেন পিতলের বড় ডেগটি উত্তপ্ত করে আনো। সুতরাং তা আনা হলো। বাদশা আরেকজন মুসলমান কয়েদিকে তাতে নিক্ষেপ করার হুকুম দিল। সে সময়ই হযরত আব্দুল্লাহ রা. উপস্থিতিতে সেই মুসলমান কয়েদিকে সেই ডেগে নিক্ষেপ করা হল। সেই হতভাগ্য সাথে সাথে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল, শুধু হাড়িগুলো চমকাচ্ছিল।

তারপর বাদশা হযরত আব্দুল্লাহ রা. কে বলল, দেখ এখনও আমার কথা মেনে নাও এবং আমাদের ধর্ম কবুল কর, না করলে এই উত্তপ্ত ডেগের

আগুনে তোমাকেও নিক্ষেপ করা হবে। তিনি পুনরায় নিজের ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে বললেন, এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় আমি আমার রবের দ্বীন ত্যাগ করব। সে সময়ই বাদশা হুকুম দিলেন তাঁকে চরখিতে চড়িয়ে ওই ডেগে নিক্ষেপ করা হোক। যখন তাঁকে ওই ডেগে নিক্ষেপ করার জন্য চরখিতে চড়ানো হলো। তখন বাদশা দেখলো তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। বাদশা চরখি থেকে নামানোর হুকুম দিল। কারণ বাদশা মনে করল হয়ত সে এই শাস্তি দেখে তার মনোভাব পরিবর্তন করেছে। এখন সে আমার কথা মেনে নিবে এবং আমার ধর্ম গ্রহণ করবে। আমি তাকে আমার মেয়ের জামাই করে আমার সাম্রাজ্য তাকে বুঝিয়ে দিব।

কিন্তু বাদশার এই ভাবনা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হযাফা রা. বললেন, আমি শুধু এই কারণে কেঁদেছি আল্লাহর রাস্তায় শুধু আমার একটি প্রাণই কোরবানী দিচ্ছি, কতই না ভালো হতো যদি আমার প্রতিটি লোমকূপে এক একটি প্রাণ থাকতো, তবে আমি সব প্রাণ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। কোনো বর্ণনায় আছে, তাঁকে কয়েদখানায় রেখেছে। খাবার, পানাহার বন্ধ রেখেছে। কয়েক দিন পর মদ এবং শুকরের গোশত পাঠিয়েছে। কিন্তু তিনি অনেক ক্ষুধা সত্ত্বেও সেই খাবারের দিকে তাকাননি। অবস্থা দেখে বাদশা তাকে ভেকে পাঠালেন এবং তাঁকে খাবার না খাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি জবাব দিলেন, এই অবস্থায় যদিও আমার জন্য এই খাবার হালাল, তবুও আমি আপনার মতো দুশমনকে আমার ব্যাপারে উৎফুল্ল হওয়ার সুযোগ দিতে চাইনি। তখন বাদশা বলল, তুমি আমার কপালে চুমো দাও আমি তোমাকে এবং তোমার সব সাথীকে মুক্ত করে দিব। তিনি তার কথা কবুল করে নিলেন, তার কপালে চুমো খেলেন। বাদশা তার ওয়াদা পূরণ করলেন। তাকে সব সাথীসহ মুক্ত করে দিলেন। যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হযাফা রা. সেখান থেকে মুক্ত হয়ে হযরত উমর রা. এর কাছে এলেন তিনি বললেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর দায়িত্ব হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে হযাফার কপালে চুমো খাওয়া। আমি তাই শুরু করলাম। তা বলে প্রথমেই তার কপালে চুমো খেলেন।^{১৫৬}

দীনের কাজের পরিবেশ তৈরি করতে হয়

হযরত মাও. রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী র. একবার এক বিয়ে উপলক্ষ্যে থানাভবন গেলেন। তিনি ভাবলেন এই সুযোগে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র. এর সাথে সাক্ষাত করবেন। হযরত হাজী সাহেব র. তার স্বভাব সুলভ কারণে এ বিষয়ে অবগত হয়ে গেলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন আপনি কারো কাছে বাইয়াত হয়েছেন? তিনি বললেন, না আমি কারো কাছে বাইয়াত হইনি। হযরত হাজী সাহেব র. বললেন, আমার কাছে বাইয়াত হোন। হযরত গাঙ্গুহী র. বললেন, আমি এই শর্তে বাইয়াত হতে পারি আপনি আমাকে যিকিরের ওযিফা দিতে পারবেন না। তিনি বললেন, আমি তো আপনাকে বাইয়াত হওয়ার কথা বলেছি, যিকির ও ওযিফার কথা বলিনি। আমি ওয়াদাও দিচ্ছি আগামীতেও কখনও বলব না। হযরত হাজী র. তাঁকে বাইয়াত করে নিলেন এবং বললেন, এখানে দু দিন থেকে যাও। তিনি থানাভবনে তিন দিন অবস্থান করলেন। রাতে তিনটা সময়ে তিনি দেখতে পেলেন সবাই ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়ছে। হযরত গাঙ্গুহী র. লজ্জিত হলেন, তাই তিনিও তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলেন। তারপর অন্য সবাইকে যখন যিকিরের মধ্যে ব্যস্ত দেখলেন, তিনিও যিকিরে মশগুল হলেন।

দ্বিতীয় দিন একই অবস্থা হলো। তৃতীয় দিন খুব আনন্দ চিত্তে তাহাজ্জুদের নামায পড়লেন এবং যিকিরের মধ্যে লিপ্ত হলেন। চতুর্থ দিন হযরতের কাছে গেলেন এবং বললেন, হযরত আপনি তো সবকিছুই করে দিলেন। হযরত হাজী র. বললেন, আমি তো বলেছিলাম আমি ওয়াদা খেলাফ করব না। এখন আপনি যেতে পারবেন। হযরত গাঙ্গুহী র. বললেন, এখন তো আমি যাব না। তিনি চল্লিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন এবং কিছুদিন পর খেলাফত নিয়ে ফিরে এলেন। প্রথমে ইবাদত ছিল লোক দেখানো। পরবর্তীতে তা অভ্যাসে পরিণত হয়, পরে ইবাদতে পরিণত হয়। সাথে সাথে খেলাফত পেয়ে যান।

হযরত মাও. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব র. বলেন, আমার মুশাহাদা হচ্ছে, যখন আমার বয়স আঠারো বছর। একবার আমি গাঙ্গুতে যাই; সেখানে যিকিরের পরিবেশ তো ছিলই। গাঙ্গুর মসজিদে ধোপারা কাপড় পরিষ্কার

করত; তারা যখন কাপড় ছুড়ে মারত সাথে সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ত। এটা ছিল পরিবেশের প্রভাব। তাছাড়া তাদেরকে পড়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া ছিল না। যে নেক পরিবেশে থাকবে তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। হযরত সাহাবা কেরামদের একটি পরিবেশ ছিল, যারা তাদের পরিবেশে আসত তারা সে প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। তাদের পরিবেশের প্রভাবও ছিল অপ্রতিরোধ্য। হযরত ইবরাহিম আ. এর পরেই ছিল তাদের মর্যাদা। উম্মতের ঐক্যমত হচ্ছে, সকল সাহাবা হচ্ছেন সত্যের মাপকাঠি; তারা নিষ্পাপ ছিলেন না। তবে অবশ্যই নিরাপদ ছিলেন। উম্মতের ঐক্যমত হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যত বড় কুতুব বা গাউস হোক না কেন সে একজন সর্বনিম্ন সাহাবীর মর্যাদায় উন্নিত হতে পারবে না। কারণ তারা যে পরিবেশ পেয়েছেন তা পরবর্তি কারোর পক্ষেই পাওয়া সম্ভব হয়নি। এমন পরিবেশ থেকে আবু জেহেলের মত দুর্ভাগরাই শুধু প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারে। তা ছাড়া সে কৃত্রিম ভাবে মুমিন ছিল। কারণ, সেও ঘরে বলত মুহাম্মদের কথা তো ঠিক। কিন্তু আমরা তার কথা মেনে নিলে তার গোলামী করতে হবে। আর এটা ছিল তাদের জন্য লজ্জার বিষয়। যদি একটি দল সিদ্ধান্ত নেয় আমরা গোনাহ ত্যাগ করব তবে তাদের পরিবেশে যারাই আসবে তারাও তাদের মত হবে।^{১৫৭}

কেয়ামতের দিন শাসকদের গলায় শৃংখল থাকবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. বললেন, প্রত্যেক আমির ও হাকিম, চাই সে দশজন ব্যক্তির আমিরই হোক না কেন কেয়ামতের দিন এমনভাবে তাকে ডাকা হবে তার গলায় শৃংখল থাকবে। এমনকি তার ইনসাফই তাকে সেই শৃংখল থেকে মুক্ত করতে পারবে অথবা ওই যুলুম তাকে ধ্বংস করবে। একজন হাকিমকে সে চাই ন্যায় বিচারক হোক বা যালিম হোক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে বেঁধে আনা হবে। তারপর অনুসন্ধানে যদি সে ন্যায়বিচারক প্রমাণিত হয় তাকে মুক্ত করা হবে। আর যদি সে যালিম প্রমাণিত হয় তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

রাসূল সা. ইত্তিকালের সময় বলেছেন

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান বলেছেন, রাসূল সা. একবার মৃত্যু শয্যায় বলেছেন, বিভিন্ন কুপ থেকে সাত মশক পানি আমার ওপর ঢেলে দাও। আমি বাইরে গিয়ে লোকদেরকে ওসিয়ত করব। রাসূল সা. এর মাথায় পটি বাঁধা ছিল, তিনি বাইরে গিয়ে মিস্বরে তাশরিফ নিলেন এবং আল্লাহর হামদ ছানার পর বললেন, “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকে এই এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে হযরত সে দুনিয়া গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সাওয়াব ও প্রতিদান গ্রহণ করবে।

হযরত সা. এর এই ফরমানের উদ্দেশ্য হযরত আবু বকর রা. ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি। তাই তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকলেন এবং আরজ করলেন, আমার মা বাবা সবাই আপনার ওপর কোরবান হোক। রাসূল সা. বললেন, হে আবু বকর! একটু আরামের সাথে বসো। আমার সঙ্গী হিসাবে এবং সম্পদ খরচের হিসাবে আমার ওপর সবচে’ বেশি অনুগ্রহ কারী ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর রা.। মসজিদের সব দরজা বন্ধ করে দাও, শুধু আবু বকরের দরজা খুলে রাখ। আমি তাঁর ওপর নূর দেখেছি।”^{১৫৮}

কেয়ামতের দিন গোনাহগারের চোখ লম্বা হবে

হযরত ইয়াযিদ ইবনে হারুন র. বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. একবার বয়ান করেন। তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন এমন এক বান্দাকে ডাকা হবে যাকে আল্লাহ তা’য়ালা দুনিয়াতে অনেক নেয়ামত দিয়েছেন। তার রিযিকে খুব প্রশস্ততা ছিল। তার শরীর স্বাস্থ্যও খুব ভালো ছিল। কিন্তু সে নিজের রবের অকৃতজ্ঞ ছিল। তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করান হবে। তাকে বলা হবে তুমি আজকের জন্য কি করেছ? তুমি নিজের জন্য কি আমল আগে পাঠিয়েছ? সে নিজের জন্য কোনো আমলই পাবে না। তাই সে কাঁদতে থাকবে, এত বেশি পরিমাণে কাঁদবে যে, অশ্রু শেষ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে তাকে লজ্জা দেওয়া হবে। তারপর সে রক্তের কান্না করবে। তারপর তাকে আরো লজ্জা দেওয়া হবে, ফলে সে নিজের উভয় হাত কনুই পর্যন্ত খাবে। তারপর তাকে আরো

অপমানিত করা হবে, সে উঁচু আওয়াজে কান্না করবে এবং তার চোখ বের হয়ে তার চেহারায় চলে আসবে। উভয় চোখের দূরত্ব হবে তিন মাইল লম্বা এবং তিন মাইল প্রশস্ত। তারপর তাকে আরো লজ্জা দেওয়া হবে, অবশেষে সে অস্থির হয়ে বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে দোষখে পাঠাও এবং আমাকে রহম কর, আমাকে এখান থেকে বের কর।^{১৫৯}

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এর পরীক্ষা

মায়মুন ইবনে আসবাগ র. বলেন, আমি বাগদাদে ছিলাম। হঠাৎ এক আওয়াজ শুনতে পাই। জিজ্ঞেস করলাম এমন শোরগোল কেন? লোকেরা বলল, আজকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এর পরীক্ষা হচ্ছে। হযরত মায়মুন আসবাগ র. বলেন, আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম যখন তাঁকে প্রথম কোড়া মারা হয় তিনি বললেন, বিসমিল্লাহ। যখন দ্বিতীয় কোড়া মারা হলো তিনি বললেন, ‘লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লাহ বিল্লাহ’। যখন তৃতীয় কোড়া মারা হলো তিনি বললেন, কুরআন আল্লাহর কালাম, মাখলুক নয়।

যখন চতুর্থ কোড়া মারা হয় তিনি বললেন, আমাদেরকে কোনো বিপদ স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের জন্য যা লিখেছেন।

—সূরায়ে তাওবা : আয়াত :৫১।

এভাবে তাকে পর্যায়ক্রমে উনত্রিশ কোড়া মারা হয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এর কারামত

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে যখন কোড়া মারা হচ্ছিল তাঁর পরনে পাজামা ছিল। যখন তার পাজামা নাভির নিচে পড়ে যাচ্ছিল তিন ভয় পাচ্ছিলেন তা নিচে পড়ে যায় কি না। তিনি সাথে সাথে আসমানের দিকে তাকালেন এবং ঠোঁটকে একটু নাড়ালেন। তখন পাজামা সাথে সাথে দ্রুত ওপরে উঠে নাভি পর্যন্ত পৌঁছে নিজে নিজে আঁটসাঁট হয়ে গেল। মায়মুন ইবনে আসবাগ র. বলেন, আমি সাত দিন পর তার খেদমতে হাজির হলাম। আমি আরজ করলাম আপনি আসমানের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে কি বলছিলেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর

কাছে আরজ করছিলাম হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার সেই নামে যা দ্বারা আপনি আরশে আযিমকে ভরে রেখেছেন। আপনি যদি জানেন আমি হকের ওপর রয়েছি, তাহলে আমার সতর যেন খুলতে না পারে।

ঘটনার বিবরণ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মুখে

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এই ঘটনাকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন “বাবুল বুসতান” নামক স্থানে পৌঁছলাম আমার জন্য একটি সাওয়ারী আনা হলো। আমাকে সাওয়ার হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। সে সময় আমার কোনো সাহায্যকারী ছিল না। আমার পায়ে ভারি শিকল পরান ছিল। কয়েকবার সাওয়ার হওয়ার চেষ্টা করে আমি উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। অবশেষে কোনো রকম সাওয়ার হলো। মুতাসিমের মহলে পৌঁছলাম। আমাকে একটি কুঠুরিতে প্রবেশ করিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। তখন ছিল মধ্যরাত এবং কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। আমি নামাযের জন্য মাসেহ করতে চাইলাম, হাত বাড়াতেই পানির এক পেয়ালা এবং থালা পেলাম। আমি ওয়ু করলাম এবং নামায পড়লাম।

পরের দিন মুতাসিমের দূত এসে আমাকে খলিফার দরবারে নিয়ে গেল। মুতাসিম উপবিষ্ট ছিল। প্রধান কাজী বা বিচারপতি উপস্থিত ছিল। আর তাদের সমমনাদের একটি বড় দলও উপস্থিত ছিল। আবু আব্দুর রহমান শাফেঈও উপস্থিত ছিল। সে সময় দু’ জন ব্যক্তির গর্দানও উড়িয়ে দেওয়া হয়। আমি আব্দুর রহমান শাফেঈকে বললাম, মাসেহ এর ব্যাপারে ইমাম শাফেঈর মতামত কি স্মরণে আছে? ইবনে আবু দাউদ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তার খুব নিকটে গেলাম। সে আমাকে বসতে বলল। আমি বেড়ির কারণে ক্লান্ত ছিলাম এবং খুব ভারি মনে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, আমার কি কথা বলার অনুমতি আছে? খলিফা বলল, বলো। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল সা. কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেছেন? কিছুক্ষণ পর সে জবাব দিল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দিতে। আমি বললাম, আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি। তারপর আমি বললাম, আপনার সম্মানিত দাদা ইবনে আব্বাসের রা. বর্ণনা, যখন আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি রাসূল সা. এর খেদমতে

এলো। রাসূল সা. তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো ঈমান কী? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. সমধিক জ্ঞাত। রাসূল সা. বললেন, ঈমান হলো এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল। নামাযের গুরুত্ব প্রদান, যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা পালন করা, গনিমতের সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রদান করা। তারপর মুতাসিম বলল, আমার পূর্ববর্তি ব্যক্তি যদি তোমাকে ঐশ্বর্য্যের না করত আমি তোমার পেছনে পড়তাম না। তারপর আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাককে লক্ষ্য করে বলল, আমি তোমাকে নির্দেশ দেইনি এই পরীক্ষা শেষ করে দাও। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! এর মধ্যেই মসুলামনদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। খলিফা উপস্থিত আলেমদেরকে বললেন, তাঁর সাথে মুনাযারা বা বিতর্ক ও আলোচনার ব্যবস্থা কর।

একজন ব্যক্তি কথা বলত আমি তার উত্তর দিতাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলত আমি তার উত্তর দিতাম। মুতাসিম বলত, আহমাদ তোমার ওপর খোদা রহম করুন তুমি কি বলছ? আমি বলতাম, আমি রুল মুমিনীন! আমাকে আল্লাহর কিতাব বা রাসূলের হাদীস থেকে প্রমাণ দিন আমি মেনে নেব। মুতাসিম বলে যদি সে আমার কথা মেনে নেয় তবে আমি তাঁকে আযাদ করে দিব। তারপর বলে আহমাদ! আমি তোমার প্রতি দয়ালু। আমি তোমাকে আমার সন্তান হারুনের মতোই স্নেহ করি। তুমি কি বলো? আমি সেই উত্তরই দিতাম, আমাকে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সা. সুন্নাহ থেকে প্রমাণ দিন আমি মেনে নিব। এভাবে দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর সে বিরক্ত হয়ে গেল এবং বলল, তুমি যাও এবং আমাকে কয়েদ করে ফেলল। আমাকে প্রথম স্থানে ফিরিয়ে আনা হয়। পরবর্তী দিন আবার আমাকে ডাকা হয় এবং বিতর্ক চলতে থাকে। আমি সবার কথার উত্তর দিতে থাকি। এভাবে সূর্যাস্তের সময় ঘনিয়ে আসে, সে বিরক্ত হয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

তৃতীয় রাতে আমি বুঝতে পারলাম আগামীকাল কিছু ঘটবে। আমি রশি চেয়ে বেড়ি খুব শক্তভাবে বেঁধে নিলাম এবং আমার পাজামা ভালোভাবে বেঁধে নিলাম। তৃতীয় দিন আমাকে যথারীতি ডাকা হয়। আমি দেখলাম দরবার কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আমি বিভিন্ন দেউড়ি এবং স্থান

অতিক্রম করে আগে বাড়লাম। কিছু লোক তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছু লোক কোড়া হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। আগের দিনের অনেক লোক আজ উপস্থিত নেই। আমি যখন মুতাসিমের কাছে যাই আমাকে বসতে বলে। তারপর আমার সাথে বিতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় আমি এক এক করে জবাব দিতে থাকি। আমার আওয়াজ সবার ওপরে ছিল। যখন অনেক দেরি হয়ে গেল আমাকে আলাদা করে একান্তভাবে তাদের সাথে কিছু কথা বলল। তারপর তাদেরকে সরিয়ে আমাকে ডেকে নিল। আমাকে বলল, আহমাদ! তোমার ওপর খোদা রহম করুন। আমার কথা মেনে নাও আমি তোমাকে মুক্ত করে দিব। আমি আগের মতই জবাব দিলাম। সে রেগে বলল, তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাও, তাঁর হাত গুঁড়িয়ে দাও। মুতাসিম তার আসনে বসে জল্লাদদের ডাকল। তাদেরকে বলল, তোমরা অগ্রসর হও। একজন সামনে আসে এবং আমাকে এক কোড়া লাগিয়ে দেয়। মুতাসিম বলে জোরে দাও। তারপর সে সরে যায় আরেকজন আসে এবং কোড়া মারে। এভাবে উনিশ কোড়া মারার পর মুতাসিম আমার কাছে আসে এবং বলে আহমাদ তুমি কেন নিজের জীবন ধ্বংস করছ? আল্লাহর কসম! তোমার ব্যাপারে আমি খুব খেয়াল করছি। এক ব্যক্তি তার তলোয়ার দিয়ে আমাকে প্রহার করে এবং বলে তুমি সবার ওপরে বিজয়ী হতে চাও? আরেকজন বলে বান্দা! তোমার মাথার ওপর খলিফা দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ বলছে আমিরুল মুমিনীন আপনি রোযা রেখে এই গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। মুতাসিম আবার আমার সাথে কথা বলত, আমি তাকে পূর্বের উত্তরই দিতাম। সে আবার জল্লাদদের হুকুম দিত তারা আমাকে পুরো শক্তি দিয়ে প্রহার করত। এমন অবস্থায় আমার শ্বাস প্রায় যায় যায় অবস্থা। আমার হুঁশ ফিরে এলে দেখতে পেলাম বেড়ি খুলে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল, আমরা তোমাকে উল্টো মুখ করে ফেলে দিয়েছি এবং পা দিয়ে আঘাত করেছি। তিনি বলেন, আমার এ সবার কোনো উপলব্ধি হয়নি।

বিরল দৃঢ়তা ও সংকল্প

তারপর আহমাদ ইবনে হাম্বলকে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাঁকে থেফতারের সময় থেকে নিয়ে মুক্তির সময় পর্যন্ত আঠাশ মাস তিনি বন্দি ছিলেন। তাঁকে ৩৩/৩৪ কোড়াটি মারা হয়। ইবরাহিম ইবনে মুসআ'ব

যিনি একজন সিপাহী ছিলেন বলেন, ইমাম আহমাদ র. কে এমন কোড়া লাগানো হতো তার একটি হাতিকে দিলে হাতি দৌড়ে পালাতো। ঘটনার সময় উপস্থিত এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, ইমাম রোযা ছিলেন, আমি বললাম তিনি রোযা রেখেছেন। তিনি নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য সেই আকিদা পোষণ করার সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি সে রকম ভাবেননি। একবার খুব পিপাসা পেলে তিনি পানি চাইলেন। তার সামনে বরফের পানি রাখা হল তিনি হাতে রেখে কিছুক্ষণ দেখে পরে ফিরিয়ে দিলেন। ইমামের ছেলে বলেন, ইত্তিকালের সময় আমার বাবার শরীরে গ্রহাণের নিদর্শন ছিল। আবুল আব্বাস বলেন, ইমাম আহমাদ র. যখন “রিক্বাতে” বন্দি ছিলেন, লোকেরা তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন এবং নিজের মুক্তির হাদীস শোনালেন। তিনি বললেন, খাবাবের হাদীসের কি জবাব দিবে? যে হাদীসে আলোচনা এসেছে পূর্বের এমন লোকও অতিবাহিত হয়েছে যাদের মাথায় করাত চালান হয়েছে। তারপরও তারা নিজেদের দীন থেকে বিচ্যুত হয়নি। তাঁর বক্তব্য শুনে মানুষ আশা ছেড়ে দিয়েছে। লোকেরা বুঝে নিয়েছে তিনি নিজের আদর্শ ও মত থেকে কখনও বিচ্যুত হবেন না।

ইমাম আহমাদ র. এর পুরস্কার

ইমাম আহমাদ র. এর বিরল দৃঢ়তা ও সংকল্পের উদাহরণ এই ফিতনাকে চিরদিনের জন্য খতম করে দেয়। মুসলমান এক বিরাট বিপদ থেকে সুরক্ষা লাভ করে। যে লোকেরা এই দীনি পরীক্ষায় হুকুমতের সঙ্গ দিয়েছে এবং সুযোগ সন্ধান ও স্বার্থসিদ্ধির মোক্ষম ব্যবহার করেছে তারা মানুষের দৃষ্টিতে নীচু হয়েছে। তাদের দীনি ও ইলমী গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। তার বিপরীতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের শান ও মর্যাদা দিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। আহলে সুনাত ও বিশুদ্ধ আকিদায় বিশ্বাসী লোকদের পরিচয়ই হচ্ছে তাঁর প্রতি ভালোবাসা। তাঁর সমসাময়িক এক ব্যক্তির উক্তি হচ্ছে, যখন তোমরা কাউকে দেখবে সে আহমাদ ইবনে হাম্বলের প্রতি মুহাব্বত রাখে তবে বুঝবে সে সুনতের অনুসারি। আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আদদাওরাকি নামে আরেকজন প্রখ্যাত আলেমের উক্তি হচ্ছে, “তোমরা যাকে আহমাদ ইবনে হাম্বলের বিষয়ে মন্দ বলতে শুনবে, তার ইসলাম সন্দেহমুক্ত নয়।”

ইমাম আহমাদ র. সে সময়ের হাদীসের ইমাম ছিলেন। মুসনাদের বিন্যাস ও রচনা তাঁর অনেক বড় ইলমী কীর্তি। তিনি ধর্মের মুজতাহিদ ও স্বতন্ত্র ইমাম ছিলেন। তিনি বড় যাহেদ ও আবেদ ছিলেন। তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য নিজ স্থানে স্বীকৃত। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী তাঁর খ্যাতি, সম্মান ও মর্যাদা এবং ইমাম হিসাবে তাঁর অবস্থান হচ্ছে তাঁর দৃঢ়তা ও পর্বত প্রমাণ অবিচল ও নিষ্ঠার অন্যতম নিয়ামক। এমন এক বিরাট ফেতনায় দ্বীনের হেফাজত এবং নিজ যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্রাটের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ তাঁকে অনন্য মর্যাদায় উন্নিত করেছে। তাঁর সমকালীন যারা এই ফিতনার ভয়াবহতা দেখেছে, তারা ইমাম আহমদের এই মহান কাজের প্রশস্ত অন্তরে স্বীকার করেন। তাঁর এই পদক্ষেপকে দীন হেফাজতের যথোপযুক্ত কর্মপদ্ধতি হিসাবে সাব্যস্ত করেন। তাঁর সমকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলী ইবনে মাদানী র. (যিনি ইমাম বুখারী র.এর অন্যতম উস্তাদ হিসেবে খ্যাত) এর উক্তি “আল্লাহ তা’য়ালা এই দ্বীনের হেফাজত ও বিজয়ের কাজ দু’জন ব্যক্তির মাধ্যমে নিয়েছেন। তাদের তৃতীয় কোন সহচর, সমকক্ষ দেখা যায় না। একজন হচ্ছেন, ইরতিদাদের ফিতনার মোকাবেলায় হযরত আবু বকর রা. এবং কুরআন মাখলুক কি না এ সংক্রান্ত ফিতনার মোকাবেলায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.। এই মহান মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার ফলাফল স্বরূপ ২৪১ হিঃ যখন এ ইমাম ইত্তিকাল করেন গোটা শহর থেকে মানুষ উপচে পড়ে, ইতিপূর্বে কারো জানাযায় এতো বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম দেখা যায়নি। জানাযায় উপস্থিত মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক আট লাখ পুরুষ এবং ষাট হাজার নারী।”^{১৬০}

শাফেঈ র. ও আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এর একটি ঘটনা

ইমাম শাফেঈ র. যখন এই সংবাদ শুনলেন যে, তাঁকে কোড়া মারা হয়েছে তিনি বললেন, আমার কাছে সেই জামা পাঠিয়ে দিন যা কোড়া মারার সময় ইমামের গায়ে ছিল। ইমাম আহমাদ র. নিজের সেই জামা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম শাফেঈ র. সেই জামা ধুয়ে তার পানি

পান করলেন। মোল্লা আলী কারী র. বলেন, এই ঘটনা তার জীবনের সবচেয়ে মহত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা। কারণ ইমাম শাফেঈ র. ইমাম আহমাদ র. এর উস্তাদ ছিলেন। যেদিন তাঁর মৃত্যু হয় এবং বাগদাদের রাস্তায় তাঁর জানাযা যাচ্ছিল সেদিন বিশ হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জানাযার মর্যাদা যা দেখে এতো বেশি কাকের মুসলমান হয়ে যায়।

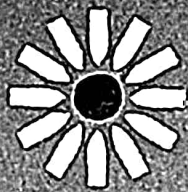
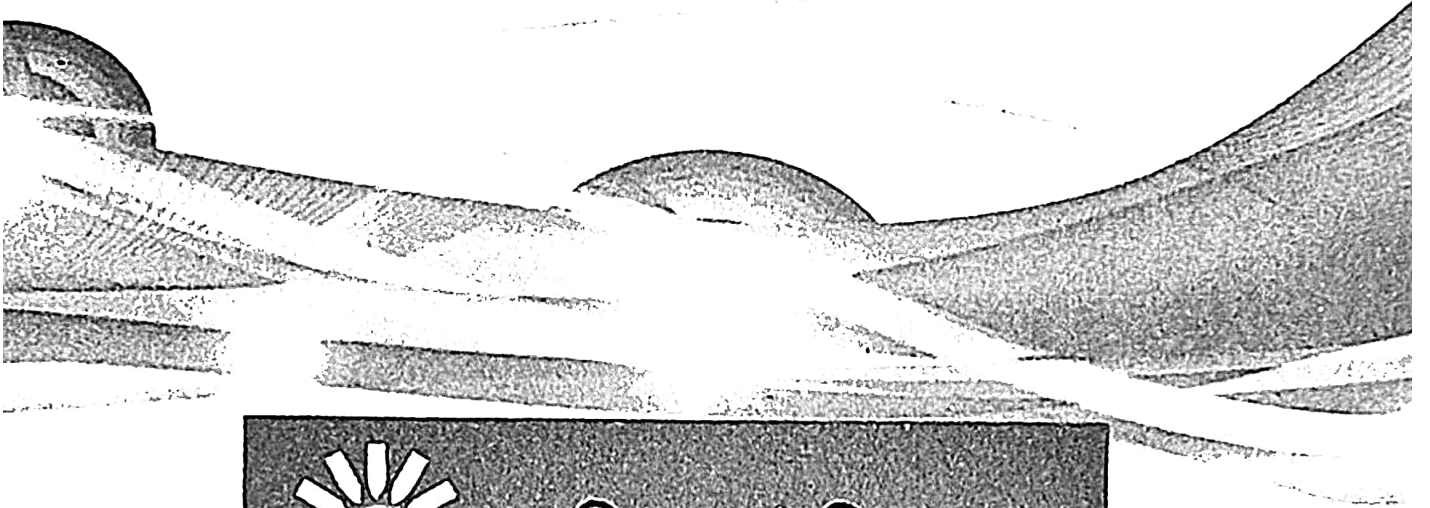
আল্লাহ বললেন, এটা আমার চেহারা তুমি দেখে নাও

আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আলকিনদী র. বলেন, আমি ইমাম আহমাদ র. কে স্বপ্নে দেখি। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সাথে কী ব্যবহার করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং বলেছেন হে আহমাদ! আমার জন্য তোমাকে কোড়া মারা হয়েছিল? আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ, আমার রব বললেন, এটা আমার চেহারা তুমি ইচ্ছা মত দেখে নাও, আমি তোমার জন্য আমার দর্শন বৈধ করেছি।

আহমাদ ইবনে হাম্বলের লাশ সংরক্ষণ

হযরত মোল্লা আলী কারী র. বলেন, দু'শত তিরিশ বছর পর তাঁর কবরের পাশে কোনো এক সম্মানিত লোককে দাফন করা হচ্ছিল তাঁর কবর হঠাৎ খুলে যায়। তাঁর কাফন ঠিক আগের মতই অপরিবর্তিত পাওয়া যায়। তাঁর শরীরে কোন রকম পরিবর্তন দেখা যায়নি। মনে হচ্ছে এই মাত্র তাঁকে দাফন করা হয়েছে।^{১৬১}

॥ ଓୟ ଓ ୫ର୍ଥ ଧଣ୍ଡୁ ସମାପ୍ତ ॥



আকিক পাবলিকেশন্স

১১, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

design : shaj ■ 01911031184